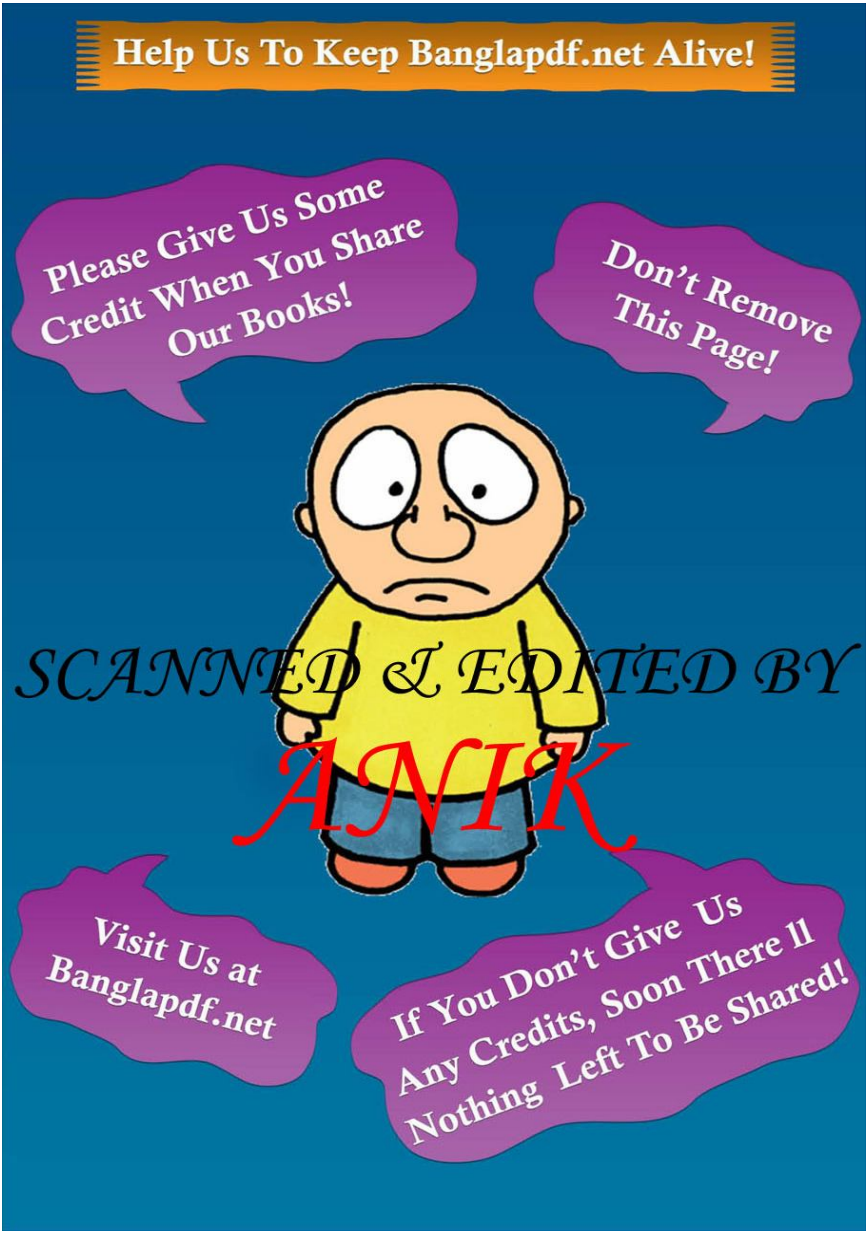
মাসুদ রানা

কর্কটের বিষ

সার্বিয়া চক্রান্ত

কাজী আনোয়ার হোসেন




Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
SCANNED & EDITED BY
ANIK
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা

কর্কটের বিষ
সার্বিয়া চক্রান্ত

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

কর্কটের বিষ

সার্বিয়া চক্রান্ত

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7635-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
KARKATER BISH
SERBIA CHAKRANTO
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

বাহাত্তর টাকা

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৫৩/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৬৬/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৫১/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
২৯-৩০	রক্তের রং-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৫৯/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৬৫/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৮২/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১,২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	১০৮/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
৮৭-৮৮	বিষ নিশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৭৬/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৭২/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৮২/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৭২/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৯০/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৮০/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৬৭/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	[illegible]/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	[illegible]/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৭৩/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৮৪/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৪-১৫৫	কালপ্রিট-১,২ (একত্রে)	[illegible]/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৭৯/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭৮-১৭৯	বিষকন্যা ১,২ (একত্রে)	৭০/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-

১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৭২/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৬৭/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১.২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৭৬/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৫-২১৬ শত্রু বিভীষণ-১,২ (একত্রে)	৭৬/-
২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী-১,২ (একত্রে)	৭০/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৭০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৫১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৭৬/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+বুকবাজ	৮০/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১.২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৭-২৮১ শয়তানের ঘাঁটি+আক্রান্ত দূতাবাস	৮২/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৬৫/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৭৪/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৭২/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৬৪/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৭২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৭৪/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ [illegible]	৪১/-
৩০৩-৩১৩ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক+ভাইরাস X-99	৬৪/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৬৯/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৭৬/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সংকেত+সবুজ সংকেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+এজেন্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী	৬৬/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৭৩/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা	৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমাণ্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে)	৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা	৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ	৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৩/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর	১০০/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস	৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ	৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে)	৮৬/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বৃদ্ধ পাইলট	৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে)	৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা	৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে)	৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর	৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে	৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে)	৯৪/-
৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে)	৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট	৭৪/-
৪০৬-৪০৭ কুরুক্ষেত্র ১,২ (একত্রে)	৮৭/-

কর্কটের বিষ

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

এক

হিংস্র কোন বন্য পশুকে টার্গেট করলে এই শিকারীর হাত থেকে তার আর রেহাই নেই। জিম্বাবুয়েতেই জন্ম, ত্রিশ বছর ধরে চারশো বর্গমাইল বনভূমি চষে বেড়াচ্ছে; না কাউকে ভয় পায়, না কোন আইন মানে, দয়া-মায়াহীন নির্দয় পাষণ্ড বললেই চলে। জাম্বেজি নদীর কিনারা থেকে পাঁচশো মিটার দূরে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা একটা উঁচু পাথরে নিতম্ব ঠেকিয়ে বসে আছে। লোকটা শ্বেতাঙ্গ, কাঠকয়লার গুঁড়ো দিয়ে তৈরি পেস্ট মেখে হাত আর মুখ কালো করে নিয়েছে। পায়ে কালো বুট, পরনে কালচে-সবুজ ট্রাউজার, গায়ে ছাই রঙের শার্ট। তার বাম দিকে, জঙ্গল ঢাকা পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নদীর দিকে নামছে এক পাল ইম্পালা হরিণ, সূর্য ডোবার আগে পানি খাবে–বড়দের চারপাশে চক্কর দিয়ে লাফালাফি করছে বাচ্চাগুলো। ডান দিকে একজোড়া জেব্রা, একইদিকে যাচ্ছে; ওগুলোর পিছনে নিঃসঙ্গ এক মর্দা কুড়ু হরিণ, শাখা-প্রশাখা গজানো বাঁকা শিংগুলোর নিচে কাঠামোটাকে স্ট্যাচুর মত লাগছে দেখতে। এ-সব লক্ষ করলেও, এদিকে শিকারীর কোন আগ্রহ নেই। লেপার্ড ও চিতা ছাড়া অন্য কোন পশু শিকার করে এখন আর সে মজা পায় না। একঘেয়ে লাগে। এই একঘেয়েমি দূর করার জন্যে মানুষ শিকারের সুযোগ খোঁজে সে। আশায় আশায় থাকে, বেয়াড়া কোন বনরক্ষী তাকে চ্যালেঞ্জ করবে; কিংবা কোন পোচার বা ছিঁচকে চোর তাদের সুরক্ষিত প্রাসাদে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা চালাবে। গত আড়াই বছরে মাত্র ছ'জন মানুষকে শিকার করার সুযোগ পাওয়া গেছে, তাতে তার মন ভরেনি, বরং নেশা বেড়েছে। তার বাবা ছেলের এই নেশা সম্পর্কে সচেতন, তবে প্রয়োজন ছাড়া মানুষ খুন করে কোটি ডলারের ব্যবসাটাকে ছেলে ঝুঁকির মধ্যে ফেলুক তা সে সমর্থন করতে পারে না। ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রয়োজন মনে করলেই শুধু ছেলেকে এই তৃষ্ণা মেটাবার অনুমতি দেয়।

বাবার নির্দেশেই আজ এখানে হাজির হয়েছে শিকারী। এই মুহূর্তে তাকিয়ে রয়েছে বড় একটা খাকি তাঁবুর দিকে। তাঁবুটা প্রকাণ্ড এক বেওব্যাব গাছের ছায়ায়। চোখ তুলে আবার একবার ডান দিকে দৃষ্টি বোলাল সে। লাল সূর্য ডুবতে আর বেশি সময় নেবে না। সে চাইছে, রাতটা যেন এখানে কাটাতে না হয়। তবে কোন প্রার্থনা করছে না। ধর্মকর্ম বা ঈশ্বরে তার বিশ্বাস নেই। বাবা তাকে শিখিয়েছে, টাকাই ক্ষমতা, আর ক্ষমতা থাকলে তুমিই ঈশ্বর।

রাইফেলটা পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা। পুরানো একটা এনফিল্ড এনভয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় স্নাইপারদের খুব প্রিয় ছিল। সঙ্গে বত্রিশ-এক্স টেলিস্কোপ আছে। এই অস্ত্রটা ছোট বেলা থেকেই নাড়াচাড়া করছে শিকারী।

তাঁবুর ফ্ল্যাপ নড়ে ওঠায় আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। বাইরে বেরুল সুদর্শন এক

তরুণ; রোগা-পাতলা একহারা গড়ন, উজ্জ্বল শ্যামলা, প্রায় ছ'ফুট লম্বা। তরুণের মাথায় এক রাশ কালো চুল। পরনে শুধুই সবুজ শর্টস। আগুনটায় কোন শিখা নেই, সাদা ধোঁয়া মোচড় খেতে খেতে ওপরে উঠছে। পা দিয়ে ঠেলে আগুনে কয়েকটা কাঠ ফেলল তরুণ।

রাইফেলে হাত দিল শিকারী। পকেটে যুবকের ফটো আছে, স্কোপে চোখ রেখে ফটোর সঙ্গে তরুণের চেহারা মিলিয়ে নিল। কালো চুল হ্যাটে ঢাকা পড়লেও, চেহারা অবিকল এক।

পজিশন নিল শিকারী। একটা পাথরে হেলান দিল, কনুই রাখল ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর। অকস্মাৎ আবার আড়ষ্ট হয়ে উঠল সে অস্পষ্ট নারীকণ্ঠের আওয়াজ শুনে। স্কোপ থেকে চোখ সরাল। তাঁবু থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে এসেছে। সে-ও সবুজ শর্টস পরে আছে, বুকে ব্রেসিয়ার ছাড়া নাভির ওপর আর কিছু নেই। স্কোপে চোখ রেখে মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখল শিকারী। মেয়েটি শ্বেতাঙ্গ, রোদে পোড়া মুখের দু'পাশ থেকে দীর্ঘ সোনালি চুল নেমে এসেছে, এতই লম্বা যে সবুজ শর্টস প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে হাসছে সে।

মনে মনে ভাগ্যকে অভিশাপ দিল শিকারী। তাকে বলা হয়েছে তাঁবুতে লোকটা একাই থাকবে। দিগন্তের কাছে লটকে থাকা সূর্যটার দিকে আরেকবার তাকাল সে। এখন আর রেডিও অন করে নতুন নির্দেশ চাওয়ার সময় নেই হাতে। রেডিও রয়েছে মাইলখানেক পিছনে ঝোপের ধারে লুকিয়ে রাখা ল্যান্ড-রোভারে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল শিকারী।

আগুনটার পাশে উবু হয়ে বসে আছে তরুণ, একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আগুনটাকে জ্যান্ত করছে। পাশে মেয়েটা দাঁড়ানো, ঠোঁটে মুগ্ধ-বিস্ময় মেশানো হাসি, দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে চঞ্চল ইম্পালা হরিণের দলটা। শিকারী তাকেই প্রথম গুলি করল, দুই স্তনের ঠিক মাঝখানে। পরমুহূর্তেই ছুটল দ্বিতীয় বুলেট। তরুণ ইতিমধ্যে সিধে হতে শুরু করেছে। পেটে গুলি খেলো সে। মেয়েটি নিঃসাড় শুয়ে আছে। তরুণ গড়াগড়ি খাচ্ছে, দু'হাতে পেট চেপে ধরে। শিকারী আরেকটা গুলি করে তার মাথা ফুটো করে দিল। মেয়েটিকে আর গুলি করল না। বুলেট অপচয় করার লোক নয় সে।

পেশায় মেডিসিন স্পেশালিস্ট অর্থাৎ ডাক্তার হলেও, খোদাবক্স মৃধা প্র্যাকটিস করেন না। কর্মজীবনের ত্রিশটা বছর ওয়াশিংটনে কাটিয়েছেন, ওখানকার একটা নামকরা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করতেন। বছর দেড়েক হলো সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র একটা স্পেশাল প্রজেক্ট-এর ডিরেক্টর হয়ে জিম্বাবুইয়ের রাজধানী হারারেতে চলে এসেছেন গণ্ডারের শিং নিয়ে গবেষণা করার জন্যে। বয়স প্রায় ষাট, চিরকুমার, একটু খেয়ালি প্রকৃতির মানুষ তিনি। জন্মভূমি অর্থাৎ বাংলাদেশে নিকট-আত্মীয় তেমন কেউ নেই, তাই দুই যুগের বেশি হয়ে গেল দেশমুখো হননি। দেশকে তিনি খুবই ভালবাসেন, তবে তার দেশপ্রেম একটু অন্যরকম। সারা জীবন অধ্যাপনা ও বিভিন্ন প্রকল্পে গবেষণা করে প্রচুর আয় করেছেন, কিন্তু খরচ করেছেন টিপে টিপে। তাঁর কোন নেশা নেই, বিলাসিতাও

পছন্দ করেন না। নিজের কাজ নিজেই করেন, এমনকি রান্না ও কাপড় ধোয়ার জন্যেও কোন চাকরবাকর রাখেন না। বন্ধু মহলে কৃপণ হিসেবে পরিচিত। কাউকে কোনদিন বলেননি, রোজগারের বেশিরভাগ টাকাই ভদ্রলোক একটা সুইস ব্যাংকে জমা করেছেন বাংলাদেশে বড়সড় একটা হাসপাতাল তৈরি করার উদ্দেশ্যে। দেশে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুবান্ধব আছে, তাদের সহযোগিতায় ঢাকার কাছাকাছি গাজীপুরে হাসপাতালের জন্যে জমি কেনাও হয়ে গেছে। হু-র এই গবেষণা প্রকল্প শেষ হতে আর মাস তিনেক বাকি, তারপরই দেশে ফিরে হাসপাতাল ভবন নির্মাণের কাজে হাত দেবেন।

তাঁর ল্যাবরেটরি সরকারী ক্যান্সার হাসপাতালের কাছাকাছি, শহরের উপকণ্ঠে। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে তাইওয়ান আর হংকং থেকে কয়েকজন ধনকুবের চীনা ক্যান্সার রোগীকে জিম্বাবুইয়ে আনিয়েছেন তিনি গবেষণার স্বার্থে। ল্যাবরেটরি থেকে প্রায়ই ওই রোগীদের দেখার জন্যে হাসপাতালে যেতে হয় তাঁকে। কাল রাতেও ল্যাবরেটরির কাজ সেরে যেতে হয়েছিল। রোগীদের পরীক্ষা করে ফ্ল্যাটে ফিরতে তাই অনেক রাত হয়ে যায়।

আজ সকাল সাড়ে সাতটায় ঘড়ির অ্যালার্ম ঠিক সময়েই বাজল, কিন্তু তাঁর ঘুম ভাঙল না। ভাঙল আরও এক ঘণ্টা পর, সাড়ে আটটায়, টেলিফোনের শব্দে। চোখে ঘুম রয়েছে এখনও, বিছানা না ছেড়েই খাটের পাশের টেবিল থেকে ফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন। অপরপ্রান্ত থেকে মেট্রোপলিটান পুলিসের একজন ইন্সপেক্টর নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইল, 'ডক্টর খোদাবক্স মৃধা?'

'হ্যাঁ, বলছি। কি ব্যাপার, ইন্সপেক্টর?'

'স্যার, আপনাকে এখুনি আপনার ল্যাবরেটরিতে আসতে হবে। ভোর রাতে দু'জন দারোয়ান খুন হয়ে গেছে।'

ঝট্ করে উঠে বসলেন ডক্টর মৃধা। 'হোয়াট! কি বলছেন আপনি!'

'ওদেরকে ক্লোজ রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয়েছে, ডক্টর মৃধা,' ইন্সপেক্টর বলল। 'একজন সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। দ্বিতীয় লোকটা এই একটু আগে হাসপাতালে মারা গেছে।'

'কিন্তু কেন ওরা খুন হবে? ল্যাবরেটরিতে এমন দামী কিছু তো নেই যে…'

'দুঃখিত, ডক্টর মৃধা। তদন্ত না করে মোটিভ সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না,' বলল ইন্সপেক্টর। 'দ্বিতীয় দারোয়ান মারা যাবার আগে জবানবন্দী দিয়ে গেছে। তেমন কিছুই সে বলতে পারেনি, শুধু বলেছে খুনী একজন শ্বেতাঙ্গ, একাই এসেছিল।'

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে ডক্টর মৃধা জানতে চাইলেন, 'ল্যাবরেটরির কোন ক্ষতি হয়নি তো?'

'ক্ষতি হয়নি মানে? আপনার ল্যাবরেটরি নেই, ডক্টর মৃধা। ল্যাবের সব ক'টা কামরায় পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যন্ত্রপাতি, কাগজ-পত্র, কমপিউটর, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

ডক্টর মৃধার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। ইন্সপেক্টর আরও অনেক কথা বলে

যাচ্ছেন, কিন্তু সে-সব কিছুই তাঁর কানে ঢুকছে না। দেড় বছরের গবেষণার ফল ল্যাবের ফাইল আর কমপিউটরেই শুধু ছিল, অন্য কোথাও পাঠানো হয়নি। ওগুলো যদি সব পুড়ে গিয়ে থাকে, এতদিনের কঠোর সাধনা একেবারেই বৃথা হয়ে গেল। আবার নতুন করে শুরু করতে হবে তাঁকে। তারপর মনে পড়ল, গবেষণার সম্ভাব্য ফলাফল কি পেতে যাচ্ছেন, এ-সম্পর্কে তিনি তাঁর ভাইপো সাইফুরকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন।

'এখুনি আসছি আমি,' বলে রিসিভার ক্রেডলে রেখে লাফ দিয়ে খাট থেকে নামলেন ডক্টর মৃধা। বাথরূমে যাবার তাগাদা অনুভব করলেন, কিন্তু সময় নষ্ট হবে ভেবে গেলেন না। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এলেন, এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এসে ছুটলেন গ্যারেজের দিকে।

তাঁর গাড়ি পুরানো মডেলের একটা কালো মরিস। গ্যারেজের সামনে এসে দেখেন, তালা খোলা। মনে মনে বিস্মিত হলেও, নিজেকে ব্যাখ্যা দিলেন এই বলে যে কাল রাতে দেরি করে ফিরেছেন, তাড়াহুড়া করায় তালা লাগাবার কথা সম্ভবত মনে ছিল না। গ্যারেজের দরজা খুলে গাড়িতে উঠলেন। ইগনিশন কী ঘুরিয়ে স্টার্ট দিলেন এঞ্জিন। বিস্ফোরণটা গোটা এলাকা কাঁপিয়ে দিল। চোখের পলকে গ্যারেজটা উড়ে গেল, মরিসটা পরিণত হলো লোহা আর ইস্পাতের সহস্র টুকরোয়, একমাত্র আরোহীর শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কি ঘটল, কেন ঘটল, এ-সব কিছুই জানার সুযোগ পেলেন না খোদাবক্স মৃধা।

এক মাস পরের ঘটনা। ওয়াশিংটন ডি.সি।

ফাইলটা নিয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল কংগ্রেস সদস্যা লরেলি ভ্যান্স, লিভিংরূম পেরিয়ে মায়ের বেডরূমের দিকে এগোল। নক করতে ভেতর থেকে প্রায় কর্কশ, পুরুষালি গলা ভেসে এল, 'দরজা খোলা আছে।'

হুইলচেয়ারে বসে খোলা জানালা দিয়ে শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন মিসেস ফেয়ারলি ভ্যান্স। ষাট চলছে, কিন্তু গত চার হপ্তায় শোক আর বেদনা তাঁর বয়েস যেন দশ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। লরেলির পায়ের আওয়াজ হুইলচেয়ারের পিছনে এসে থামল, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে মেয়ের দিকে তিনি তাকালেন না। 'কেন এসেছিল ওরা?' জিজ্ঞেস করলেন। শিকারী পাখির মত আঙুল দিয়ে হুইলচেয়ারের হাতল দুটো আঁকড়ে ধরলেন।

'জিম্বাবুই পুলিসের ফাইনাল রিপোর্টটা আমাদের হারারে এমব্যাসী হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছেছে,' ম্লানকণ্ঠে বলল লরেলি। 'সেটাই ওরা পৌঁছে দিয়ে গেল। রিপোর্টটা তুমি পড়বে, মা?'

'না,' রুদ্ধশ্বাসে বললেন ফেয়ারলি। 'ডিটেইলস জেনে লাভ কি। রিপোর্টে নতুন কিছু আছে?'

একটা চেয়ার টেনে এনে মায়ের পাশে বসল লরেলি। তাকেও খুব ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত লাগছে। 'না, মা, নতুন কিছু নেই। পুলিস কোন সূত্র খুঁজে পায়নি। মোটিভও জানা যায়নি। ডাকাতি নয়, রেপ নয়। জাম্বেজি নদীর কাছাকাছি ওই সাইটে জেসিকা আর তার বয়ফ্রেন্ড ক্যাম্প ফেলেছিল। ওখানে তিনদিন ছিল

ওরা। পুলিস বলছে, এ-ও সম্ভব নয় যে হঠাৎ ওদেরকে দেখে একদল পোচার বনরক্ষী বলে ভুল করবে।'

হুইলচেয়ার ঘুরিয়ে মেয়ের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন ফেয়ারলি। 'সার কথা, মার্কিন প্রশাসনের চাপেও কোন কাজ হয়নি, এই তো? বেশ, ভাল কথা। কিন্তু আমাকে তুই ভাল করেই চিনিস, লরেলি। তোর মা এত সহজে হার মানার পাত্রী নয়। জেসিকাকে যে বা যারাই খুন করে থাকুক, আমি দেখতে চাই তাদের কঠিন শাস্তি হয়েছে।'

'চেষ্টার কোন ত্রুটি হয়নি, মা,' বলল লরেলি। 'না এদিক থেকে, না ওদিক থেকে। জিম্বাবুই সরকারকে আমেরিকা প্রতি বছর প্রচুর ডলার সাহায্য দিচ্ছে। ওদের প্রেসিডেন্ট নিজে পুলিস চীফকে ডেকে কড়া নির্দেশ দেন, তদন্তে যেন কোন ত্রুটি না থাকে। আমাদের হারারে অ্যামব্যাসাডরও সব কাজ ফেলে এই কেসটায় সময় দিয়েছেন।'

ফেয়ারলির দৃষ্টি আরও কঠিন হলো। 'বুঝলাম। সবাই তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। কিন্তু, লরেলি, আমার কাজ এখনও শুরুই হয়নি।'

মায়ের দিকে একটু ভয়ে ভয়েই তাকাল লরেলি। তিন বছর আগে কার অ্যাক্সিডেন্টে তার বাবা জন মর্টন ভ্যান্স মারা যান। স্বামীর সঙ্গেই গাড়িতে ছিলেন ফেয়ারলি, কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেলেও কোমর থেকে নিচের অংশ প্যারালাইজড হয়ে যায়, সেই থেকে হুইলচেয়ার নিয়ে চলাফেরা করতে হয় তাঁকে। মর্টন ভ্যান্স একশো মিলিয়ন ডলারের রিয়েল এস্টেট ব্যবসা রেখে গিয়েছিলেন, তিনি মারা যাবার পর বড় মেয়ে লরেলি রাজনীতি ছেড়ে বাবার ব্যবসা দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে রাজি হয়নি। দুই বোন ওরা, ছোটবোন জেসিকার বয়স তখন মাত্র একুশ, পড়াশোনা করছিল। অগত্যা বাধ্য হয়েই স্বামীর ব্যবসা নিজে দেখাশোনা করার সিদ্ধান্ত নেন ফেয়ারলি। পরবর্তী আড়াই বছরে দেখা গেল মর্টন ভ্যান্সের রেখে যাওয়া ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ব্যবসায়ী মহলে তাঁর কৌশল আর বুদ্ধির প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ল। তবে একই সঙ্গে ছড়াল কুখ্যাতি–ভদ্রমহিলা অসম্ভব জেদী, সাংঘাতিক রগচটা, কেউ তাঁকে ঠকিয়েছে বুঝতে পারলে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়েন না। 'তোমার কাজ শুরু হয়নি মানে?' নিস্তব্ধতা ভেঙে অবশেষে জানতে চাইল লরেলি।

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, লরেলি,' মিসেস ভ্যান্স শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। 'ওখানে আমি নিজের লোক পাঠাব। তারা জেসিকার খুনীকে খুঁজে বের করবে।' ডান হাত তুলে তাতে কাশলেন, কাগজ ছেঁড়ার মত আওয়াজ হলো। 'ওরা সবাই নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক, লরেলি। প্রফেশনাল। তোর মামা একটা এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে।'

'এজেন্সির লোক? মার্সেনারি?' হকচকিয়ে গেছে লরেলি।

'ওদের বিরুদ্ধে লেকচার দিবি না,' মেয়েকে সাবধান করে দিলেন মিসেস ভ্যান্স। 'ওরা কেমন লোক, তা জেনে আমার কোনও দরকার নেই। আমার কাজ নিয়ে কথা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লরেলি। 'মা, প্রথমে আমার সঙ্গে তোমার আলোচনা

করা উচিত ছিল। মার্সেনারিদের সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। তুমি কি জানো, আফ্রিকা সম্পর্কে আমেরিকান মার্সেনারিরা একেবারেই অনভিজ্ঞ? পুরো টাকাটাই তোমার পানিতে যাবে। তাছাড়া, একটু ধৈর্য ধরতে পারলে না? আমার একমাত্র বোন খুন হয়ে গেছে, আর তুমি ভেবে নিয়েছ আমি চুপ করে বসে আছি?'

মেয়ের দিক ভুরু কুঁচকে তাকালেন মিসেস ভ্যান্স। 'কিছু যদি করছিসই, আমাকে জানাসনি কেন?'

'আমি তো আর যার-তার কাছে সাহায্য চাইতে পারি না,' বলল লরেলি। 'এ কাজের জন্যে উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ লোক মাত্র একজনকেই চিনি আমি। কিন্তু সে খুব ব্যস্ত মানুষ, ডাকলেই তাকে পাওয়া যায় না। খবর দিয়েছি, আশা করছি যে-কোন দিন ওয়াশিংটনে পৌঁছে যাবে সে।'

'সে কি মার্সেনারি?'

মাথা ঝাঁকাল লরেলি। 'মার্সেনারিরা তার নেতৃত্বে কাজ করে, মা।'

'আফ্রিকা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা আছে?'

'তুমি যেমন তোমার হাতের উল্টোপিঠ চেনো, সে-ও তেমনি আফ্রিকাকে চেনে।' আবার মাথা ঝাঁকাল লরেলি।

'কি নাম তার?'

'মাসুদ রানা।'

মিসেস ভ্যান্সের চেহারায় তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটল। কিছু বলতে যাবেন, লরেলির ভুরু দুটো কুঁচকে উঠছে দেখে নিজেকে সামলে নিলেন। শুধু একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'ওহ্।'

'সে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মা,' ঠাণ্ডা সুরে বলল লরেলি। 'সে আমার চেয়ে বয়েসে দু'এক বছরের ছোট হলেও, আমি তাকে সমীহ আর শ্রদ্ধা করি। আরও একটু বলি, তোমার মেয়ে কংগ্রেস সদস্য হলেও, মাসুদ রানাকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে তার মর্যাদা বরং আরও বেড়েছে। এই সম্পর্কটার জন্যে আমি গর্বিত। কাজেই, তার সঙ্গে কথা বলার সময় নিজেকে একটু সামলে রেখো। তোমার মেজাজটাকে সত্যি আমি ভয় পাই।'

অভয় দিয়ে ক্ষীণ একটু হাসলেন মিসেস ভ্যান্স। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তবে যতই প্রশংসা করো, একটু বাজিয়ে না দেখে টাকা খরচ করতে আমি রাজি নই, তুইও এই কথাটা মনে রাখিস।'

লরেলিকে অসহায় দেখাল। 'টাকা? মা, সাবধান! টাকার কথা ভুলেও ওর সামনে তুলো না।'

'কেন?'

'কাজটা যদি করে দিতে রাজি হয়, কোন টাকাই সে নেবে না,' বলল লরেলি। 'টাকার কথা বললে অপমানিত বোধ করবে। আমি তাকে বহু বছর ধরে চিনি, মা। তুমি বরং চুপ করে থেকো, যা বলার আমিই বলব।'

'আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে, লরেলি।' মিসেস ভ্যান্সের চেহারায় বিরক্তি। 'যার টাকার লোভ নেই, সে কোন কাজের লোকই নয়।'

'বন্ধুত্বের খাতিরে যারা আত্মত্যাগ করে, তারা তাহলে কি?' চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করল লরেলি।

'হয় বোকা, তা না হলে অযোগ্য,' রায় দিলেন মিসেস ভ্যান্স।

'তোমার ধারণা ভুল,' বলল লরেলি। 'অপেক্ষা করো, রানা সেটা প্রমাণ করবে।'

'ঠিক আছে, দেখা যাক।'

রানাকে এয়ারপোর্ট থেকে নিজের ক্যাডিলাকে তুলে নিল লরেলি। অ্যারাইভাল লাউঞ্জে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছে ওরা, তবে তেমন কোন কথা হয়নি। লরেলির চোখ ছলছল করছে দেখে রানা তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে শুধু বলেছে, 'সত্যি আমি কষ্ট পেয়েছি।'

লরেলি নিজেই ড্রাইভ করছে, পাশে বসে আছে রানা। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'কষ্ট পেয়েছি, অবাকও হয়েছি। জেসিকাকে আমি কখনও দেখিনি, শুধু ফটো দেখেছি তোমার বেডরুমে। অবাক হয়েছি এই জন্যে যে তোমার বোন খুন হয়ে গেল, আর আমি সেটা জানতে পারলাম এক মাস পর?'

'তোমার সাহায্য দরকার হবে, এটা তখন ভাবতেই পারিনি আমি,' বলল লরেলি। 'কাদের তরফ থেকে কি ধরনের আশ্বাস দেয়া হয়েছিল আমাকে, শুনলে বুঝতে পারবে কেন এতদিন অপেক্ষা করেছি। আমাদের অ্যামব্যাসাডরের মাধ্যমে জিম্বাবুইয়ের প্রেসিডেন্ট নিজে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, খুনী যে-ই হোক, অবশ্যই তাকে ধরে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। প্রতিদিন আমাকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে, দ্রুতগতিতে তদন্ত এগোচ্ছে, যে-কোন দিন খুনী বা খুনীরা ধরা পড়বে। তিন হপ্তা পর প্রথম জানতে পারলাম, জিম্বাবুই পুলিস কোন সূত্রই পাচ্ছে না। তারপরই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করি। ফাইনাল রিপোর্টটা কাল পেয়েছি, গাড়িতেই আছে ফাইল...'

'ঢাকা থেকে রওনা হয়ে প্রথমে আমি হারারেতে যাই,' বলল রানা। 'ওখানে চব্বিশ ঘণ্টা ছিলাম। ওদের ফাইনাল রিপোর্টের একটা কপি আমার কাছেও আছে।'

'তাহলে তো সবই তুমি জানো।'

সঙ্গে সঙ্গে নয়, কয়েক সেকেন্ড পর রানা বলল, 'সবাই যা জানে, তারচেয়ে বেশি জানি আমি। তবে এ-ধরনের কেসে সময় হচ্ছে সবচেয়ে জরুরী ফ্যাক্টর। অনেক দেরি হয়ে গেছে, লরেলি।'

'এর মানে কি কাজটা হাতে নেবে কিনা তাই নিয়ে দ্বিধা বোধ করছ?' সরাসরি জানতে চাইল লরেলি।

'ওহ্ গড, তোমার ধারণা কেসটা এখনও নিইনি আমি?' ক্ষীণ হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'আমি খবর পাওয়ার পরপরই রানা এজেন্সির এজেন্টরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করে দেয়, তা জানো?'

'কি বলছ তুমি!' লরেলির চোখে অবিশ্বাস।

'জিম্বাবুই পুলিস কোন সূত্র পায়নি, তাই না? অথচ আমার হাতে এত সূত্র, বুঝে উঠতে পারছি না কোনটা ধরে এগোব।'

'শুনে মা যা খুশি হবে না!' এই প্রথম একটু হাসল লরেলি। 'শোনো, রানা, আমার মা সম্পর্কে তোমাকে আগেই একটু সাবধান করে দিই। পঙ্গু মানুষ তো, মেজাজটা...'

'ছিহ্, লরেলি। এ-সব নিয়ে কোন কথা নয়, প্লীজ।'

'না, বলছিলাম কি...'

'কোন প্রয়োজন নেই, লরেলি। হুইলচেয়ারে বসা মানুষ আগেও আমি দেখেছি। বিশ্বাস করো, আমার কোন সমস্যা হবে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে গেল লরেলি।

চেহারা একটা বিরাট সার্টিফিকেট, তার সঙ্গে যদি মানানসই ও রুচিসম্মত পোশাক থাকে, জানা থাকে অভিজাত মহলে প্রচলিত আদব-কায়দা, মানুষের মনে অনুকূল ছাপ ফেলা কোন সমস্যা হয় না। লরেলির লিভিং রূমে ঢুকে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে, সসম্মানে মিসেস ভ্যাঙ্গের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা, তারপর ঝুঁকে তাঁর হস্তচুম্বন করল, অকৃত্রিম আন্তরিকতার সঙ্গে নরম সুরে বলল, 'আই য়্যাম অ্যাট ইওর সার্ভিস, মিসেস ফেয়ারলি ভ্যান্স।'

সব মিলিয়ে রানাকে ভাল লেগে গেল বৃদ্ধার, কিন্তু তার মানে এই নয় যে নিজের স্বভাব পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি। ইঙ্গিতে একটা সেটি দেখিয়ে রানাকে বসতে বললেন, পরমুহূর্তে সরাসরি জানতে চাইলেন, 'আমি কি চাই, লরেলি কি তা তোমাকে জানিয়েছে?' উত্তরের অপেক্ষায় থাকলেন না। 'আমি চাই খুনী ধরা পড়ুক, এবং তাদের শাস্তি হোক। শাস্তি প্রসঙ্গে বলতে চাই, জিম্বাবুই পুলিসের প্রতি আমার কোন আস্থা নেই। ওদের আইনেরও আমি এক পয়সা দাম দিই না। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। খুনের বদলে...'

একটা হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিল রানা। 'ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, মিসেস ভ্যান্স। আপনি কি চান আমি বুঝতে পারছি।'

'তাহলে পরিষ্কার করে বলো, কাজটা তুমি পারবে? কেসটা নিচ্ছ?'

'আমাকে একটু বিস্তারিত বলতে হয়, মিসেস ভ্যান্স,' বলল রানা। 'আমার এজেন্সি ইনভেস্টিগেশন শুরু করার পর জানতে পেরেছে খুন দুটো নয়, তিনটে হয়েছে। সাইফুর রহমান মৃধা আর জেসিকা খুন হয়েছে জাম্বেজি নদীর কাছে, ওদিকে হারারেতে খুন হয়েছেন সাইফুর রহমানের চাচা ডক্টর খোদাবক্স মৃধা। দুটো ঘটনা, একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক আছে। জেসিকার জন্যে তো বটেই, তারপর যখন জানলাম যে ডক্টর খোদাবক্স আর তাঁর ভাইপো জুলজিস্ট রহমান বাঙালী ছিলেন, তখন সিদ্ধান্ত নিলাম এই কেস আমাকে নিতেই হবে।'

'আমি আমার প্রশ্নের আংশিক উত্তর পেলাম,' মিসেস ভ্যান্সের গলা এমনিতেই কর্কশ, অভিযোগের সুর থাকায় প্রায় রূঢ় শোনাল।

'আমি শুধু চেষ্টা করে দেখতে পারি, মিসেস ভ্যান্স,' বলল রানা। 'সফল হবই, এমন কথা বলতে পারি না। লরেলি আমাকে খবর দিতে দেরি করে

ফেলেছে। আমাদের আরও দুর্ভাগ্য, ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত ট্র্যাক মুছে গেছে। জিম্বাবুইয়ের জঙ্গলে এক হাজার বা তারও বেশি লোক রোজ অবৈধ অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিজেদের স্বার্থে পরস্পরের অপরাধ চেপে রাখে তারা। এই অবস্থায় আপনাকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, যুক্তিটা আমি বুঝতে পারছি,' বৃদ্ধা বললেন। 'পরবর্তী প্রসঙ্গ। দু'দিন আগে লরেলির মামা একটা এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ওই এজেন্সির দু'জন লোক আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে। কেসটার কথা শুনে আংশিক ফি হিসেবে আমার কাছে তিন লাখ ডলার অগ্রিম চেয়েছে তারা।'

'মা!' প্রতিবাদের সুরে আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল লরেলি, হাত তুলে রানা তাকে থামিয়ে দিল।

'মিসেস ভ্যান্স, এই কেসে আপনাকে কোন ফি দিতে হবে না।'

'আচ্ছা! তা বেশ।' আড়চোখে মেয়ের দিকে একবার তাকালেন মিসেস ভ্যান্স। 'আরেকটা প্রসঙ্গ। অপরাধী ধরা না পড়া পর্যন্ত ব্যবসার কাজে আমি ফিরে যেতে পারব না। অস্থিরতা দূর করার জন্যে আমারও কিছু একটা করা দরকার। আমি যদি তোমার সঙ্গে জিম্বাবুইয়ে যাই, তোমার অসুবিধে হবে?'

'মা, কেসটা অত্যন্ত বিপজ্জনক,' তাড়াতাড়ি বলল লরেলি। 'রানাকে যদি তোমার নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, ওর কাজে বিঘ্ন ঘটবে।'

'প্রশ্নটা রানাকে করা হয়েছে, সে-ই উত্তর দিক। আমি হারারেতে থাকব, ওর সঙ্গে জঙ্গলে ঢুকব না।'

'রানা এজেন্সির আফ্রিকান চীফ মামুন থাকবে ওখানে,' বলল রানা। 'অত্যন্ত যোগ্য ছেলে, আমি নিজের হাতে তাকে ট্রেনিং দিয়েছি। আপনি হারারেতে থাকলে কোন সমস্যা হবে বলে মনে হয় না, মামুন আপনার নিরাপত্তার দিকটা দেখবে।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ভ্যান্স। এই প্রথম সরাসরি মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন, যেন বলতে চাইলেন রানাকে তাঁর অপছন্দ হয়নি।

খেতে বসে মিসেস ভ্যান্স জানতে চাইলেন আফ্রিকার উদ্দেশে কবে রওনা হচ্ছে রানা।

'কাল,' জবাব দিল রানা। 'ব্রাসেল্স্ হয়ে।'

'ব্রাসেলস হয়ে কেন?'

'ওখানে আমার এক বন্ধু আছে, জিম্বাবুইয়ে যাবার আগে তার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। হারারেতে এক কি দু'দিন থাকব আমরা, তারপর বুলাওয়েওতে যাব। সব মিলিয়ে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা প্লেনে থাকতে হবে আমাদের।'

'বারবার প্লেন বদল করার দরকার কি,' মিসেস ভ্যান্স বললেন। 'আমি বরং একটা প্রাইভেট ইন্টারকন্টিনেন্টাল-রেঞ্জ জেট চার্টার করি, ককপিট ও কেবিন ক্রুসহ। নার্স সিলভিয়াও সঙ্গে যাবে, আমার দেখাশোনা করার জন্যে।' রানা বা লরেলি কিছু বলছে না দেখে আবার তিনি মুখ খুললেন, 'তাহলে সেই কথাই রইল। কাল সকাল দশটায় এয়ারপোর্টে যাচ্ছি আমরা।'

'এত সব আয়োজন এরইমধ্যে শেষ করতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।
'কেন পারব না। এটা মার্কিন মুল্লুক, এখানে টাকা কথা বলে।'

নিচে আটলান্টিক, আকাশের পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপরে রয়েছে প্লেন। প্রাইভেট জেটটা অত্যাধুনিক গালফস্ট্রীম ফোর। কেবিনের ঠিক পিছনেই ক্রুদের কোয়ার্টার, তারপর গ্যালি ও সার্ভিস এরিয়া। ডাইনিং এরিয়া ও লাউঞ্জ পার হয়ে পিছনে যেতে হয়, ওখানে রয়েছে একটা স্যুইট কেবিন, দুটো সাধারণ কেবিন। প্রতিটি কেবিনে তিনটে করে বাঙ্ক আছে।

আকাশে থাকতেই জেরা শুরু করলেন মিসেস ভ্যান্স। 'ব্রাসেলসে আমাদের প্রোগ্রাম কি?'

'ওখানে আমার বন্ধু লোটন নড়বেল আছে,' বলল রানা। লোটন নড়বেল সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা ধারণাও দিল। জিম্বাবুয়েই জন্ম তার, একজন মুক্তিযোদ্ধা। জিম্বাবুই স্বাধীন হবার পর আদর্শগত বিভক্তির কারণে মুক্তিযোদ্ধারা বহু বছর পরস্পরের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে মেতে ছিল, সেই সংঘর্ষে লোটন নড়বেল-এর পক্ষ নিয়ে রানাও লড়াই করেছে। ফ্রিডম ফাইটার নামে পরিচিত একটা সশস্ত্র সংগঠনের লীডার হিসেবে যে এলাকায় অপারেশন চালাত নড়বেল, ঘটনাচক্রে সেখানেই খুন হয়েছে জেসিকা আর সাইফুর রহমান। সেজন্যেই তার সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। গৃহযুদ্ধ কোন সমাধান দিতে পারবে না, এই উপলব্ধি হওয়ায় দেশ ছেড়ে ব্রাসেলসে চলে এসেছে নড়বেল। ব্রাসেলাসে সে ব্যবসা করে। মার্সেনারিদের সঙ্গে যোগাযোগও রাখে।

'তারমানে ওই লোটা ন্যাটবেল না কি যেন নাম, তার অভিজ্ঞতা ধার করবে তুমি?'

'আফ্রিকা সম্পর্কে আমার নিজের কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে,' সবিনয়ে বলল রানা। 'যদিও আমি বেশিরভাগ সময় লড়াই করেছি মোজাম্বিক সীমান্তের কাছাকাছি। তবে একটা কথা স্বীকার করি, নড়বেলের তুলনায় আমার অভিজ্ঞতা কিছুই নয়। জিম্বাবুইয়ে আমার ভাল কন্ট্যাক্ট আছে, কিন্তু নড়বেলের কন্ট্যাক্ট আরও অনেক ভাল। জিম্বাবুইয়ে এখনও তার আত্মীয়স্বজন আছে। ওর নাম লোটন নড়বেল, মিসেস ভ্যান্স।'

'ব্রাসেলসে আর কি কাজ আমাদের?' জানতে চাইলেন মিসেস ভ্যান্স। 'ওস্তাদ আর শিষ্য মিলে মাত্র দু'জন হলে। আমার তো ধারণা ছোটখাট একটা আর্মি ছাড়া জেসিকার খুনীদের ধরা সম্ভব নয়। কথাটা আরেকবার মনে করিয়ে দিই। টাকার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। প্রয়োজন মনে করলে যত বেশি সম্ভব মার্সেনারি ভাড়া করতে পারো তুমি।'

'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট বলে একটা কথা আছে, মিসেস ভ্যান্স,' বলল রানা। 'ব্রাসেলসে আমার জন্যে রানা এজেন্সির আফ্রিকান চীফ মামুন অপক্ষা করছে।'

'এই মামুন সম্পর্কেও আমার একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার,' বললেন মিসেস ভ্যান্স। 'কারণ, সেই তো আমার নিরাপত্তার দিকটা দেখবে, তাই না?'

মামুনের ইতিহাস রীতিমত অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর। চুপচাপ ও শান্ত প্রকৃতির মেধাবি ছাত্র ছিল সে, ঢাকা ভার্সিটি থেকে ইংলিশে মাস্টার্স করার পর চাকরি না পেয়ে চোখে সর্ষে ফুল দেখছিল। রেজাল্ট বেরোবার পর হোস্টেলে থাকার অধিকার হারায়, কিন্তু ঢাকায় অন্য কোথাও থাকার জায়গা না পেয়ে বন্ধুদের পরামর্শে সীটটা দখল করে রাখে। গ্রামের বাড়িতে ফেরার কোন উপায় ছিল না, কারণ অশিক্ষিত সরল মায়ের ওপর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাবার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন কোন ছেলের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। জননীকে মামুন কথা দিয়ে এসেছে, চাকরি পেলেই ঢাকায় বাড়ি ভাড়া নেবে, মাকে নিয়ে এসে নিজের কাছে রাখবে। মাসের পর মাস কাটে, বছর ঘুরে আসে, চাকরি আর হয় না। অন্যায়ভাবে আর যারা হোস্টেলের সীট দখল করে রেখেছে বেশিরভাগই তারা বহিরাগত সন্ত্রাসী, পুলিস হোস্টেলে হানা দিলে তাদের সঙ্গে মামুনকেও পাঁচিল টপকে পালাতে হয়, সঙ্গীরা হাতে বোমা গুঁজে দিলে পুলিসকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তেও হয় সেগুলো, কারণ এই সন্ত্রাসীরাই তার থাকা-খাওয়ার পয়সা যোগায়। এভাবেই হাতেখড়ি। তারপর ছোটখাট অপারেশনে যাবার ডাক পড়ল। হঠাৎ সবাই খেয়াল করল, মামুন নিজেও, ছিনতাই ও অপহরণের প্ল্যান এত নিখুঁতভাবে করতে পারে সে, ধরা পড়ার প্রায় কোন সম্ভাবনাই থাকে না। শুধু তাই নয়, যে-কোন অপারেশনে সবার আগে থাকে সে, সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি নেয়, নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরেও আসে সবার আগে। সন্ত্রাসীদের মধ্যে তার কদর বেড়ে গেল। সবাই তাকে 'গুরু' বলে ডাকতে শুরু করল। পুলিসের খাতায় টপ মাস্তানদের তালিকায় তার নামটা চলে এল সবার ওপরে। এরপর একের পর এক অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য সব প্রস্তাব আসতে লাগল। রাজনৈতিক দল থেকে বলা হলো, আমাদের হয়ে কাজ করো, মাসে দু'চার লাখ টাকা নিয়ে যাও। ফেনসিডিল ব্যবসায়ীরা প্রস্তাব দিল কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি করলে দশ লাখ টাকা কমিশন পাবে। এত টাকার লোভ সামলানো কঠিন, তার ওপর সন্ত্রাসী ভক্তদের চাপ তো আছেই। এক বছরে প্রচুর টাকা কামাল মামুন, অথচ ঢাকায় কোন বাড়ি ভাড়া নিল না, গ্রাম থেকে মাকে নিয়ে এসে নিজের কাছেও রাখল না।

এ-সব কথা অনেক পরে জেনেছে রানা। মামুনের সঙ্গে ওর পরিচয় হয় চরম সঙ্কটময় এক মুহূর্তে, জীবন-মৃত্যুর কিনারায় সে তখন ঝুলছে। বিসিআই হেডকোয়ার্টার মতিঝিল থেকে বেলা সাড়ে এগারোটার সময় একটা কাজ নিয়ে বেরিয়েছে রানা, গাড়িতে ওঠার মুহূর্তে শুনতে পেল রাস্তার ওপারে বোমা ফাটছে। সেদিকে তাকাতে বিশতলা বিল্ডিঙের নিচে লোকজনের ভিড় দেখতে পেল ও। বিল্ডিংটার নিচতলায় একটা ব্যাংক। লোকমুখে শুনল, একদল সন্ত্রাসী ব্যাংক লুঠ করতে এসে ধরা পড়েছে। সংখ্যায় ছিল ছয়জন, দু'জন পালিয়েছে, দু'জন গণপিটুনিতে মারা গেছে, একজন পালাতে না পেরে বিল্ডিঙের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেছে।

রাস্তা পেরিয়ে বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকল রানা, পুলিস ওর পরিচয় পেয়ে পথ আটকায়নি। তবে তারা ওকে সাবধান করে দিল, ছাদে কেউ উঠতে চেষ্টা করলেই বোমা ফাটাচ্ছে ছেলেটা, গুলি করারও হুমকি দিচ্ছে।

খোলা ছাদে একাই উঠল রানা। রেইলিংবিহীন ছাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে যাচ্ছিল মামুন, রানাকে দেখে হাতের রিভলবার তুলল গুলি করার জন্যে। তার লম্বা করা হাতটা কাঁপছে দেখে নরম সুরে হেসে উঠল রানা, বলল, 'আগে কখনও মানুষ মারোনি, এই প্রথম, তাই না?'

'কে আপনি?' রেগে গিয়ে জানতে চাইল মামুন।

'পরিচয় জেনে কি লাভ,' বলল রানা। 'উদ্দেশ্যটা বলি। আমি তোমাকে গণপিটুনি থেকে বাঁচাতে চাই। জানো নিশ্চয়ই, নিচে তোমার দুই সঙ্গীর লাশ পড়ে আছে?'

হাত কাঁপলেও, গলা কাঁপেনি মামুনের। 'ভয় দেখিয়ে কোন কাজ হবে না। যান, বিদায় হোন, নিজের চরকায় তেল দিন গিয়ে।'

'পাবলিক খেপলে কি ঘটে, তোমার তো জানার কথা,' বলল রানা। 'খুব বেশি হলে আর দশ-পনেরো মিনিট লোকজনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে পুলিস।'

'উপদেশ দেবেন না। গা ঘিন ঘিন করে। যান, কেটে পড়ুন। আমি চাই না আমার সঙ্গে আর কেউ মারা যাক।'

'তুমি তাহলে গণপিটুনি খেয়ে মরতে চাইছ?' রানা বিস্মিত।

হেসে উঠে মাথা নাড়ল মামুন। 'আপনি আমার সময় নষ্ট করছেন। শেষ একটা সিগারেট খেয়ে নিচে লাফ দেব আমি, আপনার পাবলিক বা পুলিস আমাকে জ্যান্ত ছুঁতে পারবে না।'

'কি আশ্চর্য, তোমার মত একটা কাপুরুষ ব্যাংক ডাকাতি করতে আসে কিভাবে?'

'কি বললেন?'

'আমার যা পেশা, প্রায়ই আমাকে তোমার মত কোণঠাসা অবস্থায় পড়তে হয়,' বলল রানা। 'আমি কিন্তু কখনোই কাপুরুষের মত আত্মহত্যার কথা ভাবি না। আমি সব সময় আত্মরক্ষার কথা ভাবি, এবং কোন না কোনভাবে উপায় একটা পেয়েও যাই।'

হাতের রিভলবারটা ফেলে দিল মামুন। 'মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছিলাম। ওটায় কোন গুলি নেই। সঙ্গে আর কোন বোমাও নেই। ধরুন, সিদ্ধান্ত পাল্টেছি। এখন আমি নিচে লাফ দিতে চাই না। এবার বলুন, আমার বাঁচার উপায় কি?'

'দেখলে তো, সত্যি সত্যি মরার কোন ইচ্ছে তোমার নেই। কারণ, তুমি কাপুরুষ নও। আর কেউ যদি বাঁচতে চায়, নিয়তি বা প্রকৃতি ঠিকই তাকে সাহায্য করবে।'

'আমাকে কে সাহায্য করবে?'

'কেন, আমি,' বলে পকেট থেকে নিজের রিভলবারটা বের করল রানা। 'আমি তোমাকে অ্যারেস্ট করছি। আমার সঙ্গে পুলিসের গাড়িতে চড়ে থানায় যাবে তুমি।'

'ও, তারমানে সিভিল ড্রেসে পুলিস আপনি,' মামুনের গলায় তাচ্ছিল্য। 'পুলিসকে আমি ঘৃণা করি। আপনি যদি আর এক পা-ও এগোন, এখুনি আমি লাফ দেব।'

'কেন, শেষ সিগারেটটা ধরাবে না?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আবার বলল রানা। 'তোমার ধারণা ভুল। আমি পুলিস নই। তবে সরকারের এমন একটা বিভাগে চাকরি করি, ওরা আমার অনুরোধ ফেলতে পারবে না। আমি তোমাকে বাঁচাতে পারি, এটা যদি বিশ্বাস করতে না পারো, আমার আর কিছু করার থাকে না। সেক্ষেত্রে আমি বলব, সিগারেটটা ধরাও, আয়েশ করে ধোঁয়া গেলো, তারপর লাফ দাও–কথা দিচ্ছি, আমি তোমাকে বাধা দেব না।'

কেমন সন্দেহের দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল মামুন, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে আটকাল। দেশলাই বা লাইটারের খোঁজে পকেট হাতড়াল, না পেয়ে মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'দেশলাই হবে?'

রিভলবার ধরা হাতটা শরীরের পাশে ঝুলছে, খালি হাতটা পকেটে ভরে ছেলেটার দিকে এগোল রানা। দেশলাই নয়, লাইটার বের করল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছে মামুন। 'থামুন,' কঠিন সুরে বলল সে। 'লাইটার ধরা হাতটা লম্বা করুন।'

তাই করল রানা। ওর লম্বা করা হাত থেকে লাইটারটা নেয়ার জন্যে মামুনকেও হাত বাড়াতে হলো। মাত্র দু'আড়াই হাত দূরে থেকে ছেলেটাকে ভাল করে দেখার সুযোগ হলো রানার। চেহারায় এত মায়া, চোখ দুটো এত বুদ্ধিদীপ্ত, অন্য কোন পরিস্থিতিতে বিশ্বাস করত না যে এই ছেলে ব্যাংক ডাকাতি করতে পারে। মায়াই লাগল।

মামুন যেন রানার এই অন্যমনস্কতার অপেক্ষাতেই ছিল। লাইটারটা না ছুঁয়ে ওর কব্জি ধরে হ্যাঁচকা টান দিল সে, দুটো শরীর পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে গেল। দু'জনেই ছাদের কিনারা থেকে নিচে পড়ে যাবে, এই ভয়ে আতঙ্কিত হলো রানা, আর সেই সুযোগে ওর ডান হাত থেকে রিভলবারটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল মামুন। কিনারায় টলছে দু'জন, তবে একা রানা নয়, মামুনও সতর্ক–নিচে পড়ার ইচ্ছা নেই তারও। একহাতে রানাকে জড়িয়ে ধরেছে, অপর হাতে রিভলবার, সেটার মাজল চেপে বসেছে রানার কানের নিচে।

ঠিক সেই মুহূর্তে হুড়মুড় করে ছাদে উঠে এল একদল পুলিস, নেতৃত্ব দিচ্ছে একজন ইন্সপেক্টর।

'আমার কথা না শুনলে আপনি কিন্তু সত্যি খুন হয়ে যাবেন,' হিসহিস করে বলল মামুন। 'একটু আগেই বলেছেন, পুলিস আপনার অনুরোধ রাখবে। ওদেরকে বলুন, আমাকে নিরাপদে পালিয়ে যাবার পথ তৈরি করে দিক। লাঠিচার্জ করলে পাবলিক সরে যাবে।'

ইন্সপেক্টরকে রানা বলল, 'রিভলবারটা আমার, লোড করা। ওর যা মনের অবস্থা, সত্যি গুলি করবে। আপাতত আমার কথা ভুলে যান, নিচে নেমে ওর পালাবার পথ করে দিন।'

কথা মতই কাজ করল পুলিস। সিঁড়ি বেয়ে রানাকে নিয়ে নামতে শুরু করল মামুন। গ্রাউন্ড ফ্লোর পর্যন্ত কিছুই ঘটল না। ইতিমধ্যে বিল্ডিঙের সামনে রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেছে, লাঠিচার্জ করে লোকজনকে সরিয়ে দিয়েছে পুলিস। রাস্তার

ওপারে তাকাল রানা, বলল, 'ওপারে ওটা আমার গাড়ি, তুমি চাইলে যেখানে খুশি নামিয়ে দিয়ে আসতে পারি।'

রাস্তা পার হয়ে গাড়িতে উঠল ওরা, রানার পিছু পিছু মামুন। রিভলবারটা সরিয়ে রানার পাঁজরে ধরেছে সে। 'চালান। আমি রামপুরা বস্তির সামনে নামব।'

পুলিসের দুটো জীপ স্টার্ট নিতে যাচ্ছিল, ইঙ্গিতে ড্রাইভারদের নিষেধ করল রানা। খানিক দূর আসার পর দেখা গেল, পুলিস বা অন্য কেউ ওদের পিছু নিয়ে আসছে না।

পথে তেমন কোন কথা হলো না। রামপুরা বস্তির কাছাকাছি প্রায় নির্জন রাস্তার ধারে গাড়ি থামাল রানা। নিচে নামার জন্যে খালি হাত দিয়ে নিজের দিকের দরজা খুলল মামুন, বলল, 'দুঃখিত, রিভলবারটা ফেরত দিতে পারছি না।'

রানা হাসল। 'এত বড় উপকার করলাম, আর এই তার প্রতিদান?'

'আমার জায়গায় আপনি হলেও এই কাজই করতেন,' বলল মামুন। 'আরেকটা কথা। আমি কোথায় যাই দেখার জন্যে পিছু নেবেন না, সেক্ষেত্রে গুলি করতে বাধ্য হব আমি।'

'তুমি আসলে খুবই কাঁচা, এই লাইনে আসাটাই বোকামি হয়েছে,' বলল রানা, এখনও হাসছে। 'প্রতি পদে শুধু ভুল করছ। তোমার বুঝি ধারণা, ট্রিগার টিপলেই রিভলবার থেকে গুলি বেরোয়? ম্যাগাজিনে গুলি থাকার দরকার নেই?'

স্থির হয়ে গেল মামুন। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'ও, বুঝেছি, আমার সঙ্গে চালাকি করছেন!'

হাত দুটো বুকে ভাঁজ করল রানা। যতটা সম্ভব নিজের দিকের দরজার কাছে সরে বসল। 'ইচ্ছে করলে ট্রিগার টিপে দেখতে পারো। আর যদি জানা থাকে কিভাবে রিভলবার চেক করতে হয়, চেক করে দেখো।'

রানার দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে রিভলবারটা খুলে চেক করল মামুন। ভেতরে সত্যি কোন গুলি নেই। 'তারমানে...আপনি...আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি...।'

প্যান্টের পকেটে হাত ভরে ছ'টা গুলি বের করল রানা। 'ছাদে ওঠার আগে এগুলো বের করে পকেটে রেখেছিলাম।'

'কিন্তু...কেন?' রক্তশূন্য হয়ে গেছে মামুনের চেহারা।

'বিল্ডিংটার নিচে দুটো লাশ পড়ে থাকতে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। লোকজনের কথা শুনে বুঝলাম, ওদের একজন সঙ্গী ছাদে উঠে গেছে, ধরতে পারলে তাকেও গণপিটুনি দেয়া হবে। পুলিসের সঙ্গে কথা বলে একাই ছাদে উঠলাম, ওঠার সময় রিভলবার থেকে বের করে নিলাম সব গুলি। কোণঠাসা অপরাধী কাউকে জিম্মি করার সুযোগ পেলে হাতে স্বর্গ পায়।'

রানার কথার তাৎপর্য বুঝতে দু'তিন সেকেন্ড সময় নিল মামুন। 'তারমানে আপনি ইচ্ছে করে...'

'আমি না চাইলে তুমি আমাকে কাবু করতে পারতে না,' বলল রানা। 'যে-কোন অজুহাতে তোমার নাগালের মধ্যে পৌঁছানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল, তুমি যাতে আমাকে জিম্মি করতে পারো। তোমাকে বাঁচানোর এটাই ছিল একমাত্র

পথ।'

'আপনি আমাকে চেনেন না, অথচ আমাকে বাঁচানোর জন্যে এতবড় ঝুঁকি নিলেন?' মামুন হকচকিয়ে গেছে। 'ধস্তাধস্তির সময় ছাদ থেকে পড়ে যেতেও তো পারতেন।'

'ঝুঁকি তো ছিলই। তবে এ-ধরনের ঝুঁকি নিতে আমি অভ্যস্ত।'

রিভলবারটা রানার কোলের ওপর ফেলে দিল মামুন। দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ বসে থাকল সে। তারপর নিচু গলায় বলল, 'ঠিক আছে, চলুন–থানায় পৌঁছে দিন আমাকে।'

'সেটাই উচিত। শেষ পর্যন্ত হয়তো তাই নিয়ে যাব। কিন্তু তার আগে তোমার অসুখটা কি জানতে ইচ্ছে করছে।'

'আমার অসুখ? আমার তো কোন অসুখ নেই!' মামুন হতভম্ব।

'অপরাধী মাত্রই অসুস্থ,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'প্রতিটি অপরাধী মানসিক রোগী। সবার নয়, কোন কোন মানসিক রোগীর চিকিৎসা সম্ভব। সেজন্যেই তোমার অসুখ সম্পর্কে জানতে চাইছি।'

'আমার কোন অসুখ নেই,' ম্লান সুরে বলল মামুন। 'তবে দুঃখ আর ব্যর্থতা আছে। কিন্তু সে-সব আমি কাউকে শোনাতে চাই না।'

'দুঃখ আর ব্যর্থতা কার জীবনে নেই? তারা সবাই কি তোমার মত ব্যাংক ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে? ধরে নিচ্ছি লেখাপড়ার সুযোগ পাওনি তুমি। বাবা গরীব ছিলেন, হয় মারা গেছেন, নয়তো পঙ্গু হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন...'

'আমি ঢাকা ভার্সিটি থেকে ইংরেজিতে এম.এ করেছি। আমার বাবা গরীবও নন, মারাও যাননি...'

'ছি-ছি, লেখাপড়া শিখে...'

'আমার জীবনের সব কথা শুনলে বুঝতে পারবেন কেন আমি এ-পথে এসেছি...'

'চলো, নির্জন কোন চাইনীজ রেস্তোরাঁয় বসে তোমার কথা শুনি।' স্টার্ট দিয়ে আবার গাড়ি ছাড়ল রানা।

দীর্ঘ সময় নিয়ে লাঞ্চ খেলো ওরা। মামুন তার কাহিনী শেষ করার পর রানা শুধু একটা প্রশ্ন করল, 'বলছ মাকে সুখী করার জন্যে এই নোংরা পথে পা বাড়িয়েছ, অথচ তাঁকে তুমি একটা টাকাও পাঠাওনি, ঢাকায় নিয়ে এসে নিজের কাছেও রাখোনি–কারণটা কি?'

'আমার মা এত ভাল, ছিনতাই করা টাকা পাঠাতে বিবেকের সায় পাই না।'

'সুযোগ পেলে তুমি সৎ পথে ফিরবে? কাজটা খুব কঠিন, অমানুষিক পরিশ্রম করতে হবে। নিজের ওপর বিশ্বাস আছে?'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে মামুন বলল, 'থানায় আমার বিরুদ্ধে দশ-বারোটা কেস আছে।'

'সেসব আমি সামলাব,' কথা দিল রানা। 'তুমি কষ্ট করতে রাজি কিনা বলো।'

'তার আগে একটা প্রশ্ন। আপনি কে সেটা বলুন।'

'আমি বাংলাদেশ সরকারের একজন এসপিওনাজ এজেন্ট। জেমস বন্ড-এর নাম শোনোনি? ধরে নাও, তারই মত একজন।'

'ও-সব তো থ্রিলার বইয়ের কাল্পনিক চরিত্র বলেই জেনে এসেছি।'

'বাস্তবেও ওদের অস্তিত্ব আছে,' বলল রানা। 'যোগ্য ছেলে পেলে আমরা তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে এজেন্ট বানাই। ঢাকায় আমাদের সেফহাউস আছে, প্রয়োজনে সেখানে লুকিয়ে থাকার সুযোগ করে দিই।' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে মামুনের হাতে গুঁজে দিল ও। 'যদি আগ্রহ থাকে, এই ঠিকানায় যোগাযোগ কোরো, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে। এই আটচল্লিশ ঘণ্টা পুলিসকে এড়িয়ে থাকতে হবে। তারপর তোমার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার।'

ঝোঁকের মাথায় মামুনকে কথা দিয়ে ফেলে বিপদেই পড়ে যায় রানা। বিসিআই অর্থাৎ বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (অপারেশন্স) সোহেল আহমেদ ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও, মামুন ছিনতাই সহ বিভিন্ন কেসের আসামী শুনে ট্রেনিং কোর্সের ফর্ম দিতে রাজি হলো না, বরং নানা যুক্তি দেখিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল রানা ভুল করতে যাচ্ছে, এই ছেলেকে সুযোগ দেয়াটা বিসিআই-এর জন্যে ঝুঁকি হয়ে যাবে। অগত্যা বাধ্য হয়ে বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের সঙ্গে দেখা করতে হলো রানাকে। কিন্তু তিনিও সোহেলকে সমর্থন করলেন, রানার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে জানিয়ে দিলেন মামুনকে কোন সুযোগ দেয়া যাবে না। কিছুতেই কাজ হচ্ছে না দেখে, জীবনে এই প্রথম বসের সামনে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসল রানা, অনুমতি না চেয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল, বলল, 'আমি তাহলে চলে যাচ্ছি, আর কখনও কোন অনুরোধ নিয়ে আপনার কাছে আসব না।'

'চলে যাচ্ছ মানে?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান, রানা ইতিমধ্যে চেম্বারের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। 'তুমি কি বিসিআই ছেড়ে চলে যাচ্ছ?'

রানা দাঁড়াল। ঘুরল ও। কিন্তু পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল, মাথা ঝাঁকাল না বা মুখেও কিছু বলল না। 'চলে যাচ্ছি,' বলে বিসিআই ছেড়ে চলে যাবার কথাই বোঝাতে চেয়েছে ও, তবে কথাটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করতে বুক কেঁপে গেল, সাহসে কুলাল না। ভাবল, ওর মৌনতাকেই জবাব হিসেবে ধরে নিক বস্।

'এদিকে এসো,' গম্ভীর সুরে আদেশ করলেন রাহাত খান।

ডেস্কের কাছে ফিরে এল রানা।

'ছেলেটা ভাল নয়। তাকে তুমি ভাল করে চেনোও না। অথচ তার জন্যে নিজের ক্যারিয়ার, ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চাইছ?'

রানা নিরুত্তর।

'তার মধ্যে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবার মত কিছু দেখেছ তুমি, তা না হলে তোমার মত অভিজ্ঞ এজেন্টের এরকম জেদ ধরার কথা নয়,' বললেন রাহাত খান। 'কিন্তু দুঃখিত, আমরা মুগ্ধ হবার মত কিছু দেখছি না। তবু, শুধু তোমার ওপর আস্থা আছে বলে ছেলেটাকে একটা সুযোগ দেয়ার কথা ভাবা যায়, এক শর্তে।'

রানা কোন কথা বলছে না।

'শর্তটা হলো, ট্রেনিঙের সময় তার ওপর কড়া নজর রাখা হবে,' কঠিন সুরে বললেন রাহাত খান। 'তার আচরণে সামান্য কোন ত্রুটি পাওয়া গেলে, ট্রেনিং নেয়ার সময় একটু গাফিলতি বা কুঁড়েমির কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে, সঙ্গে সঙ্গে কান ধরে বিদায় করে দেয়া হবে তাকে, কারও কোন সুপারিশ বা অজুহাত শোনা হবে না। ঠিক আছে?'

'জ্বী, স্যার, ঠিক আছে,' জবাব দিল রানা।

'আর সে যদি প্রতিষ্ঠানের কোন ক্ষতি করে, সরাসরি তোমাকে দায়ী করা হবে। কথাটা মনে রেখো।'

'জ্বী, মনে থাকবে,' বলল রানা। 'তবে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'আবার কি অনুরোধ?'

'ছেলেটাকে আমি নিজে ট্রেনিং দেব।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করলেন রাহাত খান, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, দেবে।'

প্রথমে তিন মাস, তারপর ছ'মাস, সবশেষে এক বছরের তিনটে ট্রেনিং অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে শেষ করল মামুন; ট্রেনিং-এর সময় প্রতিটি কঠিন পরীক্ষায় প্রথম হলো সে। একুশ মাসের ট্রেনিং শেষে তাকে ছোটখাট অপারেশনে পাঠানো হলো। ফিল্ডেও খুব ভাল কাজ দেখাল ছেলেটা। পরবর্তী দু'বছর কয়েকটা অপারেশনে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। চার বছরের মাথায় তাকে আফ্রিকায় পাঠানো হলো রানা এজেন্সির অপারেশন্যাল চীফ করে। [পাঠক জানেন, রানা এজেন্সি আসলে বিসিআই-এরই একটা কাভার।]

মামুন সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা ধারণা দিল রানা, শুনে মিসেস ভ্যান্স বললেন, 'দেখা যাচ্ছে, যোগ্য লোকের হাতেই আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব তুলে দিচ্ছ তুমি। তবে ছোকরার বয়েস বেশ কম, এটাই যা একটু অস্বস্তির কারণ। সে নিশ্চয়ই একা নয়, তার সঙ্গে আরও লোকজন থাকবে, তাই না?'

'অবশ্যই লোকজন থাকবে,' বলল রানা। 'সবাই তারা প্রফেশনাল, মিসেস ভ্যান্স।'

'ব্রাসেলসে আর কি কাজ আমাদের?'

'আর্মস স্মাগলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা,' বলল রানা। 'জঙ্গলে খুনীদের পিছু নিতে হলে সঙ্গে অস্ত্র থাকা দরকার।'

'অস্ত্র নিয়ে জিম্বাবুইয়ে ঢুকবে কিভাবে? কাস্টমস আর আইনকে ফাঁকি দিয়ে?'

'জিম্বাবুই পুলিসের ডেপুটি কমিশনার জন বুকানি এক সময় আমার বন্ধু ছিলেন, কিন্তু পরে রাজনৈতিক কারণে তাঁর সঙ্গে আমার বিরোধ সৃষ্টি হয়। তিনি আমাদের এই অভিযানে সহযোগিতা করবেন, নাকি বিরোধিতা করবেন, এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। যদি সহযোগিতা করেন, সঙ্গে অস্ত্র রাখার অনুমতি পেতে কোন সমস্যা হবে না। আর যদি বিরোধিতা করেন, বাঁকা পথ ধরতে হবে।'

'দুনিয়ার সব পুলিসই ঘুষ খায়,' মিসেস ভ্যান্স সবজান্তার সুরে বললেন। 'টাকার প্রয়োজন হলে আমাকে জানাতে ইতস্তত কোরো না।'

'ডেপুটি কমিশনার জন বুকানি খাঁটি দেশপ্রেমিক,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'তাঁর বাবার কয়েকশো কোটি ডলারের সম্পত্তি আছে। ঘুষ সাধলে আমাকে তিনি সোজা জেলে পাঠাবেন।'

'ওহ্। তা আমি আর সিলভিয়া উঠছি কোথায়?'

'ফাইভ স্টার হিলটনের একটা স্যুইটে,' বলল রানা। 'পাশের স্যুইটে আমি আর মামুন থাকব। ওখানেই লোটন নড্‌বেল আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।'

'নড্‌বেলের সঙ্গে কথা বলার সময় আমাকেও সঙ্গে রেখো,' প্রায় নির্দেশের সুরে বললেন মিসেস ভ্যান্স। 'তোমরা কি প্ল্যান-পরিকল্পনা করো আমারও সব জানা দরকার।'

কথা না বলে রানা শুধু মাথা ঝাঁকাল।

মানুষ শিকারী জন বিলফোর্ড হেগেল এখন হারারেতে। বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ সে, কারণ ড্যান হেগেল ছেলেকে আরও তিনটে খুন করার অনুমতি দিয়েছে। সাইফুর রহমান ও জেসিকাকে খুন করার সময় টেলিস্কোপ লাগানো রাইফেল ব্যবহার করেছিল বিলফোর্ড, খোদাবক্স মৃধ্যাকে হত্যা করে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে গাড়ি-বোমা ফাটিয়ে। এবার সে সিদ্ধান্ত নেয়, তিনজন চীনা ক্যান্সার রোগীকে খুন করবে হয় ছুরি দিয়ে, নয়তো বিষ প্রয়োগে। সঙ্গে একটা রিভলবারও আছে, তবে সেটা আত্মরক্ষার জন্যে; একান্ত প্রয়োজন না হলে ব্যবহার করবে না।

তিনহপ্তা হলো রাজধানী হারারেতে রয়েছে বিলফোর্ড, কিন্তু সরকারী ক্যান্সার হাসপাতালের ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারছে না। ডক্টর খোদাবক্স মৃধা খুন হবার পর 'হু'-র কয়েকজন কর্মকর্তা এসেছেন জেনেভা থেকে, ধনকুবের চীনা রোগীদের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা করছেন তাঁরা, কেউ জানে না কি নিয়ে আলাপ হচ্ছে তাঁদের মধ্যে। হাসপাতালের নার্স আর আয়াদের ঘুষ দিয়েও কোন তথ্য আদায় করতে পারেনি বিলফোর্ড। পুলিসের কড়া পাহারা থাকায় নিজেও ভেতরে ঢুকতে পারেনি। তারপর, হঠাৎ, একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির কয়েকজন অপারেটর হাসপাতালের ভেতরে ও বাইরে পাহারা দিতে শুরু করল। খোঁজ নিয়ে বিলফোর্ড শুধু জানতে পারল, ওদেরকে রানা এজেন্সি থেকে পাঠানো হয়েছে।

'হু'-র কর্মকর্তারা গতকাল জেনেভায় ফিরে গেছেন। কিন্তু পুলিস আর রানা এজেন্সির এজেন্টরা এখনও পাহারা দিচ্ছে রোগীদের। বিলফোর্ডের কোন রোগ নেই, তবু রোগী সেজে আউটডোরে প্রতিদিনই ঢুকছে সে, দারোয়ান আর নার্সদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে তথ্য বের করার চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে শুধু জানতে পেরেছে, কোটিপতি ক্যান্সার রোগী তিনজনকেই রাখা হয়েছে হাসপাতালের একধারে, আলাদা একটা ছোট বিল্ডিঙে। পুরানো ও বিশ্বস্ত কয়েকজন নামকরা ডাক্তার আর নার্স ছাড়া সেই বিল্ডিঙে কারও ঢোকার অনুমতি নেই। একজন নার্স জানাল, খোদাবক্স মৃধা খুন হয়ে যাওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই তিনজন রোগীকে হংকঙে ফেরত পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হারারে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে একটা প্রাইভেট জেট অপেক্ষা করছে, দু'একদিনের মধ্যে ওই প্লেন

ওদেরকে হংকঙে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

হাসপাতালে ঢুকে চীনা রোগীদের খুন করা সম্ভব নয়, বুঝতে পেরে বিকল্প পথ বেছে নিল বিলফোর্ড। নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচুর টাকা তুলল সে। ভাড়া করা ফ্ল্যাটে বসে পরচুলা আর নকল গোঁফ লাগিয়ে চেহারা পাল্টাল। আন্ডারগ্রাউন্ডের লোকজনকে ধরে চোরাই একটা অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান কিনল, ভাড়া করল ক্রাইম সিন্টিকেটের ছয়জন মার্সেনারিকে।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত আয়োজন শেষ।

শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে এয়ারপোর্ট। এয়ারপোর্টের দক্ষিণ প্রান্তে গভীর জঙ্গল। এই জঙ্গলে, একটা মাটির ঢিবির ওপর, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান দিয়ে বসিয়ে রাখল ছয়জন মার্সেনারিকে। পজিশনটা বিলফোর্ডেরই বাছাই করা। চীনা ধনকুবেরদের প্রাইভেট জেটটা একটা হ্যাঙ্গারে রাখা হয়েছে, ওই পজিশন থেকে সেটা পরিষ্কার দেখা যায়।

হাসপাতালের আউটডোর থেকেই আসল তথ্যটা পেল বিলফোর্ড। কাল সকালে হংকঙে ফিরে যাবে চীনা রোগীরা। সকালের অপেক্ষায় না থেকে রাতেই মার্সেনারিদের সঙ্গে যোগ দিল সে, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানের পাশে মশারি টাঙিয়ে নাক ডেকে ঘুমাল।

সকালে ঘুম ভাঙার পর তিনজন মার্সেনারিকে শহরে ফেরত পাঠাল বিলফোর্ড। তিনজনই তারা শহরের বিভিন্ন এলাকায় তিনটে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে। আকাশে ওঠামাত্র প্লেনটাকে ফেলে দেবে বিলফোর্ড, আধমাইল হেঁটে পাকা রাস্তায় উঠবে। ওখানে দুটো গাড়ি অপেক্ষা করবে তাদের জন্যে। একটায় একা চড়বে সে, বাকি গাড়িতে উঠবে তিনজন মার্সেনারি। দুটো গাড়ি দু'দিকে চলে যাবে। অন্তত মার্সেনারিদের সে-কথাই জানানো হয়েছে।

শহর ত্যাগ করার আগে তিনবার গাড়ি বদল করবে বিলফোর্ড।

প্ল্যানটা নিখুঁত। এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি গার্ড বা পুলিস তদন্ত শুরু করার আগেই অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান ফেলে পালিয়ে যাবে ওরা। পালাবার আগে পজিশন থেকে নিজেদের সব জিনিস সরিয়ে ফেলা হবে, শুধু গানটা বাদে। গানটা ওখানে পড়ে থাকলেও, তাতে ওদের কারও হাতের ছাপ পাওয়া যাবে না।

সকাল ন'টায় হ্যাঙ্গার থেকে বের করা হলো প্রাইভেট জেট। দশটার মধ্যে ফুয়েল ভরার কাজ শেষ হলো। গ্রাউন্ড ক্রুরা শেষবারের মত চেক করল প্লেন। পাইলট আর স্টুয়ার্ডরা এল সাড়ে দশটায়। রোগীদের নিয়ে অ্যামবুলেন্স পৌঁছুল এগারোটায়। প্লেনের দরজা বন্ধ হলো সোয়া এগারোটায়। এগারোটা তেইশ মিনিটে প্রাইভেট জেট আকাশে ডানা মেলল।

অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গানের সাইটে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে বিলফোর্ড, নিঃশব্দে চুইংগাম চিবাচ্ছে, চেহারায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার লেশমাত্র নেই। নিজেদের জিনিস-পত্র গুছিয়ে দুটো ব্যাগে ভরে নিয়েছে মার্সেনারিরা। আর মাত্র একটা কাজ বাকি—গুলি খেয়ে প্লেনটা আকাশ থেকে পড়ে যাবার পর অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান মোছা, ওটায় যাতে বিলফোর্ডের হাতের ছাপ না থাকে।

ট্যাক্সিওয়ে থেকে ছুটে এসে আকাশে উঠল প্রাইভেট জেট। ওদের পজিশন

থেকে টেকঅফ পরিষ্কার দেখা গেল। ওদের অনেকটা ডান দিকে রয়েছে প্লেন, নাকের সামনে দিয়ে বাম দিকে উড়ে যাবে। সহজ টার্গেট, কোন সমস্যা হবার কথা নয়।

হলোও না। নাক বরাবর সামনে পাঁচশো গজের মধ্যে চলে এল প্রাইভেট জেট, রানওয়ে থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপরে উঠতে পেরেছে ইতিমধ্যে। সাইটে চোখ রেখে ট্রিগার টেনে নিল বিলফোর্ড।

শেলগুলো কোথায় লাগল দেখার সুযোগ ঘটল না, প্রায় চোখের পলকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো প্লেনটা। সিধে হলো বিলফোর্ড, পিছিয়ে এল দুই পা। মার্সেনারিরা দ্রুত সামনে বাড়ল, ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট মুছছে। হোলস্টার থেকে রিভলবার বের করে তিনজনের মাথায় তিনটে গুলি করল বিলফোর্ড। ঠিক সেই মুহূর্তে রানাওয়েতে বিধ্বস্ত হলো জ্বলন্ত প্রাইভেট জেট, ফলে গুলির শব্দ চাপা পড়ে গেল।

ব্যাগ দুটো কাঁধে ফেলে ঘুরল বিলফোর্ড, একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটল। গাড়ি বদলের সময় বাকি তিন মার্সেনারিকেও খুন করবে সে। শহরের ভেতর এত বড় একটা কাণ্ড ঘটাবার পর সাক্ষী রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তিনজনের জায়গায় নয়জনকে খুন করায় বাবা ড্যান ক্লিফোর্ড হেগেন নিশ্চয়ই তার পিঠ চাপড়ে দেবে।

দুই

এয়ারপোর্টে মামুন ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল। প্রথম সাক্ষাতেই অপ্রত্যাশিত ও বিব্রতকর এক ঝাঁক প্রশ্ন করলেন তাকে মিসেস ভ্যান্স। কন্যা হত্যার প্রতিশোধ নিতে আসায় ক্রিমিনালরা তাঁকেও হত্যা করতে চাইতে পারে, এই আশঙ্কা ব্যক্ত করে মামুনকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন–আশপাশে ছদ্মবেশী লোকজন রেখেছ তো? তোমার সঙ্গে রিভলবার আছে? রিভলবারে বুলেট আছে কিনা চেক করেছ? হোটেলের যে স্যুইটে আমি থাকব, সেখানে পাহারা বসানো হয়েছে? ভুলে যেয়ো না, প্লেনটার ওপরও নজর রাখা দরকার, সুযোগ পেলে ওরা বোমা রেখে যেতে পারে।

মামুনের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। হাসিখুশি বিনয়ী ভাবটা চেহারায় অম্লান। এমন কি রানার দিকে একবার আড়চোখে তাকালও না। ভাড়া করা একটা গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করছে সে। হোটেলে যাবার পথে পাশে বসা রানাকে নিচু গলায় জিম্বাবুইয়ের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করল। ডক্টর খোদাবক্স মৃধা হংকং থেকে যে তিনজন চীনা ক্যান্সার রোগীকে হারারেতে আনিয়েছিলেন তারা খুন হয়ে গেছে, এয়ারপোর্টের কাছাকাছি ও শহরের বিভিন্ন এলাকায় কুখ্যাত ছ'জন মার্সেনারির লাশ পাওয়া গেছে। জিম্বাবুই পুলিস জানিয়েছে, হংকংগামী প্রাইভেট জেটটা রানওয়ে ছেড়ে আকাশে ওঠার পরপরই ওটাকে গুলি করে ফেলে

দেয়া হয়। এয়ারপোর্টের পাশের জঙ্গল থেকে একটা অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান উদ্ধার করা হয়েছে।

হোটেলে, নিজের স্যুইটে, দরজা বন্ধ করে মামুনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করল রানা। আগেই খবর দেয়া হয়েছিল, আধ ঘণ্টা পর হাজির হলো লোটন নড়বেল। ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা সে, গায়ের রঙ চকচকে কালো, একহারা গড়ন, শরীরটা যেন পাকানো রশির সমষ্টি, চেহারা দেখে কার সাধ্য বয়েস ধরতে পারে।

নড়বেলের সঙ্গে নিভৃতে কিছুক্ষণ আলাপ করতে চেয়েছিল রানা, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। নার্স সিলভিয়াকে পাহারায় রেখেছিলেন মিসেস ভ্যান্স, পাশের স্যুইটে কে আসছে না আসছে লক্ষ রাখার জন্যে। সিলভিয়া রিপোর্ট করল, 'কালো একটা লম্বা ভূতকে দেখলাম, মিসেস ভান্স। আমাকে দেখে ভেংচাল।'

'সত্যি ভেংচাল?' হুইলচেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসলেন মিসেস ভ্যান্স।

থতমত খেয়ে সিলভিয়া তাড়াতাড়ি বলল, 'কি জানি, তা নাও হতে পারে। বোধহয় শুধু হেসেছে। অসম্ভব কালো তো, আর দাঁতগুলো এত সাদা, দেখে সন্দেহ হলো ভেংচাচ্ছে।'

'ও।' স্যুইটের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন মিসেস ভ্যান্স। পাশের স্যুইটে নক করলেন। দরজা খুলে দিল মামুন। হুইলচেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন তিনি। 'আমাকে খবর দেয়া হয়নি কেন?' রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। 'আমি তো আগেই জানিয়ে দিয়েছি, তোমরা কি প্ল্যান করো আমাকে তা জানতে হবে।'

'আসুন, মিসেস ভ্যান্স,' বলল রানা। 'আমার বন্ধু লোটন নড়বেলের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই—এইমাত্র পৌঁছেছে ও।'

এগিয়ে এসে মিসেস ভ্যান্সের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিল নড়বেল।

'ইংরেজি জানা আছে তো?' মাথাটা একদিকে কাত করে নড়বেলকে নিরীক্ষণ করছেন মিসেস ভ্যান্স, হাতটা দেখেও না দেখার ভান করলেন।

হেসে ফেলল নড়বেল। হাতটা টেনে নিল।

মিসেস ভ্যান্স বিড়বিড় করলেন, 'সিলভিয়া ভুল বলেনি।'

'মানে?' জানতে চাইল মামুন। 'কি বলেছে সিলভিয়া?'

'সে-কথা থাক। আমি একটা প্রশ্ন করেছি,' বললেন মিসেস ভ্যান্স।

নড়বেলের হয়ে জবাব দিল রানা, 'লোটন নড়বেল কেমব্রিজ থেকে ইংরেজিতে মাস্টার্স করেছে, মিসেস ভ্যান্স। সাধারণ আমেরিকান বা ইংরেজদের চেয়ে শুদ্ধ ইংরেজি বলে ও।'

'আচ্ছা! শুনে খুশি হলাম।' ভদ্রমহিলাকে একটু যেন হতাশই দেখাল। তবে এবার তিনি নিজেই হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়ালেন।

'ওর গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না,' বলল রানা। 'তবে সে-সব শুনে আপনার কাজ নেই। শুধু জেনে রাখুন, স্বাধীনতা যুদ্ধের পর জিম্বাবুই টেরোরিস্টদের স্বর্গ হয়ে উঠেছিল, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে নড়বেল।

দুনিয়ার সেরা ট্র্যাকারদের একজন বলা যেতে পারে ওকে। জিম্বাবুইয়ের বনভূমিতে বিশ বছর কাটিয়েছে।'

পিছিয়ে এসে একটা সোফায় বসল নড়বেল। 'আপনার মেয়ে জেসিকা জিম্বাবুইয়ের গভীর জঙ্গলে কি করছিল, মিসেস ভ্যান্স?'

জবাব দিল রানা, 'জেসিকার বয়ফ্রেন্ড ছিল সাইফুর রহমান মৃধা। দক্ষিণ আফ্রিকার একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াত সাইফুর। সে একজন জুলজিস্ট, লেক ক্যারিবা তৈরি হবার পর ওয়াইল্ড লাইফের ওপর তার কি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে জানার জন্যে রিসার্চ করছিল। আফ্রিকান জঙ্গল সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা ছিল, বয়েস বত্রিশ, একা কাজ করতে পছন্দ করত, সঙ্গে কোন অস্ত্র রাখত না।'

বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল নড়বেল।

'কি বললেন?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন মিসেস ভ্যান্স।

'বললাম, এ-ধরনের পাগলামির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে,' জবাব দিল নড়বেল। 'এটাকে ম্যাশো সিনড্রোম বলে, পৌরুষ দেখাবার প্রবণতা–বিপদের তোয়াক্কা না করে মা-জননী প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা। কিন্তু আপত্তিটা হলো, সঙ্গে কোন শহুরে মেয়ে কেন থাকবে। তাছাড়া, প্রকৃতির সান্নিধ্য পাবার জন্যে এত থাকতে ওই এলাকায় কেন যাবে। হাতি আর গণ্ডার মারার জন্যে হাই-পাওয়ারড্ অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে পোচাররা যেখানে ঘুর-ঘুর করছে?'

'সাইফুরকে খুব একটা দায়ী করা উচিত নয়,' মিসেস ভ্যান্স বললেন। 'বুলাওয়েওতে কয়েক হপ্তা ছিল সে, তখনই তার প্রেমে পড়ে যায় জেসিকা। ব্যাপারটা সে আমাকে চিঠি লিখে জানায়। এতে আমার ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু চিঠিটা সে আমার অনুমতি পাবার জন্যে লেখেনি। সাইফুরের সঙ্গে ফিল্ড ট্রিপে যাচ্ছে, এই খবরটা দেয়ার জন্যে লিখেছিল। বিপদের ঝুঁকি আছে, তাই সাইফুর ওকে সঙ্গে নিতে চায়নি। কিন্তু জেসিকার জেদ, সে যাবেই। চিঠিতে আরও জানায়, সাইফুর কোথায় ক্যাম্প ফেলবে তা সে জানে, ক্যাম্প থেকে ফেরার পথে ভিক্টোরিয়া ফলস দেখে আসবে। মি. নড়বেল, আমার মেয়ে জেসিকা পরীর মত দেখতে ছিল। সাধারণ একজন জুলজিস্ট তার কথায় উঠবে-বসবে, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে।'

ক্ষীণ হেসে নড়বেল বলল, 'আপনাকে দেখেই আপনার মেয়ে সম্পর্কে একটা ধারণা পাচ্ছি আমি, মিসেস ভ্যান্স।' রানার দিকে ফিরল সে। 'পোচার, রানা?'

'হ্যাঁ, তবে সাধারণ পোচার নয়। ওই এলাকায় হাতে গোনা মাত্র কয়েকটা গণ্ডার আছে। জিম্বাবুই পুলিস রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে অ্যান্টি-পোচিং পেট্রল ওই জায়গাটাকে পাশ কাটিয়ে গেছে। সাইফুর আর জেসিকার সঙ্গে কথাও বলেছে তারা। ক্যাম্পের চারপাশে পরে কোন পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি। ব্যাপারটা ডাকাতি নয়, কারণ কিছুই চুরি যায়নি। লাশ পাওয়া যায় তিন দিন পর, তার আগে এলাকায় তুমুল বৃষ্টি হয়েছে।'

'বুলেট?'

'সেভেন পয়েন্ট সিক্স-টু মিলিমিটার।'

'ক'টা?'

'তিনটে, একই রাইফেল থেকে। সাইফুরকে দু'বার গুলি করা হয়, পেটে আর মাথায়। জেসিকা মারা গেছে বুকে গুলি খেয়ে।'

'একা একটা লোক?'

'তাই মনে হচ্ছে।'

'ক্লোজ টার্গেট?'

'চার থেকে ছয়শো মিটার দূর থেকে গুলি করা হয়েছে।'

'প্রফেশনাল?'

'ধরে নিতে হয়।'

মিসেস ভ্যান্সের ইঙ্গিতে স্যুইট থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সিলভিয়া, হাতে ব্র্যান্ডির গ্লাস নিয়ে ফিরে এল। নার্সের হাত থেকে সেটা নিয়ে গ্লাসে চুমুক দিলেন ভদ্রমহিলা। সেদিকে একবার তাকিয়ে নড়বেলের দিকে ফিরল রানা, বলল, 'সাইফুরের হাতে লম্বা একটা কাঠি ছিল, শেষ মাথাটা পুড়ে কালচে হয়ে গেছে। ওদেরকে গুলি করা হয়েছে খোলা একটা ক্যাম্পফায়ারের পাশে। আমার ধারণা, আগুনটা কাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছিল সাইফুর, তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল জেসিকা। স্নাইপার তাকেই প্রথমে গুলি করে, কারণ দাঁড়িয়ে থাকায় তারই ছুটে পালাবার সুযোগ ছিল। সরাসরি বুকে গুলি করায় বোঝা যাচ্ছে, লোকটা তার কাজ বোঝে। দ্বিতীয় গুলিটা করে সাইফুর যখন সিধে হচ্ছে। ফলে বুলেটটা পেটে লাগে। গুলি খেয়ে ঘুরে যায় সাইফুর, তৃতীয় বুলেট আঘাত করে মাথার পিছনে, খুলিতে।'

'লোকটা বুলেট অপচয় করেনি,' বলল নড়বেল। 'কোন ছাপই পাওয়া যায়নি?'

'সব ধুয়ে গেছে।'

'কেসিং?'

রানা মাথা নাড়ল।

'প্রফেশনাল।' চিন্তিত দেখাল নড়বেলকে। 'ডক্টর খোদাবক্স মৃধা সম্পর্কে বলো এবার, রানা।'

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জেনেভা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনেক তথ্যই জানতে পেরেছে রানা, সংক্ষেপে সে-সব নড়বেলকে জানাল। খোদাবক্স মৃধা জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে একটা বই লিখেছিলেন, তাতে একটা পরিচ্ছেদ ছিল প্রাচীন চীনা ওষুধ সম্পর্কে। ওই পরিচ্ছেদে তিনি প্রমাণ করেন হাজার বছর ধরে প্রচলিত যে-সব ওষুধ চীনারা তৈরি করছে সেগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। এই বই পশ্চিমা দুনিয়ায় বেশ সাড়া ফেলে। তারপরই 'হু'-র তরফ থেকে গণ্ডারের শিং নিয়ে রিসার্চ করার প্রস্তাব পান তিনি।

গত কয়েক শতাব্দী ধরে চীনারা বিশ্বাস করে আসছে গণ্ডারের শিঙের গুঁড়ো অত্যন্ত উদ্দীপক। ধনী বয়োবৃদ্ধ চীনারা একাধিক উপপত্নী রাখতে পছন্দ করে, তাই যৌনক্ষমতা বৃদ্ধির আশায় গণ্ডারের শিং গুঁড়ো করা পাউডার নিয়মিত সেবন করে তারা। শুধু ধনীদের মধ্যেই এই পাউডার জনপ্রিয়, কাজেই দামও অবিশ্বাস্য। সমস্যা হলো, পোচাররা প্রায় সব গণ্ডার মেরে ফেলায় ওই পাউডার এখন দুনিয়ার সবচেয়ে দামী বস্তু হয়ে উঠেছে। ইয়েমেনেও গণ্ডারের শিং-এর চাহিদা আছে,

ছোরার হাতল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে হংকং আর তাইওয়ানে আকাশচুম্বি দামে বিক্রি হয় অ্যাফ্রোডিযিয়াক হিসেবে।

কথার মাঝখানে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল রানা। তারপর আবার শুরু করল।

খোদাবক্স মৃধা গণ্ডারের শিং নিয়ে গবেষণা করার সময় জিনিসটার বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আবিষ্কার করেন। গবেষণার ফলাফল প্রথমে তিনি লিখে রাখতেন, তারপর কমপিউটরে তুলতেন। তাঁর ল্যাবে খরগোশ, ইঁদুর আর শুয়োর ছিল; এগুলোর ওপর ওই পাউডার ব্যবহার করে তিনি দেখতে পান প্রতিটি প্রাণীর যৌন-উত্তেজনা বেড়ে গেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ওগুলো ক্যান্সারেও আক্রান্ত হয়েছে। গণ্ডারের শিং-এ ক্যান্সার সৃষ্টি করার মত উপাদান আছে, এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করার জন্যে আরও তিনমাস গবেষণা করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তার আগেই তিনি খুন হয়ে গেলেন।

এসব তথ্য জানা গেছে ভাইপো সাইফুর রহমান মৃধাকে লেখা তাঁর একটা চিঠি থেকে। চিঠিটা তিনি হারারে থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায়, সাইফুরের ঠিকানায় পাঠান; কিন্তু সে-সময় সাইফুর জিম্বাবুইয়ের জঙ্গলে থাকায় দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক বিভাগ খোদাবক্স মৃধার কাছে ফেরত পাঠায়। তিনি খুন হবার দু'হপ্তা পর চিঠিটা তাঁর ফ্ল্যাটে ফিরে আসে। ফ্ল্যাটে পুলিস পাহারা ছিল, তারাই এনভেলাপটা গ্রহণ করে। পুলিস বিভাগের ডেপুটি কমিশনার জন বুকানির সঙ্গে দেখা করে তদন্তের স্বার্থে কাজে লাগবে বলে সেটা চেয়ে এনেছে মামুন।

রানা থামতে নড্‌বেল জিজ্ঞেস করল, 'ডক্টর খোদাবক্স মৃধা কি নিয়ে গবেষণা করছেন, এটা খুনীরা জানতে পারল কিভাবে?'

'ডক্টর কোন রকম বিপদের আশঙ্কা করেননি, তাই গবেষণার ব্যাপারটা গোপন রাখার কথাও ভাবেননি,' বলল রানা। 'জিম্বাবুই স্বাস্থ্য বিভাগকে অনুরোধ করে হংকং থেকে তিনজন চীনা ক্যান্সার রোগীকে হারারেতে আনার ব্যবস্থা করেন তিনি। তিনজনই তারা ওই পাউডার ব্যবহার করত। ক্যান্সার হাসপাতালের আলাদা একটা বিল্ডিঙে রাখা হয়েছিল তাদের। হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সরা জানত কেন তাদেরকে হংকং থেকে আনা হয়েছে, ডক্টর খোদাবক্স কি নিয়ে গবেষণা করছেন।'

'তারমানে কি খুনীরা শুধু পোচার নয়,' বলল নড্‌বেল। 'তারা গণ্ডারের শিং পাউডার বানিয়ে বিদেশেও পাঠায়।'

'হ্যাঁ।'

'এতগুলো খুন নিখুঁতভাবে করতে পারল, নিশ্চয়ই এর পিছনে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা ক্রাইম সিন্ডিকেট জড়িত,' মন্তব্য করল মামুন।

নড্‌বেল বলল, 'জিম্বাবুইয়ের বেশিরভাগ বনাঞ্চলকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হলেও, তিন-চার প্রজন্ম আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা কয়েকটা শ্বেতাঙ্গ পরিবার এখনও তাদের ভূ-সম্পত্তি নিজেদের দখলে রেখেছে। এরা বেশিরভাগই ভূমি মন্ত্রণালয়কে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে নিজেদের কয়েকশো একর জায়গা অ্যাকোয়্যার হতে দেয়নি।

রানা বলল, 'এদের সম্পর্কে আর কি জানি আমরা?'

'সবাই এরা পোচারদের পালছে, গাছ কেটে বনজ সম্পদ উজাড় করছে,' বলল নড়বেল। 'সরকারী বনরক্ষীরা এদেরকে যমের মত ভয় পায়। সামন্ত রাজাদের মত জীবনযাপন করে ওরা। সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেয়। প্রত্যেকে কোটিপতি। অনেকেরই ছোটখাট প্রাইভেট সেনাবাহিনী আছে। তাদের এলাকায় সরকারী আইন চলে না। যে যার এলাকায় নিজের ইচ্ছামত আইন তৈরি করে নিয়েছে। পুলিস বা আর্মিকে তারা পাত্তাই দেয় না। প্রাইভেট সেনাবাহিনীতে বেশিরভাগই দাগী ম্যাটাবেলদের নেয়া হয়।'

'প্রতিপক্ষ যে-ই হোক, আমরা তাকে ছোট করে দেখতে পারি না,' বলল মামুন।

নড়বেল বলল, 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো না, রানা।'

'বলো।'

'ডক্টর খোদাবক্স কেন খুন হলেন তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, কিন্তু তার ভাইপো সাইফুর রহমান কেন খুন হলেন?'

'ব্যাপারটা আমার কাছেও রহস্যময় লাগছে,' মিসেস ভ্যান্স বললেন। 'গবেষণার ফলাফল প্রকাশ পেলে পাউডার ব্যবসায়ীর ব্যবসা মার খাবে, চীনা বুড়ো-হাবড়ারা ক্যান্সার হবার ভয়ে ওই জিনিস আর কিনবে না, কাজেই সে ডক্টর খোদাবক্সকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সাইফুর বা জেসিকা তো এ বিষয়ে কিছুই জানত না। ওদেরকে তাহলে খুন করা হলো কেন?'

হাতের চিঠিটা দেখাল রানা। 'এর উত্তর আছে এই চিঠিটায়। চিঠিটা পড়লে বোঝা যাবে, নিজের গবেষণার বিষয়-বস্তু ও অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত ভাইপোকে সব কথা জানাতেন খোদাবক্স। সাইফুর রহমান তাঁকে গণ্ডারের শিং নমুনা হিসেবে দু'একবার পাঠিয়ে ছিল। এই শিং সাইফুর কোত্থেকে যোগাড় করে, তা অবশ্য জানা যায়নি।'

রানা থামতে মামুন বলল, 'ক্যান্সার হাসপাতালের কয়েকজন ডাক্তার ও নার্সের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। সাইফুর রহমান গণ্ডারের শিং পাঠিয়েছেন, গল্পচ্ছলে কথাটা হাসপাতালের অনেককেই বলেছেন ডক্টর খোদাবক্স। ভাইপোকে তিনি নিয়মিত চিঠি লেখেন, এটাও গোপন করেনি। শেষ চিঠিটা পোস্ট করার আগে তিনি একজন ডাক্তারকে বলেছিলেন, সাইফুর জিম্বাবুই থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরেছে কিনা না জেনেই চিঠিটা পোস্ট করছেন।'

'খুনীরা জানত খোদাবক্স কি নিয়ে গবেষণা করছেন। গবেষণার ফলাফল কি হতে যাচ্ছে তা-ও জানত। সেজন্যেই ডক্টর খোদাবক্সকে খুন করে ক্ষান্ত হয়নি, ল্যাবেও আগুন দেয়। ওদিকে সন্দেহের বশে সাইফুর আর জেসিকাকেও ছাড়েনি।'

নড়বেল থামতে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আমরা তাহলে কোত্থেকে তদন্ত শুরু করব, দোস্ত?'

'তার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে,' বলল নড়বেল। 'মিসেস ভ্যান্স কি আমাদের সঙ্গে জিম্বাবুই পর্যন্ত যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' তাড়াতাড়ি বললেন মিসেস ভ্যান্স।

'ব্যাপারটা খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে,' বলল নড়বেল, গম্ভীর। 'এ যেন অনেকটা প্রতিপক্ষকে আবার আঘাত হানার জন্যে প্ররোচিত করা। ওরা যে হিংস্র আর ভয়ঙ্কর, তা কি ব্যাখ্যা করার দরকার আছে?'

'তোমার সঙ্গে একমত আমি,' বলল রানা। 'মিসেস ভ্যান্স, আপনি আরেকবার চিন্তা করে দেখুন।'

'আমি একবার কোন সিদ্ধান্ত নিলে সহজে সেটা পাল্টাই না,' জেদের সুরে বললেন মিসেস ভ্যান্স। 'আমার মেয়েকে যারা খুন করেছে তাদেরকে তোমরা শায়েস্তা করার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করছ, এটা আমি খুব কাছ থেকে দেখতে চাই। সেই সঙ্গে এ-ও চাই যে আমার নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করবে তোমরা। তোমরাই বরং চিন্তা করে দেখো, আমার শর্ত পূরণ করা সম্ভব কিনা। কোন রকম সংশয় থাকলে এখনই বলো, আমি অন্য এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করি।'

নড়বেলের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'ঠিক আছে,' বলল নড়বেল। 'রানা, রাজধানীতে আমাদের কারও থাকা দরকার। আমি চাই মামুন থাকুক, কারণ ওর সঙ্গে পুলিস বিভাগের সম্পর্ক ভাল। হারারের আন্ডারগ্রাউন্ডে কি ঘটছে না ঘটছে সে খবরও রাখতে হবে ওকে।'

সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তদন্ত শুরু করার আগে অস্ত্র দরকার আমাদের,' মনে করিয়ে দিল নড়বেল। 'রাইফেল আর হ্যান্ড-গান। হারারে থেকে প্রথমে আমরা বুলাওয়েওতে যাব, ওখানে একদিন থেকে প্লেন নিয়ে যাব ভিক্টোরিয়া ফলস-এ। অপারেশন্যাল এরিয়া থেকে ওটাই সবচেয়ে কাছাকাছি শহর। ওখানে ভাল কয়েকটা হোটেল আছে, মিসেস ভ্যান্সের থাকতে কোন অসুবিধে হবে না।'

'আমি হোটেলে থাকব, আর তোমরা?' রানাকে প্রশ্ন করলেন মিসেস ভ্যান্স।

রানা বলল, 'নড়বেল আর আমি জঙ্গলে ঢুকব।'

'উদ্দেশ্যটা কি? জঙ্গলে তোমরা কি পাবে বলে আশা করছ?'

'জঙ্গলে কি পাব তা এখানে বসে বলা বা আন্দাজ করা সম্ভব নয়, মিসেস ভ্যান্স,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'খুনী বা খুনীরা যদি কোন সূত্র ফেলে গিয়ে থাকে, ইতিমধ্যে সব ধুয়ে-মুছে গেছে।'

'তাহলে শুধু শুধু জঙ্গলে ঢোকা কেন? এত আয়োজন, এত টাকা খরচ, তা কি শুধু তোমাদের বেড়ানো বা শিকারের শখ মেটানোর জন্যে?'

'টাকা?' নড়বেলকে হতভম্ব দেখাল। 'মিসেস ভ্যান্স, কোথাও নিশ্চয়ই ভুল বোঝাবুঝির একটা ব্যাপার ঘটেছে। রানা আমার বন্ধু, প্রয়োজনে বিপদের সময় পরস্পরকে আমরা সাহায্য করি। ও ডেকেছে, আমি চলে এসেছি—এখন যদি আমাকে নরকেও নিয়ে যেতে চায়, হাসতে হাসতে যাব। এরমধ্যে লাভ-লোকসান বা টাকার কোন ভূমিকা তো নেই।'

'রানা?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন মিসেস ভ্যান্স।

'আমি তো লরেলিকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি, এই অপারেশনে রানা এজেন্সি কোন ফি নেবে না,' বলল রানা।

'ও. বুঝতে পেরেছি। টাকা নেবে না, তাই নিজেদের প্ল্যান সম্পর্কে সব কথা আমাকে বলতে চাইছ না।'

রানা বলল, 'টাকা নিলেও বলতাম না, মিসেস ভ্যান্স। শুধু আপনার নিরাপত্তার স্বার্থে নয়, কেসটার স্বার্থেও।'

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হলো না,' বলে হুইলচেয়ার ঘুরিয়ে নিলেন মিসেস ভ্যান্স। মামুন দরজা খুলে দিতে স্যুইট থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নড়বেল বলল, 'ওনাকে নিয়ে ঝামেলা হতে পারে, রানা।'

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, উনি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক বান্ধবীর মা,' বলল রানা। 'তার সম্মানে ওঁকে কিছু বলা যাবে না।'

দরজার দিকে এগোচ্ছে সিলভিয়া, ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আপনারাও একটা ভুল করছেন। ওনার মেয়ে খুন হয়েছে, অথচ তার খুনীকে ধরার জন্যে টাকা খরচ করার সুযোগ দিচ্ছেন না ওঁকে।'

মামুন জিজ্ঞেস করল, 'ওনার নার্স হিসেবে কতদিন কাজ করছ তুমি?'

'দু'মাস। গত ছ'মাসের খবর জানি, পাঁচজন নার্সের চাকরি খেয়েছেন। আমি ছ'নম্বর। আগের তুলনায় ওনার মেজাজ এখন প্রায় মাখনের মত।'

চোখ কপালে তুলে অসহায় একটা ভঙ্গি করল মামুন।

ব্যবসার কাজ ম্যানেজারকে বুঝিয়ে দিতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় নিল লোটন নড়বেল। তাকে আর মামুনকে নিয়ে আরেকবার আলোচনায় বসল রানা। অস্ত্র সংগ্রহ, লাইসেন্স পাওয়া, জিম্বাবুই পুলিসের সহযোগিতা আদায়, এই তিনটে সমস্যার কথা তুলল ও। আলোচনার শুরুতেই মামুন জানাল, 'এসব বিষয়ে জিম্বাবুই পুলিস বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে আগেই আমার কথা হয়েছে। কোন সমস্যা হবে না।'

মামুন যে জাদু জানে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরদিন হারারেতে পৌঁছুনোর পর। হোটেল ইন্টারকনে উঠল ওরা, আগের মতই পাশাপাশি দুটো স্যুইটে। আধ ঘণ্টাও পেরোয়নি, মিসেস ভ্যান্সের সঙ্গে দেখা করতে এলেন আমেরিকান অ্যামব্যাসাডর জন মিচেল। কংগ্রেস সদস্যা লরেলি তাঁকে ফোন করে মায়ের হারারে সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা আভাস দিয়েছে। মিসেস ভ্যান্সকে সম্ভাব্য যে-কোন সাহায্য-সহযোগিতা দেয়ার প্রস্তাব দিলেন তিনি। ফল হলো অপ্রত্যাশিত। মিসেস ভ্যান্সের মনে বিপুল রাগ আর ক্ষোভ জমে ছিল, এই সুযোগে সব উপুড় করে ঢেলে দিলেন। মার্কিন জনগণের কাছ থেকে আদায় করা ট্যাক্স জিম্বাবুই সরকারকে প্রতি বছর দান করা হচ্ছে, কিন্তু তাতে লাভটা হচ্ছে কি? জিম্বাবুইয়ে কি মানবাধিকার রক্ষিত হচ্ছে? মার্কিন নাগরিক জেসিকা খুন হয়ে গেল, অথচ খুনীরা কেউ ধরা পড়ল না কেন? এই ব্যর্থতার দায়ভার কি অ্যামব্যাসাডর জন মিচেলের ওপরও খানিকটা বর্তায় না? সুরক্ষিত প্রাসাদের মত এমব্যাসীতে বসে মার্কিন জনগণের কি স্বার্থটা তিনি দেখছেন? বিবেক বলে কিছু থাকলে এখনও তিনি পদত্যাগ করেননি কেন?

এতসব প্রশ্ন শুনে রীতিমত ঘেমে গেলেন জন মিচেল। আর সেই সুযোগটাই

কাজে লাগাল মামুন। নার্ভাস অ্যামব্যাসাডরকে নিজেদের স্যুইটে ডেকে এনে খাতির করে বসাল. রানা আর নড্বেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, তারপর কি ধরনের সাহায্য দরকার সে-সম্পর্কে একটা ধারণা দিল। তিনটে মার্কিন পাসপোর্ট দরকার ওদের–এমব্যাসী থেকে পাসপোর্ট ইস্যু করার রেওয়াজ থাকায় জন মিচেলের জন্যে এটা কোন সমস্যাই নয়। মাথা ঝাঁকিয়ে জন মিচেল জানালেন, না, কোন সমস্যা নয়।

'বারো ঘণ্টার মধ্যে সম্ভব?' জানতে চাইল মামুন।

'কাল সকালে হলে চলে না?' কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বললেন অ্যামব্যাসাডর। 'আমি মাত্র বাইশ ঘণ্টা সময় চাইছি।'

'ঠিক আছে, তাহলেও হবে,' রাজি হলো রানা।

অ্যামব্যাসাডর বিদায় হবার আধঘণ্টা পর নক হলো দরজায়। দরজা খুলে দিয়ে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানাল মামুন। সিভিল ড্রেসে স্বয়ং ডেপুটি কমিশনার জন বুকানি রানার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। লম্বা-চওড়ায় সমান, প্রকাণ্ড একটা ফুটবল বললেই হয় ভদ্রলোককে। একে কালো, তার ওপর কালো সুট পরে এসেছেন, কালো জুতো জোড়াও আয়নার মত চকচক করছে।

'মাসুদ রানা,' এগিয়ে এসে ওর সঙ্গে কোলাকুলি করলেন জন বুকানি। 'অনেক বছর পর আবার দেখা হলো, আশা করি পুরানো দিনের সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে আবার আমরা বন্ধু হতে পারব।'

'আপনাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমিও লড়েছি, সেজন্যে আমি আজও গর্ব অনুভব করি,' বলল রানা। 'প্রথম দিকে আমরা বন্ধুই ছিলাম, কিন্তু যুদ্ধের পর বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে এমন লড়াই বাধল, বন্ধু হয়ে গেল শত্রু, শত্রু হয়ে উঠল মিত্র।'

'আমারই দুর্ভাগ্য, আপনি ম্যাটাবেলদের পক্ষ নিয়েছিলেন,' হাসিমুখে বললেন জন বুকানি। 'কিন্তু আমাকে নডেবেল গোত্রের পক্ষ নিতে হয়। আমার আরও দুর্ভাগ্য, একজন নডেবেল হয়েও লোটন ম্যাটাবেলদের পক্ষে যুদ্ধ করে।'

'নড়েবেলরা শ্বেতাঙ্গদের হয়ে লড়ছিল,' বলল লোটন। 'নীতির প্রশ্নে আমি আপোস করতে পারিনি।'

'এখন কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে,' বললেন বুকানি। 'যুদ্ধের এত বছর পরও শ্বেতাঙ্গদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এতটুকু কমেনি। অদ্ভুতই বলতে হবে, নড়েবেলরা শ্বেতাঙ্গদের এখন দু'চোখে দেখতে পারে না, অথচ ম্যাটাবেলরাই শ্বেতাঙ্গদের ক্রীতদাস বনে গেছে।'

'আমার মনে পড়ছে,' বলল রানা, 'আপনাকে একবার আমি রাইফেলের সাইটে পেয়েছিলাম। দূরত্ব খুব বেশি ছিল, তাই আরও কাছে পৌঁছুবার সিদ্ধান্ত নিই। ওটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। আপনি পালিয়ে যাবার সুযোগ পান। সেদিন রাতে আমাদের দলের চারজনকে আপনি খুন করেন। তাদের মধ্যে লোটনের চাচাতো ভাইও ছিল।'

'সেটা ছিল যুদ্ধ,' বললেন জন বুকানি। 'আমরা পরস্পরের শত্রু ছিলাম।

কিন্তু সময় পাল্টেছে। রানা এজেন্সির অপারেটররা হারারের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে যে অবদান রাখছে, ভাষায় তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। মি. মামুনের প্রতি সত্যি আমি কৃতজ্ঞ।'

'কাজের কথায় আসি,' সুযোগ বুঝে প্রসঙ্গটা তুলল মামুন। 'মি. বুকানি, আরাম করে বসুন, প্লীজ।'

সবাই ওরা সোফায় বসল।

মামুন বলল, 'মিসেস ভ্যান্স, আপনার কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন।'

'আমি মা। জানি মেয়েকে আর ফিরে পাব না। কিন্তু খুনীকে ধরায় আপনাদের ব্যর্থতা আমার পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়।' হুইলচেয়ারের হাতলে ঘুসি মারলেন মিসেস ভ্যান্স। 'আমার তো সন্দেহ, পুলিস ঘুষ খেয়ে খুনীকে পালাতে দিয়েছে।'

জন বুকানি হকচকিয়ে গেলেন।

'তা যদি সত্যি হয়, আমিও পুলিসকে ঘুষ দিতে চাই,' বললেন মিসেস ভ্যান্স। 'খুনীরা যা দিয়েছে, আমি তারচেয়ে বেশি টাকা দেব–জেসিকার খুনীকে হাজির করুন আমার সামনে।'

সিলভিয়াকে ইঙ্গিত করল রানা। এগিয়ে এসে হুইলচেয়ারটা ঘোরাল নার্স। 'মিসেস ভ্যান্স, আপনি ক্লান্ত, চলুন বিশ্রাম নেবেন...'

রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন মিসেস ভ্যান্স। চেয়ারটা স্যুইট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, বেরিয়ে গেল, তারপরও সবাই শুনতে পেল তার গলা, 'আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। খুনের বদলে খুন, জানের বদলে জান...'

'সন্তানহারা মায়ের বিলাপ,' বিড়বিড় করল মামুন। 'মি. বুকানি, আপনি কিছু মনে করবেন না।'

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ডেপুটি কমিশনার বললেন, 'না. ব্যাপারটা আমি উপলব্ধি করতে পারছি। ঠিক আছে, বলুন, মি. মামুন–কি সাহায্য পেলে খুশি হন?'

'কি দরকার তা তো আপনাকে আমি আগেই জানিয়েছি,' বলল মামুন। 'অস্ত্র আমরাই যোগাড় করব, দরকার শুধু লাইসেন্স।'

'এখানে আসার আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে,' জানালেন জন বুকানি। 'তিনি লাইসেন্স দিতে নিষেধ করেননি। কাগজ-পত্র সবই আমি সঙ্গে করে এনেছি।' ব্রীফকেস খুলে সেগুলো বের করে মামুনের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

'ভেরি গুড,' লাইসেন্স হাতে পেয়ে মৃদু হাসল মামুন। 'আমরা কৃতজ্ঞ, মি. বুকানি।'

'আমার কিছু কথা আছে, মন দিয়ে শুনুন,' রানাকে বললেন বুকানি। 'তার আগে বলুন, জঙ্গলে আপনারা কবে ঢুকতে চান?'

'কে বলল আমরা জঙ্গলে ঢুকব?'

ডেপুটি কমিশনার হাসলেন। 'আপনারা লেকে মাছ ধরতে আসেননি। মি. মামুন, যখনই কোন সমস্যা হবে, আমাকে ফোন করে জানাবেন।'

'অবশ্যই।'

রানা জানতে চাইল, 'বলছিলেন, আপনার কিছু কথা আছে–কি কথা?'

'জঙ্গলে ঢুকবেন বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে,' পরামর্শ দেয়ার সুরে বললেন জন বুকানি। 'পুলিসদের বলা আছে, ইনফর্মারদের পুরস্কার দেয়া যাবে না। কিন্তু সে নিষেধ আপনাদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। জঙ্গলের কিছু লোক অত্যন্ত গরীব, স্বর্ণমুদ্রা পেলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও মুখ খুলবে।'

'ধন্যবাদ, মি. বুকানি,' বলল রানা।

'আরেকটা কথা,' বললেন ডেপুটি কমিশনার। 'মি. মামুনকে শুধু আর্মস লাইসেন্স নয়, আরেকটা কাগজ দিয়েছি। তাতে সই করেছেন ওয়াইল্ডলাইভ অ্যান্ড ট্যুরিজম মিনিস্টার। কাগজটায় বলা হয়েছে, আপনারা সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন, কাজেই জঙ্গলে যদি কোন পোচারকে হাতি বা গণ্ডার শিকার রত দেখতে পান, খুন করার জন্যে গুলি করতে পারবেন।'

জন বুকানি বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর লোটন নড়্‌বেল রানাকে বলল, 'আকাশের সূর্য আজ পশ্চিম দিক থেকে ওঠেনি তো, দোস্ত?'

মামুনের দিকে তাকিয়ে রানা হাসছে। 'প্রশ্নটা বরং ওকে জিজ্ঞেস করো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মামুন বলল, 'ডেপুটি কমিশনার আমাকে পছন্দ করেন। রাজধানীর আইন-শৃঙ্খলার রক্ষার কাজে ওদেরকে আমরা অনেক সাহায্য করি।'

মাথা নাড়ল নড়্‌বেল। 'এর মধ্যে আরও কিছু আছে।'

'জন বুকানির মেয়ে আমার বান্ধবী,' বলল মামুন, আড়চোখে একবার রানার দিকে তাকাল। 'উনি হয়তো পাত্র হিসেবেও আমাকে অপছন্দ করেন না।'

নড়্‌বেল আর রানা, দু'জনেই এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

হারারে থেকে বুলাওয়েইয়ো মাত্র এক ঘণ্টার ফ্লাইট। সকাল ন'টায় ল্যান্ড করল গালফস্ট্রীম। মেইন টার্মিনাল থেকে বেশ খানিকটা দূরে একজোড়া ল্যান্ড-রোভারের পাশে এসে থামল পাইলট। পুলিস কার-এর মাথায় আলো জ্বলছে। দ্বিতীয় ল্যান্ড-রোভারটা তোবড়ানো, গায়ে কাদা লেগে আছে। প্লেনের স্টুয়ার্ড সিঁড়ি নামিয়ে দিতে প্লেনে উঠে এল দু'জন লোক, দু'জনই কালো। একজন পুলিস ইন্সপেক্টরের ইউনিফর্ম পরে আছে, দ্বিতীয় লোকটার পরনে স্থানীয় কৃষকের ঢোলা জোব্বা, আলখেল্লার মত দেখতে। কৃষক লোকটার হাতে বড় একটা ক্যানভাস ব্যাগ।

দু'জনকেই চেনে লোটন নড়্‌বেল। তরুণ কৃষক তার চাচাতো ভাই, নুকুম্বে। নড়্‌বেলের ফোন পাবার পর কালই স্থানীয় চোরাবাজার থেকে অস্ত্র কিনেছে সে। কয়েক বছর পর দেখা, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল ওরা।

ইন্সপেক্টরের বয়েস চল্লিশ, রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল সে। 'আমি টিকোলো, মি. রানা–জন টিকোলো। লোটন নড়্‌বেল আমার ভাইয়ের বন্ধু।'

সেলুন টেবিলের ওপর তুলে ক্যানভাস ব্যাগটা খুলল নুকুম্বে। ডেপুটি কমিশনারের দেয়া কাগজের তাড়াটা পকেট থেকে বের করে ইন্সপেক্টরের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। লাইসেন্সের বিপরীতে অস্ত্রগুলো মেলাতে দশ মিনিট লাগল টিকোলোর। প্রতিটি কাগজে সই করল সে, তারপর বলল, 'মি. রানা। আপনি,

লোটন নড়বেল বা মি. মামুন যখনই যে অস্ত্র সঙ্গে রাখবেন, সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সটাও পকেটে রাখতে ভুলবেন না।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

রাইফেল আর পিস্তলগুলোর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন মিসেস ভ্যান্স। 'গড অলমাইটি! তোমরা মাত্র তিনজন লোক, এত অস্ত্র দিয়ে কি করবে?'

রানা ব্যাখ্যা করল। 'প্রতিটি অস্ত্রের আলাদা বৈশিষ্ট্য আর ভূমিকা আছে, মিসেস ভ্যান্স। সবগুলো আমরা সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াব, ব্যাপারটা তা নয়।' হাত তুলে দেখাল ও। 'ওটা একটা হাই-ভেলোসিটি রাইফেল, লং-রেঞ্জের জন্যে। পাশেই দেখতে পাচ্ছেন লাইটওয়েট পয়েন্ট টু-টু, সাইলেন্সার সহ। বাকি দুটো রাইফেল একে/ফরটিসেভেন, ক্লোজ-রেঞ্জের জন্যে। পিস্তলগুলো কোল্ট ১৯১১, লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ।' একটা একে/ফরটিসেভেন আর একটা পিস্তল ক্যানভাস ব্যাগে ভরল ও, সঙ্গে থাকল দুটো লাইসেন্স, তারপর নুকুম্বেকে বলল, 'প্লীজ, এগুলো যেন সন্ধের আগেই হারারেতে, মি. মামুনের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।'

মাথা ঝাঁকাল নুকুম্বে। 'সন্ধের অনেক আগেই পেয়ে যাবেন তিনি।' কাঁধ থেকে একটা ব্যাগ নামাল সে, ছুঁড়ে দিল নড়বেলের দিকে। 'কুডু হরিণের শুকনো মাংস।'

নড়বেলের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। ব্যাগের ভেতর হাত ভরে শুকনো মাংস বের করল সে। কিলো দুয়েক ওজন হবে, দেখতে শুকনো চামড়ার মত।

'ওই জিনিস মানুষ খায়?' নাক সিটকালেন মিসেস ভ্যান্স।

'জঙ্গলে পানি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না,' বলল রানা। 'লবণ দেয়া এই মাংস খেয়েই কয়েক হপ্তা টিকে থাকতে হবে আমাদের।'

নুকুম্বে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্লেন থেকে নেমে গেল।

রানাকে এক পাশে ডেকে এনে ইন্সপেক্টর টিকোলো জানতে চাইল, 'এখান থেকে আপনারা সরাসরি ভিক্টোরিয়া ফলস-এ যাচ্ছেন, তাই না, মি. রানা?'

'হ্যাঁ।'

'আমি নিজেও ওখানে যাচ্ছি, ওই এলাকায় মাসখানেক ডিউটি দিতে হবে।'

'নির্দেশটা কি হঠাৎ পেয়েছেন? ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে?'

'জ্বী, মি. রানা। কাল রাতে।'

'তিনি আপনাকে আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে পাঠাচ্ছেন?'

মাথা নাড়ল টিকোলো। 'জ্বী-না। সেটা সময়ের অপচয় হবে। আমার মত মি. বুকানিও জানেন যে জঙ্গলে আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না আপনাদের। মি. বুকানি ওখানে আমাকে পাঠাচ্ছেন মি. মামুনের অনুরোধে, মিসেস ভ্যান্সের নিরাপত্তার দিকটা দেখতে।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কিন্তু ওখানে তো রানা এজেন্সির কয়েকজন এজেন্টকে আগেই পাঠিয়েছে মামুন, ঠিক হয়েছে তারাই মিসেস ভ্যান্সের ওপর নজর রাখবে।'

'সাবধানের মার নেই, তাই মি. মামুন পুলিসের সাহায্যও নিচ্ছেন,' বলল

ইন্সপেক্টর।

'আপনি তাহলে ভিক্টোরিয়া ফলস-এ ডিউটি দেবেন?' জানতে চাইল রানা।

'ঠিক তা নয়। ভিক ফলস আর ভিঙ্গা, এই দুই শহরে ঘোরাফেরা করব। দু'জায়গার স্টেশনেই রেডিও আছে, সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখব। প্রয়োজন হলে আপনারাও যোগাযোগ করবেন।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আপনি কি এই প্লেনেই ভিক ফলস-এ যেতে চান?'

হেসে ফেলল ইন্সপেক্টর। 'চাই, আপনাদের যদি কোন অসুবিধে না হয়।'

'কিসের অসুবিধে!'

পনেরো মিনিট পর আকাশে উঠল প্লেন। টিকোলোকে নিয়ে পিছন দিকে বসে আছে রানা; স্থানীয় রাজনীতি, অর্থনীতি আর পোচিং সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে। লোটন নড়বেল বসেছে সেলুনে, মিসেস ভ্যান্স আর সিলভিয়ার সঙ্গে কফি খাচ্ছে। এক টুকরো হরিণের মাংস চিবাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন মিসেস ভ্যান্স, খবরের কাগজেও মন বসাতে পারছেন না। 'আপনারা জঙ্গলে ঢুকছেন কখন?' নড়বেলকে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'কাল ভোরে।'

'সাইটে কখন পৌঁছুবেন?'

'পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।'

'মানে?'

'কত দ্রুত এগোতে পারব, তার ওপর।'

'গডড্যাম ইট! প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন মিসেস ভ্যান্স। 'কত দ্রুত এগোতে পারবেন, সেটা আপনার জানা নেই?'

'না। সাইটে পৌঁছুতে দু'দিন লাগতে পারে, পাঁচ দিনও লাগতে পারে।'

'কেন?'

'আমরা ট্র্যাক—ছাপ খুঁজব। জমিনের অবস্থার ওপর বহু কিছু নির্ভর করে। মাটি কতটুকু শুকনো, কোনদিকে বইছিল বাতাস, এখন কোনদিকে বইছে।'

সামনের দিকে এত বেশি ঝুঁকলেন মিসেস ভ্যান্স, মনে হলো হুইলচেয়ার থেকে পড়ে যাবেন। 'আমাকে ভুল বোঝাবেন না। পুলিসের সবগুলো রিপোর্ট পড়েছি আমি। ওদের ট্র্যাকার দিনের পর দিন এলাকাটা চষে বেড়িয়েছে, কিন্তু কিছুই পায়নি।'

'মিসেস ভ্যান্স, আমরা কয়েক হপ্তার পুরানো ট্র্যাক খুঁজতে যাচ্ছি না। যাচ্ছি তাজা ট্র্যাক পাওয়ার আশায়।'

'কেন?'

'কারণ, আপনার মেয়ে যখন খুন হয়, এলাকায় হয়তো আরও লোক ছিল—পরে তারা কি ঘটেছে দেখার জন্যে ফিরে আসতেও পারে।'

'ও, আচ্ছা। সিলভিয়া, আমাকে আরও এক কাপ কফি।'

তিন

সেবাঙ্গুয়ে নদীর উঁচু পাড়ে গুড়ি মেরে বসে আছে রানা, হাতের রাইফেল আলগাভাবে ধরা, তবে প্রতিটি ইন্দ্রিয় সতর্ক। ওর সামনে নদী পেরুচ্ছে নড়বেল। এই মুহূর্তে বুক সমান পানিতে রয়েছে সে, মাথার ওপর তোলা হাতে দুটো রাইফেল। নদীর সারফেস আর উল্টোদিকের তীরে কুমীর আছে কিনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ রাখছে রানা। আজ তিনদিন হলো জঙ্গলে ঢুকেছে ওরা। গোয়াই আর শ্লিবিজি নদী পিছনে ফেলে এসেছে, মার্ডার সাইটে পৌঁছবার আগে এটাই শেষ নদী পেরুতে হবে ওদেরকে। জিম্বাবুইয়ের জঙ্গল রানার পরিচিত, তবে এদিকটায় আগে কখনও দীর্ঘ সময় কাটায়নি, তাই ভাল করে দেখাও হয়নি। গত তিনদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছে, এটাই হলো আসল আফ্রিকা। এলাকাটা সমতল নয়, ঢেউ খেলানো; এখানে-সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে আছে ব্যাসল্ট পাথরের উঁচু-নিচু পাহাড়। শুকনো কালাহারি মাটিতে মোপানি জঙ্গল বেশ ঘন, গভীর বনভূমিই বলা চলে; ওগুলোর মাঝখানে ঘাস আর ঝোপে ঢাকা তেপান্তর, তা-ও ঢেউ খেলানো। নদীর অববাহিকা, বিশেষ করে উপত্যকা, বিভিন্ন জাতের গাছপালায় সমৃদ্ধ, তার মধ্যে কালো আবলুস আর বেওব্যাব গাছই বেশি।

জিম্বাবুইয়ের এদিকটা লোটন নড়বেলের পুরানো বিচরণ ক্ষেত্র, তার জন্মও এই এলাকায়। বোধহয় সেজন্যেই তার আচরণে অসতর্ক, অমনোযোগী একটা ভাব লক্ষ করে রানা। তিন দিন আগে ল্যান্ড-রোভার থেকে নামার পর, গাড়িটাকে ফিরে যেতে দেখার সময়, রানা ওর স্বভাববিরুদ্ধ একটা কাজ করে বসে। 'যুদ্ধক্ষেত্রে যতবার আমার সঙ্গে ছিলে তুমি, প্রতিবার আমিই ছিলাম তোমার লীডার,' নড়বেলের কাঁধে টোকা দিয়ে বলে ও। 'তবে যে-ক'দিন এদিকের জঙ্গলে আছি, তুমিই আমার বস্।'

সন্তুষ্টির হাসি হেসে নড়বেল জবাব দেয়, 'ঠিক আছে। তবে লোকজনের সামনে আমাকে তোমার স্যার না বললেও চলবে।'

নড়বেল ঘুরছে, তার নিতম্বে একটা লাথি কষল রানা, তারপর ওরা পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে জঙ্গলে ঢুকল।

অকুস্থলে পৌঁছানোর আগে কোন সূত্র পাবে বলে আশা করছে না; তবু সামনের জমিন প্রায় আঠার মত আটকে থাকল নড়বেলের দৃষ্টি, আর রানা চোখ রাখল চারপাশে। সঙ্গে তিনটে রাইফেল নিয়েছে ওরা–একটা হাই-ভেলোসিটি ৩০০.০৬, একটা একে/ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল, একটা লাইটওয়েট সিঙ্গেল–শট.২২। দলবদ্ধ পোচারদের সামনে পড়ে গেলে একে/ফরটিসেভেন কাজে লাগবে। ·২২-তে সাইলেন্সার লাগানো আছে, খরগোস বা ওই রকম ছোটখাট প্রাণী শিকার করার জন্যে ব্যবহার করা যাবে, যদি পাতা ফাঁদে ওগুলো ধরা না পড়ে।

.২২ ব্যবহার করতে হয়নি। প্রথম দুই সন্ধ্যায় নদীর কাছাকাছি গেইম-ট্র্যাকে ফাঁদ পেতেছিল নড়বেল। প্রথমবার একজোড়া খরগোস ধরা পড়ে, দ্বিতীয় দিন একটা বুশ-বাক বা ছোট হরিণ। আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াও ওদের সঙ্গে ছুরি আর কোমরে জড়ানো নাইলন রশি আছে। এক গাছের ডাল মাটিতে নামিয়ে এনে রশির সাহায্যে আরেক গাছের গোড়ায় বেঁধে ফাঁদ পাতা হয়েছিল। ছুরি দিয়ে খরগোস আর হরিণের মাংস কেটে লবণ মাখায় ওরা, তারপর আগুনে পুড়িয়ে খায়। মাংস খুব একটা নরম করা যায়নি, তবু মনে হলো এত স্বাদের ডিনার জীবনে খুব কমই খেয়েছে।

শিকার করার মত প্রাণীর কোন অভাব নেই। ইম্পালা, জেব্রা আর জিরাফ অসংখ্য। মাঝে মধ্যে মোষও দেখা গেছে, তবে ওগুলোর কাছ থেকে সাবধানে দূরে সরে এসেছে ওরা। মুগ্ধ করা প্রাণী হলো কুডু; মাথার বাঁকা শিং যেন অলঙ্কার, রাজকীয় একটা ভঙ্গি নিয়ে চলাফেরা করে। গর্ভবতী হাতির একটা পালকে পাশ কাটিয়েছে ওরা। কাল বিকেলে দেখা পেয়েছিল একটা গণ্ডারের। ঘটনাটা ওদেরকে বিস্মিত করেছে। নড়বেলের জানামতে, পোচাররা এলাকার একটা গণ্ডারও রাখেনি। প্রথমে ওরা পায়ের ছাপ দেখতে পায়। সেই ছাপ এক ঘণ্টা অনুসরণ করার পর গণ্ডারটার সাক্ষাৎ মেলে। ওটাকে দেখে রাগে রানার গায়ে যেন আগুন ধরে যায়।

'না-না,' রানার ভুল ধারণা ভাঙার জন্যে ব্যাখ্যা করল নড়বেল। 'পোচাররা নয়, গেইম ডিপার্টমেন্টই ওটার শিং কেটে নিয়েছে।'

'সেকি! কেন?'

'জাম্বিয়া থেকে পোচাররা এসে গণ্ডার মেরে শিং নিয়ে যায়,' বলল নড়বেল। 'ওগুলোকে বাঁচাবার জন্যেই জিম্বাবুই সরকারের নির্দেশে গেইম ডিপার্টমেন্ট প্রতিটি গণ্ডারের শিং কেটে নিয়েছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'তবে তাতেও কোন লাভ হয়নি। পোচাররা এখনও গণ্ডার মারছে।'

'কেন?' জানতে চাইল রানা। 'শিং না পেলে মেরে কি লাভ?'

বিষণ্ন দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল নড়বেল, আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'কারণ দুটো। এক, ওই বিশেষ গণ্ডারটির পিছু নিয়ে ভবিষ্যতে যাতে সময় নষ্ট করতে না হয়। পিছু নিয়ে একটা গণ্ডারের কাছাকাছি আসতে অনেক সময় কয়েকদিনও লেগে যায়। দুই, পোচারদের বসরা শিংঅলা গণ্ডার মারতে যে টাকা দেয়, শিংবিহীন গণ্ডার মারতেও ওই একই টাকা দেয়।'

'কিন্তু কেন?'

'ব্যাখ্যাটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে, তবে সত্যি ও সহজ। মাত্র পাঁচ বছর আগে দু'হাজারেরও বেশি কালো গণ্ডার ছিল জিম্বাবুইয়েতে। এখন আছে মাত্র তিনশো পঞ্চাশটা। এই সাড়ে তিনশোর অর্ধেক গণ্ডারকে প্রাইভেট ল্যান্ডে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছে।

'গণ্ডার মারার জন্যে পোচারকে যারা টাকা দেয় তাদের কাছে প্রচুর শিং আছে, কিন্তু জ্যামিতিক হারে দাম বাড়ানোর জন্যে সেই শিং বা শিং থেকে তৈরি পাউডার খুব অল্পই বিক্রি করা হয়। এখন তারা চাইছে দুনিয়ার বুক থেকে কালো

গণ্ডার পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাক। যেদিন তা ঘটবে, গণ্ডারের শিং হয়ে উঠবে সোনার হরিণ। ফার ইস্ট-এ দশ গ্রাম পাউডার নাইন-ক্যারেট নির্ভেজাল সাদা হীরের চেয়ে বেশি দামে বিকোবে। সরকারী হিসাবে, ওই বেজন্মাদের কাছে প্রায় পাঁচ টন পাউডার আছে। এরচেয়ে নোংরা ব্যবসা আর হয় না, রানা।'

এক সময় দেখতে সুন্দর ছিল গণ্ডারটা, শিং কেটে নেয়ায় শুধু যে সৌন্দর্য হারিয়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে ভারসাম্যও হারিয়েছে। দেখে মায়া লাগছে রানার, সেই সঙ্গে রাগও বাড়ছে। 'একটা শিঙের জন্যে কত পায় পোচাররা?'

'গড়ে পাঁচশো ডলার। জাম্বিয়ায় একজন মানুষের বাৎসরিক আয়ের সমান,' বলল নড়বেল। 'তবে ঝুঁকি খুব বেশি। বনরক্ষীদের খুন করার লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। পোচাররা মারাও পড়ে। কিন্তু সমস্যা হলো, গেইম ডিপার্টমেন্টের লোকবল খুব কম। ওদেরকে মাত্র একটা হেলিকপ্টার দেয়া হয়েছে, গোটা দেশের জঙ্গলের ওপর নজর রাখার জন্যে।'

দুর্ভাগা প্রাণীটার দিকে পিছন ফিরল ওরা। রানা বলল, 'পোচারদের দেখতে পেলে গুলি করব আমরা–খুন করার জন্যে। তোমার সঙ্গে লাইসেন্স আছে।'

'দেখতে পাবার সম্ভাবনা কম,' বলল নড়বেল। 'তারা আরও পশ্চিম দিকে অপারেশন চালায়। আমরা যেটাকে পিছনে ফেলে এলাম, এই এলাকায় সে কোন সঙ্গিনী খুঁজে পাবে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ বংশ বিস্তারের কোন আশা নেই, এমনিতেই অস্তিত্ব হারাবে।'

রানা বলল, 'একটা যখন আছে, আরও একটা থাকতে পারে–অন্তত আশা করতে দোষ কি।'

নদীর ওপারে পৌঁছে ·২২-টা বাম কাঁধে ঝোলাল নড়বেল। পিছন দিকে না তাকিয়ে ঝোপের ফাঁক গলে সামনে এগোল, একে/ফরটিসেভেনটা বাগিয়ে ধরে আছে। রানা জানে, নড়বেল এখন নিশ্চিত হতে চাইছে; নদী পেরিয়ে ও যেখানে উঠবে সেখানে বা আশপাশে কোথাও কোন বিপদ ওত পেতে নেই। ভয় শুধু সশস্ত্র লোকজনকে নয়, হিংস্র প্রাণীরাও পানি খাবার জন্যে এদিকে আসতে পারে।

প্রায় পনেরো মিনিট পর নদীর তীরে ফিরে এল নড়বেল। পানিতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে কুমীর আছে কিনা দেখে নিয়ে ইঙ্গিত করল রানাকে।

মার্ডার সাইট থেকে তখনও পনেরো কিলোমিটার দূরে ওরা, প্রথম ছাপ চোখে পড়ল। উবু হয়ে বসে দীর্ঘ কয়েক মিনিট শুকনো মাটি পরীক্ষা করল নড়বেল। রানা বসেনি, চারপাশে তীক্ষ্ণ চোখ বুলাচ্ছে। এক সময় সিধে হয়ে বৃত্তাকারে চক্কর দিতে শুরু করল নড়বেল, প্রতিবার বৃত্তটা আরও বড় হচ্ছে। তারপর আবার উবু হলো সে, হাত-ইশারায় কাছে ডাকল রানাকে। আঙুল তাক করে লক্ষণ বা চিহ্নগুলো দেখাল–শুয়ে পড়া ঘাস, ভাঙা ডাল, এলোমেলো মাটি। 'কাল রাতে এখানে ওরা ক্যাম্প ফেলেছিল,' বলল সে। 'দু'জন লোক। কালো।'

'কালো বুঝলে কিভাবে?'

'গাড়ির টায়ার কেটে তৈরি স্যান্ডেল ছিল পায়ে।' মাটিতে ফুটে থাকা নকশা দেখাল নড়বেল। 'শ্বেতাঙ্গ হলে আমাদের মত বুশ বুট পরে থাকত।

ওয়াইল্ডলাইফ রেঞ্জারও নয়, কারণ তারাও বুট পরে। এদের টাকা নেই, থাকলে অন্তত বুট না হলেও জুতো পরত।'

'গণ্ডার শিকারী?'

'মনে হয় না। গণ্ডার শিকারীরা জিম্বাবুইয়ের লোক হোক বা মোজাম্বিক থেকে আসুক, সাধারণত আর্মি বুট পরে। এরা দু'জন সম্ভবত স্থানীয় পোচার, মাংস আর চামড়ার লোভে এসেছে। এদের কাছে অনেক সময় রাইফেলও থাকে না, ফাঁদ পেতে শিকার ধরে।' ডান দিকে হাত তুলল নড়বেল। 'ওদিকে, প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে, বাটোংকা গ্রাম। ছাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওদিক থেকেই এসেছে তারা। যাচ্ছে লেকের দিকে। ওদের গন্তব্য সম্ভবত মার্ডার সাইটের কয়েক কিলোমিটার উত্তরে।'

'আপাতত তুমিই টীম লীডার,' বলল রানা। 'বলো কি করা উচিত।'

সিধে হয়ে হাতঘড়ি দেখল নড়বেল। ঘুরে বাম অর্থাৎ লেকের দিকে মুখ করল। 'নদীর উজান, অর্থাৎ গ্রামটা থেকে এসে থাকলে ধরে নিতে হয় এদিকে নিয়মিত শিকার করে তারা, এলাকাটা ভালভাবে চেনে। জেসিকা আর সাইফুর খুন হবার সময়, আগে-পরে, কিছু একটা দেখেও থাকতে পারে। এরা যে ধরনের পোচার, খেয়ে-পরে কোনরকমে জীবন ধারণ করে। যদি কিছু ঘটতে দেখে, বা ঝড়-বৃষ্টির আগে কোন ছাপ টপকায়, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারবে। বাটোংকা হলে সহজে মুখ খুলতে চাইবে না, তবে দু'একটা স্বর্ণমুদ্রা দেখালে গান গাওয়ানোও সম্ভব বলে মনে করি।'

'চলো তাহলে, গান গাওয়াই,' বলল রানা। 'ওদের ছাপ খুঁজে পাবে?'

মাথা ঝাঁকাল নড়বেল। 'সাবধানেই এগিয়েছে ওরা, তবে পিছু নিতে অসুবিধে হবে না। টেকনিকটা তোমার মনে আছে?'

'অবশ্যই,' বলে হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আর পাঁচ ঘণ্টা দিনের আলো পাব। চলো, রওনা হই।'

মোপানি গাছের একটা ডাল ভাঙল নড়বেল, প্রায় এক মিটার লম্বা, ছুরি দিয়ে শাখা আর পাতা ছেঁটে ফেলে সামনে বাড়ল। পঞ্চাশ মিটার এগোবার পর রানা পিছু নিল, নড়বেলের প্রতিটি নড়াচড়া মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে। এই ট্র্যাকিং পদ্ধতি একজোড়া লোকের জন্যে আদর্শ। সামনের ছাপ খুব কাছ থেকে অনুসরণ করছে নড়বেল, হাতের লাঠি দিয়ে অস্পষ্ট চিহ্নগুলো রানাকে দেখাচ্ছে। একগোছা ঘাস একদিকে নুয়ে আছে, মাটিতে স্যান্ডেলের নকশা ফুটে আছে, গাছ থেকে খসে পড়া শুকনো ডাল স্থানচ্যুত হয়েছে—এ-সবই দিক নির্দেশক। যখন কোন চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না, শেষ চিহ্নের পাশে সরে দাঁড়াচ্ছে রানা, ওকে ঘিরে চারপাশে বৃত্ত তৈরি করছে নড়বেল ছাপের খোঁজে। পরবর্তী দু'ঘণ্টায় এরকম দু'বার ঘটল ব্যাসল্ট পাথরের বিস্তৃতির ওপর, নরম মাটিতে আবার ছাপ খুঁজে বের করতে কয়েকশো মিটার দীর্ঘ বৃত্ত তৈরি করে ঘুরতে হলো নড়বেলকে। ট্র্যাকার হিসেবে রানার নিজের ট্রেনিং ও অভিজ্ঞতা কম নয়, তারপরও এই দু'ঘণ্টার নড়বেলের নৈপুণ্য মুগ্ধ করল ওকে।

তিন ঘণ্টা পর থামল নড়বেল। বসল সে, মাটির কাছাকাছি চোখ নামিয়ে

ভাল করে পরীক্ষা করল সামনের জমিন। খানিকটা ধুলো নিল, নাকের কাছে তুলে শুঁকল, তারপর ঝরে পড়তে দিল আঙুলের ফাঁক গলে। হাত-ইশারায় রানাকে কাছে ডাকল সে। 'এখানে থেমে পেশাব করেছে। খুব বেশি হলে ঘণ্টাখানেক আগে। আমরাও তাই করব।'

'কেন?' রানা খানিকটা অধৈর্য।

ব্যাখ্যা করল নড়বেল। 'কারণ দশ মিনিট আগে একটা তিতির পাখিকে চমকে দিয়েছি আমরা, চিৎকার দিয়ে ডাল ছেড়ে উড়ে যায় ওটা। তার পাঁচ মিনিট আগে একদল বেবুনকে বিরক্ত করেছি–ওদের চিৎকারও অনেক দূর পর্যন্ত শোনা গেছে। পঁচিশ মিনিট আগে একটা হানি-গাইড পাখি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল, উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে একটা মৌচাকে নিয়ে যাওয়া। ওটার চিৎকারও অনেক দূর থেকে শোনা গেছে। সামনের ছোকরা দু'জন যদি অভিজ্ঞ হয়, এ-সব চিৎকার আর ডাক শুনে আমাদের অস্তিত্ব আর গতিবিধি সম্পর্কে সজাগ হয়ে গেছে। কাজেই আধঘণ্টার জন্যে থেমে ওদের মন থেকে সন্দেহ দূর করা দরকার।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'সত্যি তুমি লীডার হওয়ার উপযুক্ত, লোটন।'

নড়বেলও হাসল। 'এ-সব আমাকে ঠেকে শিখতে হয়েছে, দোস্ত। শিখতে পেরেছিলাম বলেই তিন বছরের যুদ্ধে মারা পড়িনি।'

মাটির রঙ এক জায়গায় গাঢ়, যেখানে প্রস্রাব করা হয়েছে। সেদিকে আঙুল তুলে রানা জিজ্ঞেস করল, 'লোকগুলো সশস্ত্র বলে মনে করো?'

শর্টসের চেইন খুলে পেশাব করছে নড়বেল। 'ঠিক বলতে পারছি না। তবে অস্ত্র সহ গেইম রেঞ্জারদের হাতে ধরা পড়লে অতিরিক্ত পাঁচ বছর জেল খাটতে হবে।'

'এদিকের লোকজন তো নড়বেল ভাষায় কথা বলে, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমার ভাষায়,' বলল নড়বেল। 'তবে সবাই নয়। যে ভাষাতেই কথা বলুক, কমবেশি বুঝব আমি।'

সূর্য ডোবার এক ঘণ্টা আগে ওদেরকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল ওরা।

পাখিদের বিরক্ত করায় আবার আধঘণ্টা করে দু'বার থামল নড়বেল। রানা ধৈর্য হারায়নি, বরং বন্ধুর সতর্কতা আর নৈপুণ্য দেখে মনে মনে প্রশংসা করল–লাঠি তাক করে যে ছাপ ওকে দেখাল সে, এত অস্পষ্ট যে দেখিয়ে না দিলে চোখে পড়ার কথা নয়।

লেকের কিনারা থেকে আর মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে রয়েছে, এই সময় নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল ওরা।

'লেকের কিনারা পর্যন্ত যাবে না ওরা,' বলল নড়বেল। 'আমার ধারণা, ইতিমধ্যে এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে ক্যাম্প ফেলেছে। গেইম ট্রেইলে ফাঁদ পাতবে, এই মুহূর্তে হয়তো সেই কাজেই ব্যস্ত।'

'ফাঁদ পেতে আশপাশে লুকিয়ে থাকবে?'

মাথা নাড়ল নড়বেল। 'ক্যাম্পে ফিরে যাবে। দু'জন চারটে করে ফাঁদ

পাতবে, আলাদা জায়গায়। ক্যাম্প থেকে ঠিক সন্ধের আগে বেরুবে আবার, ফাঁদে কিছু পাওয়া গেলে নিয়ে আসবে ক্যাম্পে।'

'ক্যাম্পটা কোথায় ফেলবে?'

'কোন গর্তে বা নিচু জমিনে, যাতে আগুন জ্বাললে দূর থেকে দেখা না যায়।'

'আমরা এখন তাহলে কি করব?'

'আমরা কাজ শুরু করব ঠিক সন্ধের আগে। প্রথমে আমি যাব, শুধু শর্টস পরে, অস্ত্র ছাড়াই। ৩০০.০৬ নিয়ে আমাকে তুমি কাভার দেবে। আমি কোনাকুনি যাব, ফলে গুলি করার জন্যে খোলা জায়গা পাবে তুমি।'

দু'ঘণ্টা পর ইম্পালার পোড়া নিতম্ব চিবাচ্ছে রানা, আগুনের ধারে বসা দুই পোচারের সঙ্গে কথা বলতে শুনছে নড্‌বেলকে।

সূর্য অস্ত যাবার সময় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরে শুয়ে ছিল ওরা, দেখল দু'জন বাটোংকা আদিবাসী নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে আসছে। একজনের কাঁধে একটা ইম্পালা, আরেকজনের হাতে ছোট আকৃতির দুটো বুশ-বাক। যে লোকটার কাঁধে ইম্পালা রয়েছে, তার বাম হাতে একটা রাইফেল। পাথরের ওপর শুয়ে লোকগুলোকে হরিণের চামড়া ছাড়াতে দেখল ওরা। ছাড়ানো চামড়াগুলো কাছাকাছি একটা গাছের ডালে শুকোবার জন্যে ঝুলিয়ে রাখা হলো। ওই গাছেরই গোড়ায় রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রাখল একজন।

আগুন জ্বালছে পোচাররা, রাইফেল দুটো রানার হাতে ধরিয়ে দিল নড্‌বেল, গা থেকে শার্ট খুলে পাথর থেকে নেমে পড়ল। একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে আগুনটার দিকে এগোল সে, হাত দুটো শরীরের পাশ থেকে যথেষ্ট দূরে। ঝোপ থেকে ছিটকে সরে গেল একটা হায়েনা, তখনই তাকে দেখতে পেল লোক দু'জন। ক্ষিপ্রবেগে একজন ছুটল গাছটার দিকে, রাইফেলটা দরকার।

ছুটন্ত লোকটাকে ৩০০.০৬-এর সাইটে ধরে রেখেছে রানা, তবে গুলি করার প্রয়োজন হলো না। বাটোংকা ভাষায় কথা বলে উঠল নড্‌বেল। হাত দুটোও কাঁধের দু'পাশে লম্বা করে দিল। ছুটন্ত লোকটা ইতিমধ্যে গাছের কাছে পৌঁছে গেছে, রাইফেলও হাতে নিয়েছে, তবে ব্যারেলটা তোলেনি–মাজল মাটির দিকে তাক করে রেখেছে। নরম সুরে আশ্বাস দিচ্ছে নড্‌বেল, ধীর পায়ে সামনে এগোচ্ছে।

জানা গেল দুই ভাই তারা। কর্তৃপক্ষকে ওদের সম্পর্কে রিপোর্ট করা হবে না, এ-কথা শুনে নড্‌বেল আর রানাকে খাতির করে বসাল, এক্স-আর্মি র‍্যাকস্যাক থেকে ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি একটা পাউচ বের করে ধরিয়ে দিল ওদের হাতে, পাউচে কলা পচিয়ে বানানো সুরা আছে।

তিনজন মিলে পাউচ খালি করে ফেলল ওরা। রানা এ-সব খায় না শুনে দুই ভাই অবাক হলেও কোন মন্তব্য করল না। রানা যাতে বুঝতে পারে, প্রতিটি বাক্য ভাষান্তর করছে নড্‌বেল।

'একটা সাদা মেয়ে আর একটা শ্যামলা ছেলে কয়েক হপ্তা আগে এখান থেকে কাছাকাছি একটা জায়গায় খুন হয়েছে, সেজন্যেই আসতে হলো

আমাদের।'

বড় ভাইয়ের বয়েস হয়েছে, পাক ধরেছে মাথার দু'পাশের চুলে, গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'খারাপ, অত্যন্ত ক্ষতিকর, এমন কি আমাদের জন্যেও বিপজ্জনক। এলাকায় পুলিস আর ট্র্যাকার গিজগিজ করছিল, অন্তত দুই হপ্তা আমরা এদিকে পা ফেলতেই পারিনি।'

'শিকার করাই কি তোমাদের একমাত্র পেশা?' জানতে চাইল নড্‌বেল।

বড় ভাই মাথা নাড়ল। 'পেশা বলাটা ভুল। মাংস তো পানির দরে বেচতে হয়, আর বুলাওয়েও থেকে মাসে মাত্র একবার এক লোক এসে চামড়া নিয়ে যায়। ভাল একটা ইম্পালা চামড়ার জন্যে মাত্র পঞ্চাশ সেন্ট দেয়, অথচ বুলায়ওয়েওতে নিয়ে গিয়ে সেটাই বিক্রি করে তিন ডলারে।'

'ওরা নিজেরা কেন বুলাওয়েওতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে না?' জানতে চাইল রানা।

'ওখানে যেতে দু'ডলার বাস ভাড়া লাগে, যেতে আসতে সময়ও লাগে দু'দিন। তারপরও ঝামেলা আছে, ডিলার অর্থাৎ ক্রেতাকে খুঁজে বের করতে হবে।' বড় ভাইয়ের দিকে ফিরল নড্‌বেল। 'ওদেরকে কে বা কারা খুন করতে পারে, তোমার কোন ধারণা আছে?'

লোকটা মাথা নাড়ল, কপালে চিন্তার দুটো ভাঁজ। আড়চোখে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকাল একবার। দু'জনেই বেশ নার্ভাস। 'আমরা কিছুই জানি না। পুলিস আমাদের গ্রামে এসে সবাইকে জেরা করেছে। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারেনি।'

'আমরা পুলিস নই,' বলল নড্‌বেল। 'যদি কোন তথ্য পাই, পুলিসকে তা জানাবও না।'

বড় ভাই আবার মাথা নাড়ল। 'আমরা কিছু দেখিনি, কিছু শুনিওনি। সে-সময় এলাকায় ছিলাম না। পুলিস ট্র্যাকার নিয়ে এসেছিল। তারা কোন ছাপ খুঁজে পায়নি, কারণ পরদিন সকালে খুব জোরাল বৃষ্টি হয়—ইতিমধ্যে খুনী কেটে পড়েছে।'

নড্‌বেল বাক্যটা যখন ভাষান্তর করছে, রানার মাথায় কি যেন একটা ধরা পড়ল। নড্‌বেলের কব্জিতে টোকা দিল ও, বলল, 'ঠিক শুনেছ, খুনী শব্দটা ব্যবহার করল লোকটা—'খুনীরা' নয়?'

'হ্যাঁ। খুনী।'

আগুনটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, 'তোমার অভিজ্ঞতা কি বলে, কতদিন পরপর জঙ্গলে শিকার করতে আসে ওরা?'

'প্রায়ই আসে। আর শুধু এই নির্দিষ্ট এলাকাতেই। কারণ, গ্রামে আরও কিছু পোচার আছে, তারাও নিজেদের এলাকার বাইরে যায় না। এই নিয়ম আমি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি।'

'আর পোচারদের সবচেয়ে জরুরী কাজ হলো হিউম্যান ট্র্যাক-এর সন্ধানে থাকা, তাই না? গেইম রেঞ্জারদের হাতে ধরা পড়লে জেলে পচতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

কোমরে হাত দিয়ে বেল্ট থেকে ছোট চামড়ার পাউচটা বের করল রানা, ভেতরে স্বর্ণমুদ্রা আছে। চকচকে হলুদ একটা মাত্র মুদ্রা ছুঁড়ে দিল আগুনের ওপারে। দুই ভাইয়ের মাঝখানে পড়ল সেটা।

আগুনের আভায় জ্বলজ্বল করছে ওটা, দুই ভাইয়ের কেউই চোখ ফেরাতে পারছে না। একটা স্বর্ণমুদ্রা মানে পাঁচ বছরের আয়। একযোগে, ধীরে ধীরে, মুখ তুলে নড়বেলের দিকে তাকাল তারা।

'মদ আর মাংসের দাম,' বলল নড়বেল।

দুই ভাই পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর ছোট ভাই জানতে চাইল, 'এখানে আপনাদের কে পাঠিয়েছে?'

'মেয়েটার মা,' বলল নড়বেল। 'দশ লাখ গরুর মালিক তিনি।' আঙুল তুলে স্বর্ণমুদ্রাটা দেখাল। 'আর ওগুলো...তাও দশ লাখের কম হবে না। তিনি তাঁর মেয়ের খুনীকে শাস্তি দিতে চান।'

আগুনে বাতাস লাগায় শোঁ-শোঁ আওয়াজ হচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে হায়েনার হাসি। আপনমনে ইম্পালার নিতম্ব চিবাচ্ছে রানা, যেন দুনিয়ার কোন ব্যাপারে এতটুকু মাথাব্যথা নেই। দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর, ধীরে ধীরে, হাত বাড়িয়ে স্বর্ণমুদ্রাটা হাতে নিল বড় ভাই, খাকি শর্টসের পকেটে সাবধানে গুঁজে রাখল। আবার ছোট ভাইয়ের দিকে তাকাল সে। ছোট ভাই সায় দিয়ে মাথাটা এত সামান্য কাত করল, সত্যি কাত করেছে কিনা সন্দেহ হলো নড়বেলের।

বড় ভাই বলল, 'এক লোকের কথা জানি, বহু বছর ধরে এদিকেই শিকার করছে। লেপার্ড আর চিতা শিকার করে, আর শিকার করে...আর কি শিকার করে জিজ্ঞেস করবেন না। না, টাকার জন্যে নয়–শিকার করা তার নেশা। তার ছাপ আমরা চিনি। সে দামী সিগারেটও খায়।'

'সে কি আফ্রিকান?' জিজ্ঞেস কলল নড়বেল। 'মানে কালো?'

'না, কালো নয়,' বলল বড় ভাই। হাত তুলে বাম দিকটা দেখাল। ওদিকে লেক আছে। 'ওদিক থেকে আসা-যাওয়া করে সে।'

রানার দিকে ফিরল নড়বেল। 'শ্বেতাঙ্গ এক লোক, বিঙ্গা থেকে আসে। এরা যতটুকু বলছে, তারচেয়ে অনেক বেশি জানে। জিম্বাবুইয়ের জঙ্গলে শ্বেতাঙ্গদের সাংঘাতিক দাপট। যার কথা বলছে, সে শুধু লেপার্ড আর চিতা নয়, মানুষও শিকার করে, কাজেই তাকে এরা ভয় পায়। দামী সিগারেট একমাত্র শ্বেতাঙ্গরাই খায়।'

'তাকে ওরা দেখেছে,' বলল রানা।

'অবশ্যই।'

'স্বীকার করাও,' নির্দেশ দিল রানা।

বড় ভাইয়ের দিকে ফিরে নড়বেল বলল, 'লোকটাকে তোমরা দেখেছ।'

'বিঙ্গার পিছনে খোঁজ নিন,' বলল বড় ভাই। 'তবে খুব বেশি পিছনে নয়। এই পাঁচ কিলোমিটার।'

কথাগুলো ভাষান্তর করল নড়বেল, তারপর যোগ করল, 'বিঙ্গায় স্থায়ীভাবে

খুব কম শ্বেতাঙ্গই বসবাস করে। আমেরিকান পীস কোর-এর কিছু লোক, কিছু মিশনারি, হাসপাতালে কয়েকজন ডাক্তার। বিঙ্গার পাঁচ কিলোমিটার পিছনে কয়েকটা হলিডে কটেজ আছে, মালিক বুলাওয়াওয়ের কয়েকজন কোটিপতি শ্বেতাঙ্গ। হলিডে কটেজ ছাড়া আর আছে বিশ-পঁচিশটা খামার–কয়েকটা শ্বেতাঙ্গ পরিবার কুমীর পালে। কারও কারও ফিশিং লাইসেন্সও আছে। ওখানে লোকটাকে পাব বলে আশা করছি।'

'পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

'দিন দুই।'

'তাহলে ভোরে রওনা হব আমরা,' বলল রানা।

চার

গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণে ডক্টর খোদাবক্স নিহত হবার কয়েক হপ্তা পর তিনজন চীনা ক্যান্সার রোগী খুন হয়ে গেল, একই দিনে শহরের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গেল আন্ডারগ্রাউন্ডের ছয়জন কুখ্যাত অপরাধীর লাশ। জেসিকা-সাইফুর জোড়া খুনের সঙ্গে এ-সব ঘটনার সম্পর্ক আছে, কাজেই তদন্ত হওয়া দরকার–হারারেতে মামুনকে রেখে যাবার পিছনে এটাই ছিল রানার যুক্তি।

রাজধানীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা এখনও শ্বেতাঙ্গরা নিয়ন্ত্রণ করে, তবে ট্রেড ইউনিয়ন ও অপরাধ জগৎ পুরোপুরি কালোদের দখলে। এই জগতের সবচেয়ে বড় উপাধি হলো 'সম্রাট'। দু'একজন রাজনীতিক, দু'তিনজন সাংবাদিক আর উঠতি সম্রাট সহ সব মিলিয়ে বিশ-পঁচিশজন লোককে খুন করে ধরা না পড়লে আন্ডারগ্রাউন্ডে তাকে নতুন সম্রাট বলে গ্রহণ করা হয়। ড্রাগ, অস্ত্র ও দেহ-ব্যবসার মাধ্যমে বিশ-পঁচিশ কোটি টাকা কামাতে পারলেও এই উপাধি পাওয়া যায়। হারারে সম্রাটদের প্রত্যেকেরই বৈধ ব্যবসায়িক ফ্রন্ট আছে–অস্ত্র-ব্যবসায়ীরা এঞ্জিনিয়ারিং ওঅর্কশপ-এর মালিক, ড্রাগ ব্যবসায়ীদের আছে ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানী, আরেকদল সিকিউরিটি সার্ভিস-এর নামে মার্সেনারি ভাড়া খাটায়, স্মাগলাররা খুলে বসেছে ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট বা ইনডেন্টিং ফার্ম।

মামুন দু'জন ইনফর্মারকে ডেকে ভাল করে বুঝিয়ে দিল কি ধরনের তথ্য তার দরকার। তারপর একজনকে পাঠাল এঞ্জিনিয়ারিং ওঅর্কশপগুলোয় ঢুঁ মারার জন্যে, আরেকজনকে খোঁজ নিয়ে দেখতে বলল নিহত মার্সেনারিরা কোন সিকিউরিটি সার্ভিস-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল কিনা।

দু'দিন পর প্রথমজন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। আর্মস ডিলারদের কেউ অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট্ গান বিক্রির কথা স্বীকার করেনি।

দ্বিতীয় ইনফর্মার ফিরে এসে অদ্ভুত এক গল্প শোনাল মামুনকে। বিভিন্ন সিকিউরিটি সার্ভিস ও ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সিতে পরিচিত লোক আছে তার, তাদের সঙ্গে দেখা করে নিহত মার্সেনারিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছিল

সে। দ্বিতীয় দিন পাঁচ-ছ'টা কোম্পানীতে যায়, কোন তথ্য না পেয়ে বাড়ি ফিরে আসছিল, এই সময় অচেনা এক লোক রাস্তায় থামায় তাকে, হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিয়ে লোকজনের ভিড়ে মিশে যায়।

কাগজটা চেয়ে নিয়ে মামুন দেখল তাতে একটা মাত্র লাইন লেখা–'আঙ্কেল, কাল সকাল এগারোটায় সিটি টাওয়ারের ফিফথ ফ্লোরে নির্দ্বিধায় চলে আসুন, ড্যাডি আপনাকে সাহায্য করবেন–টুইংকল।'

ইনফর্মারকে বিদায় করে দিয়ে হাতের তালুতে চিবুক ঠেকিয়ে চিন্তা করতে বসল মামুন। চোখ বুজলে এখনও রোমহর্ষক দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পায়। এক বছর আগের ঘটনা, হারারের নামকরা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর 'সিংহানি'-তে বই কিনতে গিয়েছিল সে। বিশাল স্টোর, মাঝামাঝি জায়গায় বুক সেকশন। মামুন যখন ঢোকে, ভেতরে প্রচুর লোকজন ছিল। সময়ের হিসাব রাখেনি, বই আর পত্রিকা বাছাই করতে মগ্ন হয়ে পড়ে সে। এক সময় হঠাৎ প্রায় চমকে উঠে খেয়াল করল, বুক সেকশনে সে ছাড়া আর কেউ নেই। হাতঘড়ি দেখল, মাত্র সন্ধে সাতটা। ঠিক এই সময়টায় বুক সেকশনে ক্রেতারা ভিড় করে। এক ঘণ্টা আগে সে যখন এই প্যাসেজে আসে, প্রায় বিশ-পঁচিশজন লোক ছিল। তারা তো কেউ নেইই, পরবর্তী প্যাসেজগুলোতেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কান পাতল মামুন। গোটা ডিপার্টমেন্ট স্টোর নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে আছে। কি ঘটছে বুঝতে না পেরে বই না নিয়েই কাউন্টারের দিকে ফিরতে শুরু করে সে। বুক সেকশন পিছনে ফেলে ডল অ্যান্ড টয় সেকশনে পা দিয়েছে, হঠাৎ সামনের কোন একটা প্যাসেজ থেকে পিস্তলের গুলি হলো। একটা কোণ থেকে উঁকি দিয়ে সেদিকে তাকাতেই কালো সুট পরা দু'জন লোককে প্যাসেজের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখল মামুন, দু'জনেরই বুকে গুলি লেগেছে। পিছিয়ে আসতে যাবে মামুন, সাত কি আট বছরের বাচ্চা একটা মেয়ে এক গাদা খেলনার পিছন থেকে বেরিয়ে এল, দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে তার দিকে, আতঙ্কে চোখ দুটো বিস্ফারিত।

'আঙ্কেল, আমাকে বাঁচান!' বলে মামুনকে জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। এক ঝটকায় তাকে বুকে তুলে নিয়ে ছুটল মামুন, বুক সেকশনের দিকে ফিরে আসছে।

পিছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল, সেই সঙ্গে হিংস্র গলার নির্দেশ, 'যে-ক'টা লাশ পড়ে পড়ুক, মেয়েটা যেন পালাতে না পারে!'

বুক সেকশনে পৌছুতে পারেনি মামুন, তার আগেই আবার গুলির শব্দ হলো।

কে যেন বলল, 'বাইরে আরও বডিগার্ড ছিল, তারা ভেতরে ঢুকে পড়েছে!'

উত্তর এল, সংখ্যায় আমরা বেশি···মেয়েটাকে পেলে বেরিয়ে যাওয়া কোন সমস্যা নয়। তবে তাড়াতাড়ি! সানডে খবর পেলে দশ মিনিটের মধ্যে তার গোটা বাহিনী নিয়ে পৌছে যাবে।'

কি ঘটছে এতক্ষণে আন্দাজ করতে পারল মামুন। সানডে হারারে আন্ডারগ্রাউন্ডের একজন সম্রাট। বাচ্চা মেয়েটা সম্ভবত তারই কন্যা। প্রতিদ্বন্দ্বী কোন সম্রাটের লোকজন মেয়েটিকে কিডন্যাপ করতে এসেছে। যেভাবেই হোক আগেভাগে খবর পায় তারা, বডিগার্ডদের সঙ্গে নিয়ে মেয়েটি সিংহানিতে কিছু কিনতে আসবে। ভেতরে ঢুকে এদিক সেদিক পজিশন নিচ্ছিল, ক্রেতারা বিপদ

টের পেয়ে নিঃশব্দে কেটে পড়েছে। খবর পেলেও, সম্রাটদের প্রতিশোধ পাল্টা-প্রতিশোধ গ্রহণের এই যুদ্ধে পুলিস ভুলেও নাক গলাতে আসবে না।

ছুটে বুক সেকশনে চলে এল মামুন। ইতিমধ্যে তার হাতেও একটা পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। কুখ্যাত একজন ক্রিমিন্যাল-এর মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নেয়াটা উচিত হচ্ছে কিনা, এই চিন্তাটা মাথায় এলেও সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দিল। বুট পরা পায়ের শব্দ ছুটে আসছে দু'দিক থেকে। পালাবার পথ খুঁজছে মামুন। মেয়েটা ওর গলা আর ঘাড় দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। পালাবার কোন পথ নেই, বুঝতে পেরে বুক শেলফে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। ঠিক তখনই চোখে পড়ল মইটা। প্যাসেজে একটাই মই, উঠে গেছে শেলফগুলোর মাথা ছাড়িয়ে চওড়া একটা কংক্রিটের কার্নিসে, সেখানে সারি সারি সাজানো রয়েছে কাঠের বাক্স।

তর তর করে বাক্সগুলোর মাথায় উঠে এল মামুন, মইটাও টেনে তুলে নিল। বাক্সগুলোর পিছনে সরু খানিকটা জায়গা দেখা গেল, মেয়েটিকে নিয়ে সেখানে লুকিয়ে থাকল। নিচের প্যাসেজ হয়ে ছুটে গেল কয়েক জোড়া বুট। তারপর আবার গোলাগুলি শুরু হলো।

দশ মিনিট পর থামল বন্দুকযুদ্ধ। কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ভেতর। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে অভয় দিল মামুন, জিজ্ঞেস করল, 'কি নাম তোমার?'

'টুইংকল।'

'টুইংকল, মা-মণি, বিপদ কেটে গেছে, আর কোন ভয় নেই...'

'আঙ্কেল, আমি বাড়ি যাব,' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল মেয়েটা।

'আমি তোমাকে থানায় পৌঁছে দিলে, পুলিস তোমাকে বাড়িতে দিয়ে আসবে—ঠিক আছে?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মেয়েটা মাথা ঝাঁকাল, 'ঠিক আছে।'

মইটা নিচে নামাল মামুন, টুংইকলকে বুকে নিয়ে নেমে এল নিচে। পরমুহূর্তে ভোজবাজির মত চারদিক থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে এল কালো সুট পরা পাঁচ-সাতজন দৈত্য—কারও হাতে মেশিন পিস্তল, কারও হাতে অটোমেটিক রাইফেল। 'হল্ট!' তাদের একজন নির্দেশ দিল। 'হাতের পিস্তল ফেলে মেয়েটাকে মেঝেতে নামাও!'

মামুন ইতস্তত করছে দেখে টুইংকল ওর কানে ফিসফিস করল, 'ওরা ড্যাডির লোক, আংকেল।'

হাতের পিস্তল ফেলে ধীরে ধীরে মেয়েটিকে মেঝেতে নামিয়ে দিল মামুন। তারপর পিছিয়ে এল এক পা। এগিয়ে এসে এক লোক টুইংকলকে কোলে তুলে নিল, বলল, 'তোমার ড্যাডি গাড়িতে অপেক্ষা করছেন।'

একলোক মামুনের দিকে মেশিন পিস্তল তাক করে আছে, আরেক লোক তাকে বলল, 'দেরি করছ কেন, ব্যাটাকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দাও...'

তার কথা শেষ হলো না, তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল টুইংকলের গলা চিরে, 'না! না! উনি আমাকে বাঁচিয়েছেন!'

সুট পরা লোকগুলোর পেশীতে ঢিল পড়ল। টুইংকলকে নিয়ে চলে গেল তারা, তবে যাবার আগে মেঝে থেকে মামুনের পিস্তলটা তুলে নিল।

পুলিস এল আরও পনেরো মিনিট পর। মামুন তাদেরকে জানাল, ঘটনা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তার, প্রাণভয়ে শেলফের ওপর একা লুকিয়ে ছিল।

পরদিন কুরিয়ার সার্ভিস রানা এজেন্সির অফিসে ফুলের একটা স্তবক আর একটা বড় খাম দিয়ে গেল। ফুলের সঙ্গে ছোট্ট একটা চিরকুট ছিল, এলোমেলো কচি হাতে লেখা–'ফুলগুলো আমার তরফ থেকে, আর এনভেলাপটা ড্যাডির তরফ থেকে–আমার শ্রদ্ধা আর ড্যাডির কৃতজ্ঞতা জানবেন, টুইংকল।'

এনভেলাপের ভেতর থেকে মামুনের পিস্তলটা বেরুল, আর বেরুল এক হাজার ডলারের পঞ্চাশটা নোট। পিস্তলটা রেখে নোটগুলো কুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে ফেরত পাঠাল মামুন, প্রেরকের ঠিকানায় ফেরত দেয়ার অনুরোধ সহ।

আজকের চিরকুটটা হাতে লেখা নয়, টাইপ করা। মেয়ের নাম করে সানডে নিজেই পাঠিয়েছে এটা। তবে তার উদ্দেশ্য যে অসৎ কিছু, তা বোধহয় নয়। মামুন সিদ্ধান্ত নিল কাল সকালে সিটি টাওয়ারে যাবে সে।

'আমার নাম কুনকুনো লাবু...তবে আপনি আমাকে সানডে বলতে পারেন।' পক্বকেশ প্রৌঢ় সম্রাট হেসে উঠে ব্যাখ্যা করল, 'শ্বেতাঙ্গদের আমলে নিয়ম করে দেয়া হয়, আদিবাসী নামের সঙ্গে উচ্চারণ যোগ্য ইংলিশ ক্রিশ্চিয়ান নামও থাকতে হবে, তা না হলে বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে না। ষাট বছর আগে বিঙ্গা প্রদেশে জন্ম আমার। যে কেরানী আমার জন্ম তারিখ রেজিস্টার খাতায় তোলে তার কল্পনাশক্তি তেমন উর্বর ছিল না। রবিবারে জন্ম বলে আমার নামের সঙ্গে সানডে জুড়ে দেয় সে।'

'সানডে নামটা মনে রাখা সহজ, মন্তব্য করল মামুন। 'ছড়িয়েছেও আপনার এই নামটাই।'

সানডের সশস্ত্র লোকজন সিটি টাওয়ারের ছয়তলায় মামুনকে অভ্যর্থনা জানালেও, খানিক পরই তাকে নিয়ে উঠে আসে পনেরো তলায়। সিটি টাওয়ার রাজধানীর মাঝখানে অত্যাধুনিক একটা অফিস বিল্ডিং। সুট পরে থাকা সত্ত্বেও সেন্ট্রাল এয়ারকন্ডিশনিং-এর কারণে শীত শীত করছে ওর। তার মেজবান বিশাল এক মেহগনি ডেস্কের পিছনে বসে আছে, পরনে ডোরা কাটা কাপড়ের সুট, নীল শার্ট, ক্রীম কালারের টাই।

রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা জানালা দিয়ে হারারের স্কাইলাইন দেখছে সানডে। এক সময় ধীরে ধীরে চোখ ফিরিয়ে এনে মামুনের দিকে তাকাল। 'কোন কোন ঋণ কখনোই পরিশোধ করা যায় না,' বলল সে। 'শুধু দরজা খুলে অপেক্ষায় থাকতে হয়, যদি সে কোন সাহায্য চাইতে আসে। অনেক সময় সারাটা জীবন পার হয়ে যায়, সে আসে না। আপনি সেই প্রকৃতির মানুষ, মি. মামুন। তাই বাধ্য হয়ে ডেকেছি।'

'আপনার পরিচয় বা পেশা যা-ই হোক, প্রয়োজনের সময় সাহায্য চাইব না, এমন ভাবার কোন কারণ নেই,' বলল মামুন। 'আর সাহায্য যদি চাই, আপনার

সমস্ত কর্মকাণ্ডে আমার সায় বা সমর্থন আছে, তা ধরে নেয়াও ঠিক হবে না।'

'নিজের সম্পর্কে কিছু না বললেও চলবে, মি. মামুন, কারণ আপনাকে আমি চিনেছি,' বলল সানডে। 'কাজের কথায় আসি। একটা মাত্র কথা বলার জন্যে এখানে আপনাকে ডেকেছি আমি। সেটা হলো, আপনি বজ্রপাতে মারা যেতে পারেন।'

'কি? বজ্রপাতে মারা যাব!'

'হ্যাঁ। কেন, আপনি জানেন না?'

'কি জানি না?'

'গিনেস বুক অভ রেকর্ডস-এ লেখা আছে–সারা দুনিয়ায় জিম্বাবুইয়েতেই মাথা পিছু সবচেয়ে বেশি লোক বজ্রপাতে মারা যায়। গত বছর সম্ভবত পাঁচশোরও বেশি লোক মারা পড়েছে।'

'আপনি সিরিয়াস?'

'অবশ্যই সিরিয়াস, মি. মামুন। তবে ঘটনাগুলো বেশিরভাগই গ্রাম্য এলাকায় ঘটে, আদিবাসীরা যেখানে মাটি আর কাঠের ঘরে বসবাস করে। আসলে, ওরা তো আর লাইটনিং কনডাক্টর সম্পর্কে জানে না।'

মামুন মৃদু হেসে বলল, 'আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, লাইটনিং কনডাক্টর সম্পর্কে সবই আমার জানা আছে।'

'তাহলে পরিষ্কার করেই বলি–ওরা আপনাকে মেরে ফেলার প্ল্যান করছে, মি. মামুন।'

'ওরা কারা?'

'একটু ভূমিকা করতে হয়, মি. মামুন,' জানালা দিয়ে আরেকবার হারারের স্কাইলাইনের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল সানডে। 'আপনি তো জানেনই, আইন ভেঙে পয়সা রোজগার করা আমার পেশা। আমার ব্যবসাও অনেক, প্রতিটির জন্যে আলাদা বৈধ ফ্রন্ট আছে। তো এই রকম একটা ফ্রন্ট থেকে এক লোক আমার ছয়জন মার্সেনারি ভাড়া করেছিল হপ্তা কয়েক আগে।'

'ও, আচ্ছা।' চেয়ারে নড়েচড়ে বসল মামুন। 'শহরে ওদের লাশ পাওয়া যায়।'

'হ্যাঁ। সন্দেহ করা হচ্ছে, লোকটা ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছিল, সেজন্যেই আমার ম্যানেজাররা তাকে চিনতে পারেনি। ক'দিন আগে হঠাৎ খবর পেলাম আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কয়েকটা সিন্ডিকেটের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বিঙ্গার একজন ব্যবসায়ী, তারও একদল মার্সেনারি দরকার। লোকটা ব্যবসায়ী হলেও, সে আর তার ছেলে কসাইদের মত অবলীলায় মানুষ মারে। আমি লোক লাগালাম, জানতে চেষ্টা করলাম কেন তার মার্সেনারি দরকার। গেলাম কেঁচো খুঁড়তে, বেরিয়ে পড়ল সাপ।'

'কি রকম?'

'আমার লোকজন খবর নিয়ে এল, মার্সেনারি ভাড়া করা হয়েছে রানা এজেন্সির ওপর হামলা করার জন্যে। ওদের হিট লিস্টে আছেন মিসেস ফেয়ারলি ভ্যান্স, আপনি, লোটন নড়বেল নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা আর আপনার বস্ মি.

মাসুদ রানা।' মামুন কিছু বলতে যাবে, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল সানডে। 'আমি জানি আপনার বস্ আর নড়বেল জঙ্গলে ঢুকেছেন, কাজেই ওদের নাগাল পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু শেরাটন হোটেলে মিসেস ভ্যান্স মার্সেনারিদের জন্যে একেবারেই সহজ টার্গেট।'

'আপনার তথ্য...'

'একশো ভাগ নির্ভুল,' বলল সানডে। 'দু'জন মার্সেনারি আজ দুপুরের ফ্লাইটে বুলাওয়েওতে যাচ্ছে, মি. মামুন। ওখান থেকে ভিক্টোরিয়া ফলসে যেতে একটা গাড়ির মাত্র চার ঘণ্টা লাগে। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, মিসেস ভ্যান্সের ওপর আজ রাতেই কোন এক সময় হামলা হবে।'

'হামলা যদি হয়ও...'

এবারও মামুনকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সানডে বলল, 'আমি এ-ও জানি যে পুলিস আর রানা এজেন্সির লোকজন মিসেস ভ্যান্সের নিরাপত্তার দিকটা দেখছে। তবু, আপনি যদি ওদেরকে ফোন করে জানান যে হামলা হবেই, ওরা আরেকটু বেশি সাবধান হবার সুযোগ পায় না?'

মামুনকে চিন্তিত দেখাল। 'ধন্যবাদ, মি. সানডে। কিন্তু আপনি আমাকে আংশিক তথ্য দিচ্ছেন। বিঙ্গার এই ব্যবসায়ীর পেশা আর পরিচয় দিন।'

'তার নাম ড্যান ক্লিফোর্ড হেগেল। সে-ও আমার মত বিঙ্গার লোক, তবে শ্বেতাঙ্গ। কয়েক পুরুষ আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসে জ্যাম্বেজি উপত্যকায় ভূ-সম্পত্তি দখল করে ওরা, এলাকার কালোদের ক্রীতদাস বানায়, যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে বিশেষ বাহিনী গঠন করে, যুদ্ধের পর মন্ত্রী-পুলিস-বিচারককে লাখ লাখ ডলার ঘুষ দিয়ে যুদ্ধাপরাধীর তালিকা থেকে নিজেদের নাম বাতিল করায়, পেশা হিসেবে গ্রহণ করে হাতি [illegible] গণ্ডার শিকার...'

'ওরাই আপনার ফ্রন্ট থেকে মার্সেনারি ভাড়া করেছিল, মি. সানডে?'

'আমার তাই সন্দেহ,' বলল সানডে। 'ক্লিফোর্ডের ছেলে বিলফোর্ডই সম্ভবত ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছিল, চীনাদের প্রাইভেট জেটটা অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বিঙ্গায় ফিরে গেছে, তার আগে খুন করেছে আমার ছ'জন লোককে। বিলফোর্ড নিজেকে জঙ্গলের রাজা বলে মনে করে–বর্তমান যুগের টারজান। আমি খবর পেয়েছি, গতকাল সকালে বিঙ্গার বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকেছে সে।'

মামুন চিন্তা করছে। নিজেকে প্রশ্ন করল, এ পরিস্থিতিতে পড়লে মাসুদ ভাই কি করতেন। মাথায় কয়েকটা আইডিয়া এল, প্রতিটি বিবেচনা করে দেখছে। জন বুকানির কাছে যেতে পারে সে, সূত্র গোপন রেখে তথ্যগুলো তাঁকে জানাতে পারে। জন বুকানির সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, অনুরোধ ফেলতে পারবেন না–জেরা করার জন্যে হেগেলদের থানায় ধরে আনার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু জেরা করে লাভ কি, অভিযোগ প্রমাণ করার জন্যে মামুনের হাতে কোন প্রমাণ নেই। এ-সব না করে সে নিজেই সরাসরি ভিক্টোরিয়া ফলসে চলে যেতে পারে, তারপর মাসুদ ভাই আর লোটন নড়বেল জঙ্গল থেকে না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

মিসেস ভ্যান্স এই মুহূর্তেও যথেষ্ট নিরাপদে আছেন, হামলা হলে রানা

এজেন্সির এজেন্টরা প্রাণ দিয়ে হলেও রক্ষা করবে তাঁকে। হারারে থেকে ফোনে ওদেরকে আরও সতর্ক থাকতে বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এদিকটা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করলেও চলে। দুঃসংবাদ হলো গতকাল জঙ্গলে ঢুকেছে বিলফোর্ড হেগেল–ধরে নিতে হয় মাসুদ ভাই আর লোটন নড়বেলের খোঁজেই। চেয়ার ছাড়ল মামুন। জিজ্ঞেস করল, 'বিলফোর্ড হেগেল সম্পর্কে আর কি জানেন আপনি, মি. সানডে?'

'সংক্ষেপে, এত বড় পাপী দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি জন্মেছে কিনা সন্দেহ,' জবাব দিল সানডে। 'আমরাও রক্তপাত ঘটাই, প্রতিশোধ নিই, জোর-জুলুম করি–তবে একটা নীতি মেনে চলার চেষ্টা করি, সেই নীতিতে সামান্য হলেও বিবেক-বিবেচনা, দয়ামায়ার স্থান থাকে। কিন্তু এই বিলফোর্ড হেগেলের কোন নীতি নেই। তাকে আপনি একটা যান্ত্রিক কিলিং মেশিন বলতে পারেন।'

'একথা কেন বলছেন?'

একটু দম নিয়ে শুরু করল সানডে। 'যখন যাকে ধরে তার বংশ ধ্বংস করে ছাড়ে বিলফোর্ড। প্রথমে ধরেছিল হাতি, দু'বছরের মধ্যে তার এলাকায় একটা হাতিও বাঁচার সুযোগ পেল না। তার হাতি মারার কৌশল কি ছিল জানেন? হাতিরা পানি খেতে আসত, সেই পানিতে বিষ মিশিয়ে রাখত সে। কোন বুলেট খরচ না করে পালকে পাল মেরে ফেলত। তাতে শুধু যে দাঁতঅলা হাতি মারা গেছে তা নয়, বাচ্চা হাতিগুলোও বাঁচেনি। তারপর ধরল গণ্ডার। গণ্ডারও সব শেষ। চিতা আর লেপার্ডগুলোও তার ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। তারপর, গত কয়েক বছর ধরে, শুনছি সে নাকি মানুষ শিকারে মেতেছে। বিশেষ করে কালো মানুষ শিকার করার ছুতো খুঁজে বেড়ায়...'

'জঙ্গলে সে কি রকম?'

'শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সেরা, কালোদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।'

'লোটন নড়বেল বা মাসুদ ভাইয়ের চেয়েও ভাল?' মামুনের চোখে সন্দেহ।

'বিলফোর্ড দক্ষ একজন অ্যামেচার, কিন্তু লোটন নড়বেল পুরোপুরি প্রফেশনাল। আর আপনার বস্ মাসুদ রানা সম্পর্কে আমি কোন সার্টিফিকেট দেব না, কারণ সে যোগ্যতা আমার নেই। আপনি ফুটবল খেলেন, মি. মামুন?'

'সময় পেলে, মাঝে মধ্যে।'

'আমিও তাই,' হেসে উঠে বলল সানডে। 'বিলফোর্ড আর নড়বেলের তুলনাটা এভাবে দিতে পারি–ধরুন, ভাল একজন ক্লাব প্লেয়ার আর পেলে।'

মামুন আবার চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল। আন্ডারওয়ার্ল্ডের সম্রাট কুনকুনো লার ওরফে সানডে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে।

মামুন ধরে নিল, বিলফোর্ড জঙ্গলে ঢুকে থাকলে মাসুদ ভাই আর লোটন নড়বেলের চোখে ধরা পড়তে বাধ্য সে; তাকে ওঁরা আটকও করবেন। আটক করার পর জেরা করা হবে, তারপর পুলিসের হাতে তুলে না দিয়ে নিয়ে যাবেন তার বাপের কাছে। বাপকেও জেরা করবেন মাসুদ ভাই। একের পর এক অনেকগুলো নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, পুলিস কোন কিনারাই করতে পারেনি, কাজেই বাপ বা ব্যাটাকে পুলিসের হাতে তুলে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার জন্যেই তো জঙ্গলে ঢুকেছেন মাসুদ ভাই।

আরও আধ মিনিট পেরিয়ে গেল। এতক্ষণে সিদ্ধান্তে পৌঁছুল মামুন। বিঙ্গায় যাবে সে, হেগেলদের বাড়ির কাছাকাছি প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করবে–প্রয়োজন হলে মাসুদ ভাই আর লোটন নড়বেল তাকে যাতে ব্যাক-আপ হিসেবে পান।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে মামুন বলল, 'মি. সানডে, আপনি আমার এই উপকারটা করতে পারেন কিনা ভেবে দেখুন। কাল সকালের মধ্যে কারও চোখে ধরা না পড়ে বিঙ্গায় পৌঁছুতে চাই আমি, আপনি তার ব্যবস্থা করতে পারবেন? আমি নিজের যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করতে চাইছি না।'

'আমার জন্যে এটা কোন সমস্যাই নয়,' খুশি মনে বলল সানডে। 'ওখানে আমার ব্যবসা আছে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমার একটা ট্রাক হারারে থেকে রওনা হবে, চালাবে বিশ্বস্ত একজন ড্রাইভার–ওটার পিছনে লুকিয়ে থাকবেন আপনি।'

'পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

'বারো ঘণ্টা। ভোরের আগেই বিঙ্গায়, হেগেলদের বাড়ির কাছাকাছি ড্রাইভার আপনাকে নামিয়ে দেবে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. সানডে। বৈধ কোন কাজে সাহায্য দরকার হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে ভুলবেন না। আর টুইংকেলকে এটা দেবেন।' পকেট থেকে মখমল দিয়ে মোড়া ছোট্ট একটা বাক্স বের করল মামুন, ভেতরে সোনার চেইন আছে, লকেটে রয়েল বেঙ্গল টাইগার খোদাই করা।

'টুইংকল আপনাকে একবার দেখার জন্যে মাঝে মধ্যে খুব জেদ ধরে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে আড়ষ্ট একটু হাসল সানডে। 'আমার যে পেশা, তাতে বোধহয় মেয়ের আবদার কোনদিনই পূরণ করতে পারব না, কি বলেন?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে মামুন জবাব দিল, 'নিষ্পাপ একটা শিশুর সঙ্গে আপনার পেশার সম্পর্ক খুঁজতে রাজি নই আমি। কাজ সেরে হারারেতে ফিরে আসি, সময় করে একদিন দেখে আসব ওকে।'

কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ল সানডে, মামুনের হাতটা বারবার ঝাঁকিয়ে বলল, 'মেয়ের কাছে আমি ছোট হয়ে আছি। সেদিনের অপেক্ষায় থাকলাম, বুক ফুলিয়ে টুইংকেলের সামনে দাঁড়াতে পারব! ধন্যবাদ মি. মামুন, অশেষ ধন্যবাদ।'

পাঁচ

অনুভূতিটা ফাঁদে পড়ার, মেজাজ তাই তিরিক্ষি হয়ে আছে। নাগালের মধ্যে যাদেরকে পাচ্ছেন তারা যথেষ্ট প্রভাবশালী নয় বলে কারও ওপর ঝালও ঝাড়তে পারছেন না মিসেস ফেয়ারলি ভ্যান্স, তাই রাগে শুধু ফুলছেন। পুলিস ইন্সপেক্টর জন টিকোলো বা রানা এজেন্সির এজেন্ট নাজমুল ও শাহেদ, এরা তো নেহাতই অধম, এদেরকে বকাঝকা করা মানে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা, নিজেরই সম্মান খোয়ানো। নার্স সিলভিয়াকেও তিনি অবোধ প্রাণীর ওপরে স্থান দিতে পারেন না। ছোটখাট ব্যাপার হলে এদের জীবন বিষিয়ে তুলতে ইতস্তত করতেন না, সবাইকে

রীতিমত কাঁদিয়ে ছাড়তেন। কিন্তু ব্যাপারটা ছোটখাট নয়। কোন কারণ না জানিয়ে তাঁর স্বাধীন চলাফেরায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, নির্দেশটা এসেছে রানা এজেন্সির হারারে চীফ মামুন কিংবা তার বস্ মাসুদ রানার তরফ থেকে, কাজেই গরল উদ্গিরণের জন্যে ওদের একজনকে তাঁর দরকার। কিন্তু কেউই তাঁর সামনে আসছে না। নিশ্চয়ই ভয়ে!

সন্ধ্যা হতে আর বেশি দেরি নেই, সিলভিয়ার সাহায্যে বাইরে বেরোনোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি—জাম্বেজি নদীর পাশে সুন্দর একটা বাগান আছে, সেখান থেকে সূর্যাস্ত দেখবেন। তারপর ডিনার সারার জন্যে যাবেন নামকরা রেস্তোরাঁ ড্যাফোডিল-এ। কিন্তু রওনা হবার মিনিট পাঁচেক আগে নক হলো দরজায়, ইন্সপেক্টর টিকোলোকে নিয়ে হোটেলের স্যুইটে ঢুকল রানা এজেন্সির দু'জন এজেন্ট। নাজমুলই মুখ খুলল, বলল, হারারে থেকে মামুন ফোন করে জানিয়েছে, তাঁর ওপর নাকি হামলা হবে। কাজেই সম্ভাব্য হামলা প্রতিহত না করা পর্যন্ত সিলভিয়ার সঙ্গে স্যুইটেই থাকতে হবে তাঁকে, এমনকি এখানে বসেই ডিনার খেতে হবে। নাজমুল আরও জানাল, রি-ইনফোর্সমেন্ট হিসেবে রানা এজেন্সির আরও লোকজন পৌঁছে গেছে, পুলিসেরও শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে, সবাই তারা হোটেলের ভেতরে ও বাইরে টহল দিচ্ছে। ভেতরে যারা আছে তারা পোর্টার আর ওয়েটারের ছদ্মবেশ নিয়ে আছে। যে দু'জন লোক ডিনার নিয়ে আসবে তারা রানা এজেন্সির লোক।

বিস্ময় আর বিরক্তি প্রকাশ করার সময় দেয়া হলো না তাঁকে, তিনজনই তারা স্যুইট থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

রাগ চড়ে গেল, পরিবেশিত ডিনার স্পর্শ করলেন না মিসেস ভ্যান্স, খানিকটা স্কচ খেয়ে শুয়ে পড়লেন।

হঠাৎ তাঁর ঘুম ভাঙল মাঝরাতের খানিক পর।

ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেলেন পাশের বিছানায় বসে রয়েছে সিলভিয়া, আতঙ্কে জড়োসড়ো অবস্থা। হোটেলের বাইরে থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে, ভেতরে লোকজনের চিৎকার আর ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। অকস্মাৎ কামরার একটা জানালা বিস্ফোরিত হলো। ঝট করে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন মিসেস ভ্যান্স, চিৎকার করে সিলভিয়াকেও তাই করতে বললেন। বিছানার ওপর আর মেঝেতে ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে পড়ল।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎই থেমে গেল গোলাগুলি। তারপর বাইরের করিডরে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। ভয়ে নীল হয়ে গেছে মিসেস ভ্যান্সের চেহারা। দরজার বাইরে থেকে নাজমুলের গলা ভেসে আসতে খানিকটা স্বস্তিবোধ করলেন। নাজমুল গলা চড়িয়ে ঘর থেকে বেরুতে নিষেধ করছে তাঁকে আর সিলভিয়াকে। বলল, 'আতঙ্কিত হবেন না, মিসেস ভ্যান্স। পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণেই আছে।'

দুই মিনিট পর বাইরে থেকে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল নাজমুল, সঙ্গে ইন্সপেক্টর টিকোলো।

নাজমুল বলল, 'আপনার জানালা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয়েছি আমি,

মিসেস ভ্যান্স। কারণ ওদের এক লোক জানালার নিচের কার্নিসে পৌঁছে গিয়েছিল। আমার ছোঁড়া একটা বুলেট ঘরের ভেতর ঢোকে, সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। আপনারা কেউ আহত হননি তো?'

'আততায়ীরা কি সত্যি আমাকে খুন করার জন্যে এসেছিল?' মিসেস ভ্যান্সের গলায় অবিশ্বাস, নাকি উত্তেজনা, বোঝা গেল না। তবে এই মুহূর্তে তাঁর চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র নেই। তাঁকে নিয়ে এত হৈ-চৈ হচ্ছে, এ যেন তিনি বেশ উপভোগ করছেন। 'কারা তারা? তাদের পরিচয় কি?'

'জ্বী, ওরা আপনাকে খুন করার জন্যেই এসেছিল। পরিচয়...ভাড়াটে খুনী, মিসেস ভ্যান্স।'

'কেন,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন মিসেস ভ্যান্স, 'আমাকে খুন করার জন্যে ভাড়াটে লোক পাঠানো হবে?'

'কন্যা হত্যার প্রতিশোধ নিতে চান আপনি, সেটাই আপনার অপরাধ,' জবাব দিল নাজমুল।

'তারা কি পালিয়েছে?'

'না,' কঠিন, প্রায় নির্মম হাসি দেখা গেল নাজমুলের ঠোঁটে। 'তিনজন এসেছিল। বাইরে তাদের লাশ পড়ে আছে। প্লীজ, মিসেস ভ্যান্স, বিছানা থেকে নামবেন না। চারদিকে কাঁচের টুকরো, পা ফেললেই কেটে যাবে। দু'মিনিট সময় দিন, দু'জন মেইডকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারা সব কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। আপনাদের জন্যে অন্য একটা স্যুইটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাকি রাতটুকু আর কোন ঝামেলা হবে না।'

'কিন্তু এর কি ব্যাখ্যা–এলাম খুনীদের ধরে শাস্তি দেয়ার জন্যে, অথচ তারাই লোক পাঠিয়ে পাল্টা হামলা চালাচ্ছে, আর সেটা সামলাতে গলদঘর্ম হচ্ছেন আপনারা! তাহলে আমার প্রতিশোধ নেয়ার কি হবে?'

হেসে উঠে নাজমুল বলল, 'এ নিয়ে চিন্তা করবেন না, মিসেস ভ্যান্স। রানা এজেন্সি প্রস্তুত হয়েই কাজে হাত দিয়েছে। খুনীরা কেউ রেহাই পাবে না।'

'কাজ কতটুকু এগোল, আপনারা আমাকে রিপোর্ট করছেন না কেন?'

এবার নিঃশব্দে হাসল নাজমুল। 'একেবারে ফাইন্যাল রিপোর্ট দেয়া হবে আপনাকে, মিসেস ভ্যান্স। সেটা পাবার পর আপনার আর কোন আক্ষেপ থাকবে না–আমি কথা দিচ্ছি।'

লেকের কাছ থেকে জঙ্গলের ভেতর দিকে খুব দ্রুত এক কিলোমিটার এগোল ওরা। গত রাতে ওরা ফাঁদ পাতার জন্যে কোথাও থামেনি। সঙ্গে লবণ মাখানো শুকনো মাংসের ফালি আছে, তাই চিবিয়েছে। রানার পরামর্শ মেনে নিয়েছে নড়বেল–ঘুরপথে বিঙ্গা গ্রামের পিছন দিকে পৌঁছুবে ওরা, ডান দিকে ঘুরে গিয়ে রিজ-এর সামনে পড়বে। ওই রিজ-এর চারপাশেই প্রাসাদতুল্য দালান-কোঠা তৈরি করে শ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলো বসবাস করে।

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা, তবে কেউই তেমন কথা বলছে না। দু'জনের আচরণেই অধৈর্য একটা ভাব। উঠতি সূর্য আগুনের হলকা ছড়াচ্ছে, বনভূমি

এদিকটায় তেমন ঘন না হওয়ায় রোদে পুড়ছে ওরা।

শেষ বিকেলের দিকে রানার হাত ধরে টান দিল নড়বেল।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'কি?' ফিসফিস করল।

নড়বেল বলল, 'কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে।'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ঠোঁট টিপে একটু হাসল রানা, তারপর বলল, 'কখন বলবে তার অপেক্ষায় ছিলাম। দশ মিনিট আগেই টের পেয়েছি আমি।'

মুচকি হাসল নড়বেলও। 'তোমার অবজারভেশন বা অনুভূতির তারিফ করতে হয়। তবে আমি টের পেয়েছি এক ঘণ্টা আগে, আর সেজন্যেই ইচ্ছে করে খানিকটা ঘুরপথ ধরে একদল বেবুনকে বিরক্ত করি, ওরা যাতে ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে। আরেকবার ভয় পায় ওগুলো, মিনিট পনেরো পর-চেঁচামেচির আওয়াজও শুনতে পাই।'

'হুম। তারপর?'

'তারপর, যে বা যারাই পিছু নিয়ে থাকুক, মুকুট পরা একঝাঁক তিতির পাখিকে বিরক্ত করে। এখন থেকে দশ মিনিট আগে বিরক্ত করে মুখরা এক হানি-গাইডকে-ওটার চিৎকারই শুনেছ তুমি।'

'আমাকে তুমি বলনি কেন?'

'প্রথমে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম। পিছনে যে শব্দ আর গোলযোগ হচ্ছে, তার একটা প্যাটার্ন ধরতে পারলে অনেক সুবিধে। গোলযোগের ব্যবধানও, অর্থাৎ টাইমিংও খুব গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। এখন একটা ব্যাপার পরিষ্কার, যে-ই পিছু নিয়ে থাকুক, আমাদের কাছ থেকে এক কিলোমিটার পিছনে থাকছে।'

'উদ্দেশ্য?'

'আমরা ক্যাম্প ফেলার অপেক্ষায় আছি। যখন বুঝবে ক্যাম্প ফেলেছি, কাছে আসার চেষ্টা করবে।'

'ওরা নয়তো? বাটোংকা ভাইরা? হয়তো আরও সোনা পেতে চায়।'

'মনে হয় না। ওরা জানে এই এলাকা আমার অত্যন্ত পরিচিত। সাবধানে ছিল, তারপরও আমি ওদেরকে ধরে ফেলি। আমরা কোন দিকে যাচ্ছি, তা-ও তারা জানে। তুমি হয়তো লক্ষ করেছ, সারাক্ষণ উঁচু জমিনে থাকছি আমরা, সামনে কোন অ্যামবুশ থাকলে সেটাকে এড়াবার জন্যে। বাটোংকারা পিছু নিলে এতটা অসাবধান হত না। আমার ধারণা, ইতিমধ্যে নিজেদের গ্রামে ফিরে গেছে তারা, মদ খেয়ে আমাদের অস্তিত্ব ভুলে যাবার চেষ্টা করছে।'

আবার হাঁটছে ওরা।

কিছুক্ষণ পর নড়বেল বলল, 'পিছন দিকে তাকিয়ো না। ওভার-কনফিডেন্ট প্রতিপক্ষ অকস্মাৎ কিছু করে বসতে পারে।'

'নির্বিঘ্নে আসতে না দিয়ে,' বলল রানা, 'একটু বিপদে ফেলার চেষ্টা করলে কেমন হয়?'

'কি করতে চাও তুমি?'

ছোট্ট করে বলল রানা, 'বাফেলো সার্কেল?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে মাথা নাড়ল নড়বেল। 'এদিকে বাফেলো সার্কেল কাজে আসবে না। বাফেলো সার্কেল সম্পর্কে শুনেছ তুমি, তবে কৌশলটা ব্যবহার করেছ বলে মনে হয় না।' রানা যাতে কিছু মনে না করে, মুখটা হাসি হাসি করে রাখল। 'তুমি আসলে মরু এলাকায় ওস্তাদ, কিন্তু এটা আমার নিজের এলাকা, এখানে আমি ওস্তাদ।'

নড়বেলকে আংশিক সমর্থন করল রানা। 'হয়তো,' বলল ও। 'ব্যাপারটা তুমি উপভোগও করছ। কিন্তু বাফেলো সার্কেল এখানে কাজে আসবে না বলছ কেন? কারণ দেখাও।'

'আহত একটা বাফেলো পথ ছেড়ে প্রথমে সরে যায় একপাশে, তারপর ঘুরে ফিরে আসে ফেলে আসা পিছনের পথে, অপেক্ষায় থাকে পিছু নেয়া ট্র্যাকারকে নাগালের মধ্যে পাবার জন্যে। কোথায় অপেক্ষায় থাকে?'

'পথের ধারে,' বলল রানা।

'শুধু পথের ধারে নয়, দোস্ত,' ভুলটা ধরিয়ে দিল নড়বেল। 'পথের ধারের ঘন ঝোপের ভেতর। ট্র্যাকার নাগালের মধ্যে এলেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে হামলা চালায়। এখানে সমস্যা হলো, আশপাশে কোথাও ঘন ঝোপ-ঝাড় নেই। ঘাস আছে, তা-ও লম্বা নয়; ঝোপ সামান্য, এখানে খানিকটা ওখানে খানিকটা; আর আছে মোপানি গাছ–একটা বাফেলো লুকিয়ে থাকার মত নয়।'

অকাট্য যুক্তি মেনে নিতে হলো রানাকে। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটল ওরা। তারপর রানা বলল, 'আমাদের দুই কিলোমিটার সামনে নিচু একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ভাবছি লোকটার চোখের আড়ালে পৌঁছে...'

'বা লোকগুলোর...'

'হ্যাঁ, লোক বা লোকগুলোর চোখের আড়ালে পৌঁছে বাম দিকে সরে যাব আমি, তার বা তাদের জন্যে অপেক্ষা করব।'

নড়বেল জানতে চাইল, 'ধরো একজনই পিছু নিয়েছে। প্রশ্ন হলো, তাকে তুমি মারতে চাও, নাকি ধরতে?'

'অবশ্যই ধরতে চাই।'

'সেক্ষেত্রে চোখের আড়ালে পৌঁছে স্রেফ বাঁ দিকে সরে গেলে কোন লাভ হবে না। লোকটা গোঁয়ার প্রকৃতির হলেও, ধরে নিতে হবে ট্র্যাকার হিসেবে সে খুব দক্ষ। মাটি এখানে এত আলগা, আমাদের পায়ের ছাপ পঞ্চাশ মিটার পিছন থেকে দেখতে পাবে সে। পায়ের ছাপ দু'দিকে চলে গেছে দেখে দ্রুত পিছিয়ে যাবে, তোমার ফাঁদ কোন কাজে আসবে না।'

'তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিত?'

হঠাৎ চাপাস্বরে হেসে উঠল নড়বেল। 'তুমি শালা আমাকে ব্যঙ্গ করছ। শুধু মরুতে নয়, জঙ্গলেও তুমি ওস্তাদ। এত ছোট করছি, তা-ও গায়ে মাখছ না। বাফেলো সার্কেল যে কাজে লাগবে না এদিকে, তুমিও তা জানো। আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, তাই না? আবার জানতে চাইছে, এখন কি করা উচিত! নিজে যেন জানো না!'

হেসে ফেলে রানা বলল, 'স্টিকস অ্যান্ড বুটস?'

'হ্যাঁ, স্টিকস অ্যান্ড বুটস।'

'এবার ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি–এই কৌশলটা সম্পর্কে আমি শুনেছি, কিন্তু কখনও ব্যবহার করিনি। একটু ব্যাখ্যা করো দেখি।'

'ঠিক আছে। তাকে বিশ্বাস করাতে হবে দু'জনকেই অনুসরণ করছে সে, একজনকে নয়।' হাত তুলে সামনেটা দেখাল নড়বেল।

'আড়ালে পৌঁছানোর পর, ওই নিচু পাহাড়ের পিছনে, থামব আমরা, একটা গাছ থেকে একজোড়া ছোট ডাল কাটব।

'শাখাগুলোর একটা প্রান্ত আমরা বাঁধব তোমার দুই বুটে। তোমার এক পায়ে জড়ানো থাকবে শর্টস, আরেক পায়ে শার্ট, তারপর পা টিপে টিপে বাঁ দিকে সরে যাবে তুমি, অন্তত আধ কিলোমিটার। তারপর ঘুরপথ ধরে আমাদের ট্র্যাক-এর পিছনে চলে যাবে, সেই সঙ্গে পৌঁছুবে তার বা তাদেরও পিছনে।

'নিচু ওই পাহাড়টার সামনে পরপর আরও তিনটে পাহাড় আছে, কাজেই আমিও দৃষ্টি পথের বাইরে থাকব। ক্যাম্প ফেলব তিন নম্বর পাহাড় ছাড়িয়ে। ওখানে যাবার সময়, তোমার বুট বাঁধা ডাল দুটো আমার হাতে থাকবে। আমার নিজের পায়ের ছাপের পাশে তোমার বুটের ছাপও পড়বে।

'তুমি থাকবে তার বা তাদের পিছনে। এক সময় তারা আমার ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে আসবে। ক্যাম্পটা এখান থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে হবে।' চোখ তুলে ডান দিকে তাকিয়ে ডুবন্ত সূর্যটা ঠিক কোথায় দেখে নিল নড়বেল। 'আমি গোধূলির শেষ লগ্নে ক্যাম্প ফেলব, আগুনের পাশে খাড়া করব তোমার একটা ডামি। তারা রাত নামার আগে ক্যাম্পে হানা দেবে না। ইতিমধ্যে তাদের একেবারে পিঠের কাছে পৌঁছে যাবে তুমি। সাধারণত যা করো, মাঝে মধ্যে নিজের পিছন দিকটা দেখে নিয়ো। নিচু পাহাড়টার আড়ালে পৌঁছানোর পর ঠিক আমি যা বলব তাই করবে তুমি, ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা।

বিশ মিনিট পর নড়বেলের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল রানা। পাহাড়টার আড়ালে চলে আসার পর খানিকটা হেঁটে একটা মোপানি গাছের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা।

'দাঁড়িয়ে থাকো, নড়বে না,' বলল নড়বেল। তরতর করে গাছটায় উঠল সে, গাছটার সামনে থেকে পিছন দিকে সরে গেল, প্রায় কোন শব্দ না করে ছুরি দিয়ে একজোড়া ডাল কাটল। নিচে নেমে এসে ডাল দুটো রানার হাতে ধরিয়ে দিল। নামার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকল, ওঠার সময় যেখানে পা রেখেছিল ঠিক সেখানেই নামাল পা দুটো। 'এবার শার্ট আর শর্টস খুলে ফেলো। তবে সাবধান–যখনই একটা পা তুলবে, মনে রাখবে ওই একই জায়গায় নামাতে হবে বুটটা। শর্টস আর শার্ট বাঁ দিকে রাখো, পাশাপাশি, তারপর বুট থেকে পা বের করো–বুট যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, একচুল নড়বে না; তারপর এক পা রাখো শর্টসের ওপর, আরেক পা শার্টের ওপর। রাইফেল যেন মাটির স্পর্শ না পায়।'

ডালদুটো নড়বেলের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। সবুজ সুতি শর্টস্‌টা খুলে বাঁ পাশে রেখে দিল। শার্ট খুলেও তাই করল, রেখে দিল শর্টসের পাশে। আন্ডারঅয়্যার ছাড়া পরনে আর কিছু থাকল না।

রানার প্রতিটি কাজ বা নড়াচড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে নড়বেল।

বুটের ফিতে খুলল রানা। বুট থেকে পা বের করল। রানার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটতে পারে, তাই নড়বেলও কোন শব্দ করছে না। পা বের করার সময় বুট জোড়া এক চুল নড়ল না দেখে মনে মনে ওর প্রশংসা করল সে। পা দুটো এক এক করে শর্টস আর শার্টের ওপর রাখল রানা।

এরপর কাজ শুরু করল নড়বেল।

ডাল দুটোর শেষ প্রান্তে ছোট এক গোছা করে শাখা-প্রশাখা আছে। একটা বুট তুলল সে, বুটের ভেতর শাখাগুলো ঢোকাল মূল ডালের একটা প্রান্ত সহ, তারপর নাইলন রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল, লক্ষ রাখল রশি যাতে বুটের তলায় না থাকে। দ্বিতীয় বুটেও একইভাবে ডাল আর শাখা ঢোকাল, তারপর দুটো বুটই যেখান থেকে তুলেছে ঠিক সেখানে নামিয়ে রাখল।

'কয়েক মিনিট ধরেই তোমার পা ফেলা লক্ষ করছি আমি,' রানাকে বলল সে। 'হাঁটার সময় এক পা থেকে আরেক পায়ের দূরত্ব আমার জানা হয়ে গেছে। তুমি প্রথমে পায়ের কিনারা ফেলো মাটিতে, কাউ বয়দের মত। এই ভঙ্গি বা ধরনটাই অনুকরণ করব আমি। তোমার পদক্ষেপ আর আমার অনুকরণ, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারে এমন লোক মাত্র একজনকেই চিনি আমি।'

'কে জানে,' বলল রানা, 'সে-ই হয়তো আমাদের পিছনে আছে।'

মাথা নাড়ল নড়বেল। 'প্রশ্নই ওঠে না। সে ছিল ফ্রিডম ফাইটারদের একজন ট্র্যাকার। আমি তাকে অনেক বছর আগে খুন করেছি। এখান থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে।' শরীরের বাম পাশে টোকা দিল। 'আমার শরীরে সে তার ট্রেড মার্ক রেখে গেছে। পাঁজরের নিচে একটা ক্ষত।'

'ঠিক আছে। এক ঘণ্টার মধ্যে দেখা হবে। রওনা হয়ে যাও।'

মাটির ওপর দিয়ে সাবধানে হেঁটে যাচ্ছে নড়বেল, মিনিট দুয়েক তাকিয়ে থাকল রানা। শরীর থেকে হাত দুটো যথেষ্ট বাম দিকে লম্বা করে দিয়েছে সে, নির্দিষ্ট মাপা দূরত্বে মাটিতে ফেলছে রানার বুট জোড়া। রানা ঝুঁকল, শর্টস আর শার্ট জড়াল দুই পায়ে, নাইলন কর্ড দিয়ে বেঁধে নিল ভাল করে। তারপর, যেন ভাঙা কাঁচের ওপর দিয়ে হাঁটছে, রওনা হলো বাঁ দিকে।

ছয়

বিলফোর্ড হেগেল অভিজ্ঞ ট্র্যাকার, সমস্ত কৌশল তার জানা আছে। এই অনুসরণ উপভোগ করছে সে। হিংস্র কোন বন্য প্রাণী হলে এতটা মজা লাগত না, মানুষ শিকার করার আনন্দই আলাদা।

এখন পর্যন্ত কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। আজ খুব সকালে ওদের অস্তিত্ব টের পায় সে, দু'জোড়া পায়ের ছাপ বিঙ্গার দিকে যাচ্ছে। জানে ওদের কাছ থেকে কতটা পিছনে রয়েছে সে, কাজেই কাঁধে ঝোলানো এনভয় এনফিল্ড রাইফেলটা হাতে নেয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি। পায়ের ছাপগুলো পিছন থেকে সরাসরি অনুসরণ করছে না, ওগুলোকে টপকে সাপের মত এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে–কখনও ছাপের ডান দিকে চার কি পাঁচশো মিটার দূরে সরে আসছে, কখনও বাম দিকে। পিছু নেয়ার এই পদ্ধতি অত্যন্ত ক্লান্তিকর, তবে অ্যামবুশে পড়ার ঝুঁকি অনেক কমিয়ে আনে। প্রতিপক্ষের যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন সে, আর এই সতর্কতা তার সারা শরীরে রোমাঞ্চকর উত্তেজনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে এই এলাকারই ওস্তাদ এক ট্র্যাকারকে অনুসরণ করছে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ট্র্যাকার হিসেবে যার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিলফোর্ড ভয় কাকে বলে জানে না, তবে প্রতিপক্ষকে ছোট করে দেখতেও অভ্যস্ত নয়। রাইফেলটা কাঁধে থাকলেও, প্রয়োজনে চোখের পলকে হাতে চলে আসবে। প্রতিটি ইন্দ্রিয় ক্ষুরের মত ধারাল হয়ে আছে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত সে, তার অস্তিত্ব ওদের কাছে ধরা পড়েনি। দূরত্ব আরও খানিক কমিয়ে এনে দুটো গুলি করে ওদেরকে ফেলে দেয়া তার জন্যে কোন সমস্যা ছিল না, কিন্তু ঘন জঙ্গল ছেড়ে খোলা ও উঁচু জমিনে সরে গেছে ওরা, এখন দূরত্ব কমিয়ে আনলে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওরা সচেতন হয়ে উঠবে। এ-ধরনের ঝুঁকি এখুনি নেয়ার কোন মানে হয় না। একটু অপেক্ষা করলে সুযোগ নিজেই এসে ধরা দেবে।

সন্ধে হয়ে আসছে, এবার সেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। ঝোপ-ঝাড় একটু বেশি আছে, এমন কোন জায়গায় ক্যাম্প ফেলবে ওরা আড়ালে আড়ালে থেকে এগোবে সে, পৌঁছে যাবে ওদের এক কি দুশো মিটারের মধ্যে।

প্রথমে দেশী ট্র্যাকার নড়বেলকে গুলি করবে বিলফোর্ড। ওস্তাদটাকে। গুলি করবে দু'বার, পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে। তার সঙ্গী দ্বিতীয় লোকটাকেও পালাতে দেয়া যাবে না। এই ব্যাটা বিদেশী নাকি তাকে ধরার জন্যেই এসেছে।

থেমে চারদিকে তাকাল নড়বেল, তারপর ক্যাম্পের জন্যে একটা জায়গা বাছাই করল। প্রায় চার কিলোমিটার পথ হেঁটে এসেছে সে, নিজের পায়ের পাশে রানার বুটের ছাপ ফেলতে হয়েছে, ফলে হাত দুটো টনটন করছে ব্যথায়। ডাল আর বুটগুলো এক পাশে ছুঁড়ে দিল, তারপর কাজ শুরু করল দ্রুত। ঝোপ-ঝাড় কুড়িয়ে এনে নাইলন কর্ড দিয়ে এক করে বাঁধল, একটা মানুষের উর্ধ্বাঙ্গের আকৃতি পেল সেটা, ঘাড়ের ওপর রানার সঙ্গে মেলে এমন একটা মাথাও থাকল। তারপর আগুন জ্বালল, উর্ধ্বাঙ্গটাকে রাখল ওদের ট্র্যাক-এর উল্টোদিকে। দেখতে দেখতে আগুনটা বেশ গনগনে হয়ে উঠল, ডামির পাশে উবু হয়ে বসে থাকল নড়বেল, রাইফেলটা পাশে পড়ে আছে। পাউচ থেকে অলস ভঙ্গিতে এক ফালি শুকনো মাংস বের করে চিবাতে শুরু করল।

বিশ মিনিট পর খুব সাবধানে নিচু পাহাড়টাকে ঘুরে কোণ থেকে উঁকি দিল

বিলফোর্ড। এক কিলোমিটার দূরে আগুনটা। দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে আপনমনে হাসল শিকারী। সন্ধে প্রায় হয়ে গেছে, তবে পাখিদের কলগুঞ্জন এখনও পুরোপুরি থামেনি। আগুন দেখলে হিংস্র পশুরা সাধারণত দূরে সরে যায়, সেদিক থেকে বিবেচনা করলে তার প্রতিপক্ষরা অন্তত একটা সম্ভাব্য বিপদ থেকে নিরাপদ। তবে এই নিরাপত্তা ক্ষণস্থায়ী। কারণ বন্য যে-কোন হিংস্র প্রাণীর চেয়ে ভয়ঙ্কর সে। পিছু নিয়ে যখন এসেছে, তার হাত থেকে ওদের রক্ষা নেই। উত্তেজনায় তার শরীরের রক্ত নাচতে শুরু করেছে।

শিকারী লক্ষ করল, তার আর আগুনের মাঝখানে খানিকটা ঝোপ-ঝাড় চমৎকার একটা আড়াল তৈরি করেছে, প্রায় একশো মিটার দূরে। লুকাবার জন্যে জায়গাটা আদর্শ। ওখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে সে, তারপর অন্ধকার আরও একটু গাঢ় হলে সামনে বাড়বে কাজ সারার জন্যে।

আগুন আর আগুনের পাশে বসে থাকা জোড়া মূর্তি আরেকবার ভাল করে দেখে নিল শিকারী। আগুনটাকে সামনে রেখে বসেছে ওরা। ডালে বসা নির্বোধ পাখির মত সহজ টার্গেট। ধীরে ধীরে, সাবধানে, নিজের ডান দিকে সরে যেতে শুরু করল সে, আগুনটার ঠিক উল্টো দিকে পৌঁছুতে চায়।

বিশ মিনিট পর একটা পাখির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ পেল নড়বেল, তার সামনে ও খানিকটা বাঁ দিকে। বুঝতে অসুবিধে হলো না ওদিকে কেউ হাজির হয়েছে। আজ রাতের মত বিশ্রামের জন্যে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল পাখিটা, কেউ বিরক্ত না করলে অন্ধকারে ডানা মেলত না। হ্যাঁ, কোন হায়েনা বা বন্য কুকুরও বিরক্ত করে থাকতে পারে। তবে তার ইন্সটিঙ্কট বলছে, কোন মানুষের উপস্থিতি ভয় পাইয়ে দিয়েছে পাখিটাকে। নড়বেল এতটুকু উদ্বিগ্ন নয়। রানাকে সে চেনে, তার ওপর শতকরা একশো ভাগ আস্থা রাখা যায়। গত এক ঘণ্টায় রানা যদি কোন কারণে অচল হয়ে পড়ত, তাকে সাবধান করার জন্যে অবশ্যই ফাঁকা একটা গুলি করত।

শিকারী পৌঁছে গেছে, জানে নড়বেল। এ-ও জানে যে শিকারীই এখন শিকারে পরিণত হতে যাচ্ছে।

বিলফোর্ড হেগেল একটা ঝোপের ভেতর ঢুকল। ঢোকার পর নড়ছে না সে, কান পেতে অপেক্ষা করছে। কোথাও কোন আওয়াজ নেই। সাবধানে ঝোপ ফাঁক করে সামনে এগোল সে। খানিক পরই আগুনটা আবার দেখতে পেল, সেটার ওদিকে বসে আছে দুটো ছায়ামূর্তি। সে জানে, আদিবাসী কালো লোকটার তুলনায় বিদেশী প্রতিপক্ষ আকারে বড়। অর্থাৎ বাঁ দিকে বসে থাকা বড় মূর্তিটাই বিদেশী। মাটির ওপর নিতম্ব রেখে বসল সে, কনুই রাখল ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর। এটাই তার প্রিয় পজিশন। ধারণা করল, যতটা শোনা গেছে, আসলে জঙ্গলে ততটা দক্ষ নয় নড়বেল। তার বসা উচিত ছিল আগুনের উল্টোদিকে, তাতে করে পরস্পরের পিছন দিকে নজর রাখা যেত। রাইফেলের স্টকটা গালের পাশে ঠেকাল সে, ধীরে সুস্থে লক্ষ্য স্থির করছে।

শান্ত কিন্তু কঠিন একটা গলা শুনল সে, ভেসে এল পিছন থেকে, 'ট্রিগার

থেকে আঙুল সরাও, বিলফোর্ড। মানে, যদি বাঁচতে চাও আর কি।'

রানা তাকে আগুনে ফেলল। আর্তনাদ করছে বিলফোর্ড, শরীরটা মোচড়াচ্ছে। গড়ান দিয়ে কোন রকমে আগুনটা থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু পোড়া সবুজ শার্টের ভেতর জ্বলন্ত একটা কাঠ ঢুকে গেছে। হাত দিয়ে সে ওটার নাগাল পাবে না, কারণ ওদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। শুধু হাত নয়, পা দুটোও এক করে নাইলন কর্ড দিয়ে বেঁধে দিয়েছে রানা। আবার তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার বেরুল গলা থেকে, গড়াগড়ি খাচ্ছে বিরতিহীন। এক সময় শার্টের ভেতর থেকে জ্বলন্ত কাঠ বেরিয়ে এল। বাতাসে মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধ ছড়াচ্ছে। ফোঁপাচ্ছে সে, যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে শরীর, ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে।

একা বসে রয়েছে রানা, অলস ভঙ্গিতে শুকনো মাংসের ফালি চিবাচ্ছে। মিনিট পাঁচেক আগে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে নড়বেল, নিশ্চিত হয়ে দেখে আসতে গেছে বিলফোর্ডের কোন ব্যাক-আপ আছে কিনা। ফিরতে আরও আধ ঘণ্টার মত লাগবে তার।

জেরিক্যান থেকে দু'ঢোক পানি খেলো রানা। হাত-পা বাঁধা লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এরপর আবার যখন তোমাকে কোন প্রশ্ন করব, সেটা আমি একবারই উচ্চারণ করব। দশ সেকেন্ড সময় পাবে। উত্তর দিলে ভাল, তা না হলে আবার আগুনে ফেলা হবে তোমাকে। যদি সঠিক উত্তর না দাও, বা আংশিক উত্তর দাও, ওই একই শাস্তি। এবার বলো, তোমার পুরো নাম কি?'

'জন বিলফোর্ড হেগেল!' আওয়াজ শুনে মনে হলো কেউ তার গলা চেপে ধরে আছে।

'তুমি আমাদেরকে খুন করতে এলে কেন?'

ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে উপুড় হলো বিলফোর্ড। তার চুল পুড়ে কুঁকড়ে গেছে। ভুরু বলতে কিছু নেই, শুধু কালো দাগ। বাম গালে ক্ষত, কমলা রঙের মাংস বেরিয়ে পড়েছে। রানার দিকে চোখ তুলে তাকাল সে, দ্রুত ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলছে। 'আমি ধরে নিয়েছিলাম আপনারা পোচার, গণ্ডার মারতে এসেছেন,' ফুঁপিয়ে উঠে বলল সে। 'আইনে বলা আছে, পোচার দেখলে গুলি করা যাবে।'

সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল রানা, অলস ভঙ্গিতে দাঁড়াল, দু'পা এগিয়ে তার বুকের কাছে শার্ট আর শর্টস খামচে ধরে শূন্যে তুলল, তারপর ছুঁড়ে দিল আগুনের ওপর।

আধঘণ্টা পর আগুনের কাছে ফিরে এল নড়বেল। নিজের জায়গায় বসে মাংস চিবাচ্ছে রানা। ওদের প্রতিপক্ষ একটা মোপানি গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে, পাঁচ মিটার দূরে। চিবুকটা নেমে এসেছে বুকের ওপর, ফোঁপাচ্ছে এখনও। তার দিকে এক টুকরো মাংস ছুঁড়ে দিল রানা।

'কি, গান গাওয়ালে?' রানাকে জিজ্ঞেস করল নড়বেল।

'বলছে, সেই বিলফোর্ড হেগেল, ক্লিফোর্ড হেগেলের ছেলে। বিঙ্গায় ওর

বাপের একটা খামার আছে, কুমীর পালে। খামারটা বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়।'

রানার পাশে বসল নড়্বেল। জেরিক্যান থেকে দু'ঢোক পানি খেলো। 'আর কিছু?'

আরেক দিকে হাত তুলল রানা, ওদিকেও একটা মোপানি গাছ দেখা যাচ্ছে, বিলফোর্ডের রাইফেল সেটার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা। 'ওটা একটা পুরনো স্নাইপার রাইফেল। এনভয় এনফিল্ড। ৭.৬২ ক্যালিবার। এটা দিয়েই সাইফুর আর জেসিকাকে খুন করে সে।'

'স্বীকার করল?'

'হ্যাঁ, তবে একটু গরম করতে হয়েছে।'

'আর বাকি খুনগুলো?'

'ডক্টর খোদাবক্সের গাড়িতেও সে-ই বোমা ফিট করেছিল। ল্যাবটাতেও আগুন দেয়। চীনা ক্যান্স্যার রোগীদের প্লেনটাও উড়িয়ে দেয়।'

'কি বলছ! প্রতিটি অপরাধ স্বীকার করল?'

'বললাম না, গরম করতে হয়েছে।'

'জিজ্ঞেস করোনি, এতগুলো খুন কেন করল?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, বলল, 'বলছে, ওর কোন দোষ নেই। ওর বাপ ওকে য়া করতে বলেছে ও তাই করেছে।'

'বাহ্! এই না হলে ছেলে! সব দোষ বাপের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। তা, বাপজান কেন তাকে এতগুলো খুন করার নির্দেশ দিল?'

মাথা নাড়ল রানা। 'বলছে, কারণটা ও জানে না। ও শুধু বাপের নির্দেশ পালন করেছে, কারণ জানতে চায়নি। আমার ধারণা, সত্যি কথাই বলছে ছোকরা।'

'এখন তাহলে বানচোতটাকে ধরতে হয়,' বলল নড়্বেল। 'মানে বাপটাকে।'

'হ্যাঁ। পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল নড়্বেল। 'এখুনি রওনা হলে বিঙ্গায় আমরা ভোর হবার আগেই পৌঁছে যাব।'

সিধে হলো রানা, হাতের মাংস আগুনে ফেলে দিল। 'চলো তাহলে।'

আট টনী লেল্যান্ড ট্রাকের ক্যাবে রয়েছে মামুন। সীটের সামনে মেঝেতে বসে ছিল, ড্রাইভার অভয় দেয়ায় মেঝে থেকে উঠে প্যাসেঞ্জার সীটে বসল।

এই মাত্র কিছুক্ষণ আগে ছোট্ট গ্রাম বিঙ্গা ছাড়িয়ে এসেছে ওরা। গ্রামটা লেক কারিবার দক্ষিণ-পুব দিকে পটে আঁকা ছবির মত সাজানো। ভোর পাঁচটা বাজতে চলেছে, রাস্তা-ঘাট এখনও ফাঁকা, তবু সাবধানের মার নেই ভেবে ক্যাবের মেঝেতে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল সে।

ড্রাইভারের চেহারায় গম্ভীর ও আত্মবিশ্বাসী একটা ভাব আছে। লম্বায় সে এত কম, হুইলের ওপর দিয়ে সামনে তাকাবার জন্যে সীটের ওপর একজোড়া বড় কুশন রাখতে হয়েছে। তবে লোকটার দক্ষতা মুগ্ধ করেছে মামুনকে। এগারো ঘণ্টা গাড়ি চালাচ্ছে সে, থেমেছে শুধু প্রস্রাব পেলে আর পিছনে রাখা জেরিক্যান

এনে ট্যাংকে ফুয়েল ভরার সময়। কার্গো হিসেবে একজন ঠিকাদারের হেভি ফিশিং নেট বহন করছে ট্রাক, আরও আছে সেভদা চিলড্রেন পরিচালিত এতিমখানার জন্যে টিনে ভরা মাংস।

'আর তিন কিলোমিটার, বস্,' মামুনকে বলল ড্রাইভার। 'বাঁ দিকে তাকান, আলো দেখতে পাবেন—একটা রিজ-এর ওপর।'

'আলো?' জিজ্ঞেস করল মামুন। 'এই ভোরবেলা?'

'ও, আপনি তাহলে জানেন না! ক্লিফোর্ড হেগেলের সিকিউরিটি লাইট সব সময় জ্বালা থাকে। এই রাস্তায় বহু বছর ধরে আসা-যাওয়া করছি আমি, সাধারণত রাতেই। সব সময় বড় বড় আলো জ্বালিয়ে রাখে। এই নিয়ম সম্ভবত যুদ্ধের সময় থেকে চলে আসছে। এলাকাটা সে-সময় অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। লেক পার হয়ে জাম্বিয়া থেকে মুক্তিযোদ্ধারা আসত। যুদ্ধের পর আসত পোচাররা। তখনকার বিপদের সময় শ্বেতাঙ্গরা সব পালিয়ে যায়, মাত্র দু'পাঁচটা পরিবার সাহস করে থেকে যায়। নিজস্ব বাহিনী তৈরি করে তারা, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করে। প্রচুর টাকা থাকলে যা হয়, দেশ স্বাধীন হবার পরও ওদের গায়ে আঁচড় লাগেনি।

'ব্যক্তিগত বাহিনী বেআইনী নয়?' জিজ্ঞেস করল মামুন। 'সরকারী নিষেধাজ্ঞা নেই?'

'বেআইনী তো বটেই,' বলল ড্রাইভার। 'কিন্তু বাহিনীর আকার ছোট করে আনা হয়েছে, নাম দেয়া হয়েছে বডিগার্ড, ফলে সরকারী নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করা হচ্ছে না।'

'দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তিযোদ্ধারা হামলা করেনি?'

'করেনি আবার! তিনবার। কিন্তু জিম্বাবুই বহু গোত্রে বিভক্ত একটা জাতি, বস্। দলাদলি আর আঞ্চলিকতা এই দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। সয়-সম্পত্তি আর ব্যবসা, সবই তো সাদাদের হাতে, ফলে কাজ বলুন কর্জ বলুন সবকিছুর জন্যে কালোরা ওদের মুখাপেক্ষী। যতই দেশ-বিরোধী ভূমিকা থাকুক, একদল কালো চিরকাল সাদাদের পক্ষ নিতে ভালবাসে। তাদের সাহায্যে প্রতিটি হামলা ঠেকিয়ে আজও টিকে আছে সাদারা।'

'বলছ বডিগার্ড। সংখ্যায় তারা কত হবে?'

'যত দূর শুনেছি, ক্লিফোর্ড হেগেলের বডিগার্ড পনেরো জন। সবাই তারা ম্যাটাবেল। হ্যান্ড-গ্রেনেড, মেশিন-গান, পিস্তল, সবই দেয়া হয়েছে তাদের। প্রত্যেকেই কুখ্যাত অপরাধী। এদের মধ্যে অনেকেই এক সময় পোচার ছিল। ভাল সুযোগ-সুবিধে পায়, প্রয়োজনে হেগেল পরিবারের জন্যে তারা প্রাণ দিতেও দ্বিধা করবে না।'

'স্বাধীনতার পর সরকার এই শ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি?' মামুন জানতে চাইল।

'না। সেজন্যে দায়ী আমাদের প্রেসিডেন্ট। মুগাবে ঘোষণা করেন, কোনরকম প্রতিশোধ নেয়া যাবে না। অথচ নির্বাচনের ফলাফল মেনে না নেয়ায় অনেক ম্যাটাবেলকে পুলিস লেলিয়ে দিয়ে খুন করা হয়। ম্যাটাবেলরা বাধ্য হয়ে জঙ্গলে

পালিয়ে আসে। শ্বেতাঙ্গরা তাদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়।'

'তুমি কোন্ গোত্রের লোক, তাদের কি অবস্থা?'

'আমি শোনা গোত্রের লোক, বস্। আমাদের বসবাস উত্তরে। ম্যাটাবেলরা শক্তিধর, বাহুতে জোর আছে, সাহসীও বটে, কিন্তু আমরা শোনারা বুদ্ধিমান আর কৌশলী, ফলে দেশটা আমরাই চালাই।'

একজোড়া ট্যাবলেট মুখে পুরল মামুন—একটা অ্যান্টি-ডায়রিয়া, অন্যটা অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া। জেরিক্যান তুলে পানি খেলো সে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ক্লিফোর্ড হেগেলের পনেরোজন বডিগার্ড শুধু পাহারা দেয়, অন্য কোন কাজ করে না?'

'এখন তো শ্বেতাঙ্গরা কোন বিপদের মধ্যে নেই, কাজেই তাদের বডিগার্ডেরও দরকার নেই,' বলল ড্রাইভার। 'শুধু ক্রিমিনাল টাইপের কিছু শ্বেতাঙ্গ বডিগার্ড রাখে। ক্লিফোর্ড হেগেলের ম্যাটাবেলগুলো ক্রোকোডাইল ফার্মে কাজ করে, নদীর কিনারায় হাঁটাহাঁটি করে ডিম খোঁজে।'

'বিপজ্জনক কাজ।'

বামুন ড্রাইভার মাথা ঝাঁকাল। 'ম্যাটাবেল জাতটাই বিপদের মধ্যে থাকতে পছন্দ করে, বস্।' ঘাড় ফিরিয়ে নিজের পিছনে, ক্যাব শেলফের দিকে তাকাল একবার। মামুনের কালো রাকস্যাকটা রয়েছে ওখানে, পাশেই দেখা যাচ্ছে একে/ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল ও একটা কোল্ট ১৯১১। আবার রাস্তার ওপর চোখ রাখল সে। 'হারারেতে থাকতে আপনার গল্প খানিকটা কানে এল, বস্। কিছু যদি মনে না করেন তাহলে একটা কথা বলি—বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি সাহস করছেন আপনি। আপনার কি কাজ আমি জানি না। জানতে চাইও না। শুধু বলব, এতটুকু অসতর্ক হবেন না। এদের বিরুদ্ধে লাগা আর গোক্ষুরের লেজে পা দেয়া, এক কথা।'

মামুন কিছু বলল না।

'শ্বেতাঙ্গরা বেশির ভাগই আমাদের রক্ত চুষছে, বস্,' বক বক করে চলেছে ড্রাইভার। 'তার মধ্যে ক্লিফোর্ড হেগেল হলো রাক্ষস, শুধু রক্ত চুষছে না, আমাদের হাড়-মজ্জা-মাংস সব খেয়ে ফেলছে। তার ছেলেটা আরও ভয়ঙ্কর। ম্যাটাবেলরা স্বীকার করে না, তবে নড়বেলদের মুখে শুনেছি সে নাকি মানুষ শিকার করে। কয়েকজন মন্ত্রীর ছেলে তার বন্ধু, বছরে একবার তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে জঙ্গলে নিয়ে আসে সে, তারপর মানুষ শিকারে বেরোয়। লোকমুখে শুনেছি, সত্যি-মিথ্যে যীশু বলতে পারবে।'

'ধন্যবাদ। আমি সাবধানে থাকব,' বলল মামুন। তারপর জানতে চাইল, 'তোমার কি ধারণা, এই সময়টায় ম্যাটাবেলরা বাড়িতেই পাহারা দিচ্ছে?'

মাথা নাড়ল ড্রাইভার। 'না। বছরের এই সময় ডিম খুঁজতে বেরোয় ওরা। ধরুন সাত থেকে আটজন নদী আর লেকের ধারে ঘোরাফেরা করছে।'

'বাড়ির কাছাকাছি?'

'না, বস্। অনেক দূরে। হেঁটে পৌঁছতে এই ধরুন দশটা সিগারেট।' মামুনের দিকে তাকিয়ে তামাটে রঙের দাঁত বের করে হাসল ড্রাইভার। বামন

চেইন-স্মোকার। জিম্বাবুইয়ে প্রচুর তামাক চাষ হয়, ফলে সিগারেটের দাম খুব কম। রাতে যখনই মামুন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার দূরত্ব জানতে চেয়েছে, সিগারেটের সংখ্যা উল্লেখ করে আনুমানিক হিসাব দিয়েছে সে। যদি বলে পাঁচ সিগারেট, বুঝতে হবে পাঁচটা সিগারেট খেতে যে সময় লাগে, আলোচ্য গন্তব্যে পৌঁছুতেও ওই সময় লাগবে। প্রতিবার তার এই হিসাব সঠিক প্রমাণিত হয়েছে, ফলে মনে মনে কৌতুক বোধ না করে পারেনি মামুন। ড্রাইভারের দশ সিগারেট মানে হলো, হিসাব করে বের করেছে সে, কমপক্ষে আশি কিলোমিটার, এমনকি একশো কিলোমিটারও হতে পারে। অর্থাৎ, পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যদি কোন অ্যাকশন শুরু হয়, ক্লিফোর্ড হেগেলের সব বডিগার্ড তাতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে না।

'বললে ম্যাটাবেল বডিগার্ডদের কাছে হ্যান্ড-গ্রেনেড ও মেশিন-গান আছে। কিন্তু আমি জানি, জিম্বাবুইয়ে শুধু পিস্তলের লাইসেন্স দেয়া হয়।'

'শ্বেতাঙ্গদের সবার কাছে সব ধরনের অস্ত্র থাকে। ওদের লাইসেন্স দরকার হয় না, ঘুষ দিলেই চলে। তবে রাইফেলের জন্যে লাইসেন্স ইস্যু করার নিয়ম আছে। কারণ কুমীরের ডিম সংগ্রহ অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ।' হাত তুলে সামনে, খানিকটা বাম দিকে মামুনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল ড্রাইভার। 'ওই দেখুন আলো, বস্। বাড়িটাকে আমরা এক কিলোমিটার দূর থেকে পাশ কাটিয়ে যাব।' হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা দেখাল। 'এটা যখন শেষ হবে।'

মামুনের জিনস্, শার্ট, বুট, খুলি কামড়ানো ক্যাপ, সবই কালো। পিছনের শেলফ থেকে একটা হেভী ফ্ল্যাক জ্যাকেট টেনে নিয়ে গায়ে চড়াল সে। তারপর শার্টের পকেট থেকে পঞ্চাশ ডলারের দুটো নোট বের করে ড্রাইভার আর নিজের সীটের মাঝখানে রাখল।

ড্রাইভারের আচরণ বিস্মিত করল তাকে, সামান্য লজ্জাও পেল। নোট দুটোর দিকে তাকাল লোকটা, হুইল থেকে হাত নামিয়ে তুলল সেগুলো, তারপর ফেলে দিল মামুনের কোলে। 'লাগবে না, বস্। অন্তত এই কাজে নয়। আমার বস্, মি. সানডে, এই ট্রিপে আমাকে ডাবল বোনাস দিয়েছেন।'

তার হাতের সিগারেট পুড়ে প্রায় আঙুল ছুঁই ছুঁই করছে। নিজের বাম দিকে তাকাল মামুন। উজ্জ্বল আলোগুলো দ্রুত কাছে চলে আসছে। শেলফ থেকে পিস্তলটা নিয়ে শোল্ডার-হোলস্টারে ভরল সে। সীটের কিনারায় সরে বসল, একে/ফরটিসেভেনটা পিঠে ঝোলাল, স্ট্র্যাপটা থাকল বুকের ওপর। পাউচে ভরল চারটে স্পেয়ার ম্যাগাজিন, বেল্টের বাম দিকে ঝুলে আছে ওটা।

'মূল বাড়ি থেকে ম্যাটাবেলদের কম্পাউন্ড কত দূরে?'

হাত তুলে দেখাল ড্রাইভার। 'কম্পাউন্ড একটা নয়, বস্, দুটো। একটা ম্যাটাবেলদের জন্যে, আরেকটা বাকি সবার জন্যে। আপনি দুটো কম্পাউন্ডেই আলো দেখতে পাচ্ছেন। ম্যাটাবেলদেরটা কাছে। বাড়ি থেকে ওটা আধ কিলোমিটার দূরে। বাকি আফ্রিকানদের কমপাউন্ড প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। কখনও যদি কোন গোলমাল বাধে অর্থাৎ গোলাগুলি হয়, অন্য আফ্রিকানরা নাক গলাবে না। অর্থাৎ তারা কোন ঝুঁকি নেবে না। মাথা নিচু করে বসে থাকবে যে

যার নিজের ঘরে। ক্লিফোর্ড হেগেল তাতে কিছু মনে করবে না, কারণ ওদেরকে এই কাজের জন্যে রাখা হয়নি।'

গিয়ার বদল করল ড্রাইভার, হালকাভাবে চাপ দিল ব্রেকে, তারপর উপচে পড়া অ্যাশট্রেতে হাতের সিগারেটটা জোর করে গুঁজে দিল।

'তুমি এত সব তথ্য জানলে কিভাবে?'

ড্রাইভার জবাব দিল, 'কয়েক বছর আগে পুলিসের ট্র্যাকার ছিলাম আমি, বস্। আমার হাইট কম তো, তাই বিধি মোতাবেক চাকরি হয়নি, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাই। পেতাম না, পুলিসের ডেপুটি কমিশনার জন বুকানি দয়া করেছিলেন। চুক্তি শেষ হবার পর মি. সানডে আমাকে প্রস্তাব দিলেন, পুলিস বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যা কিছু জানতে পারব তা যদি তাঁকে সব বলে দিই, তিনি আমাকে ড্রাইভারের চাকরি দিতে পারেন। আমি রাজি হয়ে যাই।' খিক খিক করে হাসতে শুরু করল সে।

'হাসছ কেন?'

'চাকরি হবার পর মি. সানডেকে একদিন বললাম, আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করুন, স্যার। উনি জানতে চাইলেন, কেন? আমি বললাম, আপনার শর্ত আমি পূরণ করতে পারছি না, কারণ আমার পুলিস বন্ধুরা কিভাবে যেন জেনে ফেলেছে যে আমি আপনার চাকরি নিয়েছি, ফলে তারা আমাকে দেখামাত্র মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে, এমনকি তাকায়ও না। মি. সানডে বললেন, ঠিক আছে, কোন তথ্য আনতে হবে না, মন দিয়ে গাড়ি চালাও।

'তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি।'

'ওই যে বললাম, পুলিসের ট্র্যাকার ছিলাম। তখনই পুলিস বন্ধুদের মুখ থেকে এ-সব জেনেছি। বস্, জায়গামত পৌঁছে যাচ্ছি আমরা। বাম দিকে প্রকাণ্ড একটা গাছ আর ঝোপ আছে, একটু পরই দেখতে পাবেন। স্পীড একেবারে কমিয়ে আনছি, স্যার। গুড লাক, বস্।'

তার পিঠ চাপড়ে দিল মামুন। ট্রাকের গতি কমে এল। ক্যাবের দরজা খুলে নিচে লাফিয়ে পড়ল সে। পাঁচ সেকেন্ড পর একটা ঝোপের আড়ালে চলে এল। ট্রাক এঞ্জিনের আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে।

সাত

বিলফোর্ড হেগেল জীবনে এত কষ্ট পায়নি। শরীরে আগুন লাগলে মরে যাওয়াই বোধহয় ভাল। তার ক্ষতগুলো তেমন গভীর না হলেও, প্রতিটি ফোস্কা ফেটে গেছে, তাছাড়া পা থেকে মাথা পর্যন্ত ক্ষতের সংখ্যা গুনেও শেষ করা যাবে না। শরীরের আগুন অনেক আগেই নিভে গেছে, অথচ তারপরও অসহ্য জ্বালা পাগল করে তুলছে তাকে, সুযোগ থাকলে সম্ভবত আত্মহত্যা করে বসত। তাকে যারা বন্দী করেছে, ওদের মনে দয়া-রহম বলে কিছু নেই। সে কাঁদছে, ফোঁপাচ্ছে,

গোঙাচ্ছে, পেশাব করে ফেলছে, অথচ এ-সব ওরা দেখেও না দেখার ভান করছে। হাত দুটো এখনও পিছমোড়া করে বাঁধা। পা জোড়াও বেঁধেছে, তবে এক করে নয়, দুই গোড়ালির মাঝখানে নাইলন কর্ড বিশ ইঞ্চি দীর্ঘ। কর্ডের দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে তার, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার আছাড় খেয়ে পড়তে হয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটতে হচ্ছে, অথচ মুখের সামনে মাত্র দু'বার পানির বোতল ধরা হয়েছে, তা-ও তিন সেকেন্ডের জন্যে।

প্রথম দু'ঘণ্টা ওদের দু'জনের প্রতি তীব্র আক্রোশ আর ঘৃণা বোধ করেছে সে। তারপর বিস্ময়সূচক প্রশ্নটা ঢুকল মাথায়, ওদের ফাঁদে সে পা দিল কিভাবে? ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বললেও কম বলা হয়। নিজেকে সে জিম্বাবুইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্র্যাকার বলে মনে করে, কিন্তু পিছনের লোক দু'জন নেট দিয়ে প্রজাপতি ধরার মত সহজে তাকে বন্দী করেছে। আদিবাসী নড়বেল যখন 'স্টিক ওয়াকিং' শুরু করল, পার্থক্যটা তার চোখে ধরা পড়ল না কেন? মাসুদ রানা নামে বিদেশী লোকটা ট্র্যাক ছেড়ে সরে গেল, ঘুরপথে পৌঁছুল তার পিছনে, এটাই বা কেন তার চোখ এড়িয়ে গেল?

ধীরে ধীরে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে–তার পিছনে নিশ্চুপ দুই ছায়ামূর্তি কেউটের চেয়েও ভয়ঙ্কর। মনে পড়ল, বিদেশী লোকটা ছোট্ট এক প্রস্থ কর্ড দিয়ে মুচড়ে পিঠে তুলে আনা দুই হাতের দুই বুড়ো আঙুল এক করে বেঁধে পুরোপুরি অচল করে ফেলে তাকে, তারপর প্রথম প্রশ্নটা উচ্চারণ করে। রাগ আর ঘৃণা চেপে রাখতে পারেনি সে, উত্তরে একদলা থুথু ছিটায়। পরমুহূর্তে দেখতে পায়, আগুনের ওপর বসে আছে। কখন হাত বাড়াল, কখন ধরল, কখন ছুঁড়ে দিল, চোখ বা অনুভূতি দিয়ে অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এমন ঠাণ্ডা গলাও জীবনে কখনও শোনেনি বিলফোর্ড। প্রচণ্ড রেগে গেলে তার বাবার গলা অসম্ভব ঠাণ্ডা শোনায়, এই লোকের কণ্ঠস্বর তারচেয়েও শীতল, শব্দগুলো যেন বরফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে এল তার দিকে। চার ঘণ্টা পর মৃত্যুভয় ভর করল তার ওপর। প্রথমে সে ভেবেছিল, বাবা আর তাকে যদি কোর্টে তোলা হয়, বাবার প্রভাবশালী বন্ধুরা যেখানে যত সুতো আছে সব টেনে শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে আনতে পারবে। জেল-জরিমানা যা-ই হোক, দণ্ড স্থগিত রাখার ব্যবস্থাও তো করা যায়। কিংবা না হয় মাস কয়েক জেল খাটতেই হলো। কিন্তু হোঁচট খেতে খেতে যতই সে এগোচ্ছে, ততই দৃঢ় হচ্ছে বিশ্বাসটা–ওরা ব্যাপারটা মেনে নেবে না। এমনকি হয়তো, আইন বা কোর্টের সাহায্যই হয়তো নেবে না ওরা। বিলফোর্ডের ভয় বাড়তে শুরু করল। এই প্রকৃতির লোকের সঙ্গে আগে তার পরিচয় ঘটেনি। এরা অন্য ধাতুতে গড়া।

এখানে, পথের ওপর, আগুন জ্বলছে না। মৃত্যু ভয়ে কাতর মন মরিয়া হয়ে উঠতে চাইছে। ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল সে, তারপর বলল, 'আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'চোপ!' ধমকে উঠল রানা।

'আহা, শুনিই না কি বলতে চায়। বেজন্মা কুত্তা বলে তুমি ওকে গান গাইতেও দেবে না, এটা ঠিক না।'

নড়বেলের কৌতুকে রানা হাসল না। তবে চুপ করে থাকল।

প্রশ্রয় পেয়ে বিলফোর্ড বলল, 'আমি আমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করেছি। তাতে করে বাবাও আমার সঙ্গে ফেঁসে গেছে।'

'বাহ্, কথাবার্তায় বুদ্ধির ছোঁয়া পাওয়া যাচ্ছে, তাই না?' হেসে উঠল নড্‌বেল।

'আমি বলি কি,' ব্যথা সহ্য করার জন্যে দাঁত চেপে রেখেছে বিলফোর্ড, গলার আওয়াজ হিসহিসে শোনাল, 'আমার সঙ্গে একটা রফায় আসুন আপনারা। যা হবার তা তো হয়েই গেছে, তাই না? আসুন, বরং চিন্তা করে দেখি ক্ষতিপূরণ করা যায় কিনা।'

'তোমার প্রস্তাবটা কি?'

'পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বললে, বাবা হয়তো প্রচুর টাকা দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে রাজি হবে,' বলল বিলফোর্ড।

'ডক্টর খোদাবক্স, জেসিকা, সাইফুর, তিনজন চীনা ভদ্রলোক, পাইলট, কয়েকজন ক্রু, স্টুয়ার্ড, ছয়জন মার্সেনারি–সব মিলিয়ে কতজনকে মেরেছ তুমি? মাথা পিছু কত করে ক্ষতিপূরণ দিতে চাও?' জিজ্ঞেস করল নড্‌বেল। 'ল্যাবে আগুন দিয়েছ, গাড়ি উড়িয়েছ, প্লেন ফেলে দিয়েছ…'

বিরক্ত হয়ে রানা বলল, 'এ-সব কি হচ্ছে, নড্‌বেল?'

বিলফোর্ড তাড়াতাড়ি বলল, 'বাবা হয়তো এক লাখ ডলার দিতেও আপত্তি করবে না।'

'অনেক কম হয়ে যায়,' মাথা নেড়ে বলল নড্‌বেল।

'দু'লাখ?'

'পঞ্চাশ লাখ থেকে শুরু করো, তারপর ওপর দিকে উঠতে থাকো,' বলল নড্‌বেল। 'তবু কথা দিতে পারছি না আমার বন্ধুকে রাজি করতে পারব কিনা।'

বিলফোর্ড বুঝতে পারল, তাকে নিয়ে খেলছে নড্‌বেল। সারা শরীরে তীব্র জ্বলুনি সত্ত্বেও শিরশিরে ঠাণ্ডা একটা ভয়ের স্রোত নেমে এল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। মনে হলো ইস্পাতের চেয়েও কঠিন কোন প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে ওরা। ওদের নিজস্ব তৈরি আইনে বিচাব চাইবে, বিচারক আর জল্লাদের ভূমিকাতেও থাকবে নিজেরাই।

লেকের ডান দিক থেকে বাড়িটার দিকে এগোচ্ছে ওরা। এই মুহূর্তে সেটা তিন কিলোমিটার দূরে। ম্যাটাবেলদের কমপাউন্ডটা ওদের বাম দিকে পড়বে। বিলফোর্ড একটা সিদ্ধান্ত নিল। কমপাউন্ড যখন আর মাত্র এক কিলোমিটার দূরে থাকবে, চিৎকার করে ম্যাটাবেলদের সতর্ক করে দেবে সে।

কিন্তু সুযোগ পাওয়া গেল না। আধ কিলোমিটার এগোবার পর রানার ঠাণ্ডা গলা থামতে বলল তাকে। এক মুহূর্ত পর শক্ত এক জোড়া হাত অনুভব করল কাঁধে, হাতড়াচ্ছে। চুল ধরে মাথাটা পিছন দিকে কাত করা হলো, মুখের ভেতর জোর করে ঢোকানো হলো এক টুকরো কাপড়, আরেক ফালি কাপড় দিয়ে মুখটা শক্ত করে বাঁধা হলো ঘাড়ের সঙ্গে।

বিলফোর্ডের কানে ফিসফিস করল নড্‌বেল, 'তোমার আর কোন গান আমরা শুনতে চাই না। এখন থেকে সাবধানে থাকবে, কোন রকম বেচাল দেখলে খুলির

পিছনে গুলি করব।'

শরীরটা হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে এল, বিলফোর্ডের মনে হলো সে আর হাঁটতে পারবে না। পিছন থেকে তার নিতম্বে কষে একটা লাথি মারল নড়বেল, বলল, 'হাঁট শালা, সময় নষ্ট করছিস কেন!'

হোঁচট খেয়ে সিধে হলো বিলফোর্ড, ফুঁপিয়ে উঠে আবার হাঁটতে শুরু করল। এখন আর কাউকে সতর্ক করার কথা মাথায় নেই। শুধু বাবার কথা ভাবতে পারছে। সবই এখন তার ওপর নির্ভর করে।

বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে থামল ওরা। বিলফোর্ডের হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, তারপর কাত হয়ে মাটিতে ঢলে পড়ল শরীরটা, চাপাস্বরে গোঙাচ্ছে সারাক্ষণ। সিকিউরিটি ফ্লাড লাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে বাড়িটা। ওরা দু'জন কথা বলছে, শুনতে পাচ্ছে সে।

'ঘুরে পিছন দিকে গেলে ভাল হয় না?' নড়বেল জানতে চাইল। 'তারপর ইলেকট্রিসিটির লাইন কেটে দিলাম?'

মাথা নাড়ল রানা। 'লোডশেডিং-এ বাংলাদেশ যদি চ্যাম্পিয়ন হয়, জিম্বাবুই নিশ্চয়ই রানার্স আপ। হেগেলদের প্রাসাদে ইমার্জেন্সী জেনারেটর থাকতে বাধ্য। আয়োজনটাও সম্ভবত অটোমেটিক, বিদ্যুৎ চলে গেলে আপনাআপনি জেনারেটর চালু হয়ে যাবে।'

চুপচাপ গুড়ি মেরে বসে থাকল দু'মিনিট, তারপর রাইফেল দিয়ে বিলফোর্ডের পাঁজরে গুঁতো মারল রানা। 'এই সোনার টুকরোটাই একমাত্র সন্তান, তাই না? এর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে চলো দরজা পর্যন্ত হেঁটে যাই, তারপর কলিংবেল বাজাই।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে মাথা ঝাঁকাল নড়বেল। 'আমি কোন সমস্যা দেখছি না।'

নড়বেলই টান দিয়ে দাঁড় করাল বিলফোর্ডকে। কোমর থেকে এক প্রস্থ নাইলন কর্ড নিয়ে একটা প্রান্ত নিজের রাইফেলের ট্রিগার গার্ডে জড়াল, অপরপ্রান্তটা জড়াল বিলফোর্ডের গলা আর ঘাড়ে। কর্ডের দুই প্রান্ত টেনে এক করে বাঁধার পর দেখা গেল রাইফেলের মাজল শক্তভাবে বিলফোর্ডের খুলির পিছনে সেঁটে আছে।

'ঝাঁকি খেলে বা দ্রুত ঘাড় ফেরালে মগজ বেরিয়ে আসবে,' বলল নড়বেল। 'মানে, যেটুকু আছে আর কি।'

আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা। ঝোপ-ঝাড়গুলোকে পাশ কাটাচ্ছে দেখেশুনে, সাবধানে।

আলোকিত একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই ওদেরকে দেখতে পেল মামুন। অনেক দূরে, ওদের উল্টোদিকে রয়েছে সে, তা সত্ত্বেও দেখামাত্র প্রথমে রানার কাঠামো, তারপর নড়বেলের কাঠামো চিনতে পারল। কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর কি ঘটছে আন্দাজ করতে পারল সে।

প্রথমেই চিন্তা করল, পাহাড়ের ঢাল থেকে নেমে এখুনি ওদের সঙ্গে তার যোগ দেয়া উচিত। সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, কিন্তু তারপরই ট্রেনিঙের কথা মনে পড়ে গেল–সব সময় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে, হুট করে কিছু করবে না। যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকো, কি ঘটছে ভাল করে না বোঝা পর্যন্ত ব্যাকগ্রাউন্ডেই থাকবে।

একে/ফরটিসেভেনের সেফটি অফ করে আবার বসে পড়ল মামুন। উজ্জ্বল আলোয় তিনজনকে ধীরে ধীরে এগোতে দেখছে, বাড়ির সামনে পৌঁছে গেছে ওরা।

বাড়ির ভেতর, মাস্টার বেডরুমে, অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ক্লিফোর্ড হেগেলের। গভীর ঘুম থেকে জেগে পুরোমাত্রায় সচেতন হতে পাঁচ সেকেন্ডেরও কম সময় লাগল তার। বিছানার হেডরেস্টে সেট করা অ্যালার্ম হাত-ঝাপটা দিয়ে অফ করল, বিছানা থেকে কার্পেটে নেমে পর্দা ফেলা জানালার দিকে এগোল। ঘাড়ে সিংহের মত সোনালি কেশর, শরীরটা যেন মেদহীন একটা দানবের, সোনালি লোমে ঢাকা, নড়াচড়ায় নিয়ন্ত্রিত ক্ষিপ্র একটা ভাব। ক্লিফোর্ড উদ্বিগ্ন নয়; সন্ধে থেকে ভোরের মধ্যে প্রায়ই এরকম অ্যালার্ম বেজে ওঠে। কৌতূহলী কোন হায়েনা বা অন্য কোন জানোয়ার বাড়িটাকে ঘিরে থাকা ইনফ্রারেড-রের সংস্পর্শে চলে আসে। কিন্তু পর্দাটা আধ ইঞ্চি সরিয়ে বাইরে তাকাতে বুঝতে পারল এবার সেরকম কিছু ঘটেনি। ছেলে বিলফোর্ডকে দেখে একটা হার্টবিট মিস করল সে। বিলফোর্ডের চেহারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে, সেজন্যে মনে কোন সহানুভূতি বা ব্যথা জাগল না, রাগে জ্বালা ধরে গেল শরীরে।

পঞ্চাশ মিটার দূরে রয়েছে ওরা। বিলফোর্ডের মাথার পিছনে রাইফেলের মাজল। লোক দু'জনও তার পিছনে। দৃশ্যটা মাত্র দুই কি তিন সেকেন্ড দেখল সে, মনে মনে কাকে যেন অভিশাপ দিল, তারপরই দ্রুত কাজ শুরু করল।

দরজার পাশের একটা বোতামে পরপর চারবার চাপ দিল ক্লিফোর্ড। এই বোতাম ম্যাটাবেল কমপাউন্ডে সেট করা একটা ঘণ্টার সঙ্গে সংযুক্ত, চারবার বেজে ওঠার অর্থ চরম বিপদ দেখা দিয়েছে–টোটাল ইমার্জেন্সী। দরজা খুলে বেডরুম থেকে হলে বেরিয়ে এল সে, র‍্যাক থেকে একটা রাইফেল নামাল। পরনে শুধু ঢোলা সারং, পায়ে নরম চামড়ার চটি, হলের দরজার পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে।

চার বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ডোরবেলটা আনিয়েছে ক্লিফোর্ড, আওয়াজটা তাকে তো বটেই, তার বন্ধু-বান্ধবকেও আনন্দ দান করে। দশ সেকেন্ড পর বাজল সেটা, বাইরে থেকে কেউ চাপ দিয়েছে বোতামে। কানে ঢুকল বিটোফেনের ফার্স্ট পিয়ানো কনসারটো।

রোলেক্স ডায়ালে চোখ, গুনে গুনে নব্বুই সেকেন্ড অপেক্ষা করল ক্লিফোর্ড। ভোর পাঁচটার সময় কারও ঘুম ভাঙতে এক দেড় মিনিট সময় তো লাগতেই পারে। হাতে অস্ত্র নিয়ে তৈরি হবার জন্যে এই সময়টা ম্যাটাবেলদের দরকার।

ইমার্জেন্সী বেল বাজার পর বসে নেই তারা, সম্ভবত এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে।

রোলেক্সের আলোকিত ডায়াল থেকে চোখ তুলে দরজার দিকে ঘুরবে, আবার ডোরবেল বেজে উঠল। উত্তেজিত হয়ে আছে ক্লিফোর্ড, কানে আওয়াজটা খুব তীক্ষ্ণ হয়ে বাজল, তাগাদার সুরটা স্পষ্ট। রাইফেলের মাজল সিলিঙের দিকে তাক করা, চেইন সরিয়ে দরজার কবাট ফাঁক করল সে। পাঁচ মিটার সামনে বিলফোর্ড দাঁড়িয়ে, অগ্নিদগ্ধ মুখ নগ্ন আতঙ্কে বিকৃত, গলার আওয়াজ এত কর্কশ যে প্রায় অচেনা লাগল কানে।

'পা, হঠাৎ কিছু করে বোসো না…রাইফেলটা আমার ঘাড়ে বেঁধে রেখেছে!'

ছেলের দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ক্লিফোর্ড। দুঃখ বা মায়ায় নয়, রাগে কেঁপে উঠল শরীরটা। 'কার এত সাহস যে আমার ছেলের গায়ে হাত দেয়!'

'পা, ওরা কি বলে শোনো…বোকার মত কিছু করে বসো না!' প্রাণভয়ে তোতলাচ্ছে বিলফোর্ড।

'তুমি কথা বোলো না!' ছেলেকে ধমক দিল ক্লিফোর্ড। 'একদম চুপ। নড়বে না।'

ছেলের পিছনে তাকাল ক্লিফোর্ড। এক লোক তার পিছনে দাঁড়িয়ে, খানিকটা বাম দিক ঘেঁষে, ডান হাতে রাইফেলটা ধরে আছে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে, ট্রিগারে তর্জনী। এই লোককে চেনে সে–স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়, যুদ্ধের পরও, বীর হিসেবে খুব নাম করেছিল, লোটন নড়বেল। অপর লোকটা বিলফোর্ডের তিন মিটার পিছনে, খানিকটা ডান দিক ঘেঁষে। তার ডান হাতে একটা রাইফেল, ব্যারেলটা কাঁধের ওপর তোলা। বাম হাতে আরেকটা রাইফেল, মাজলটা মাটির দিকে তাক করা। দ্বিতীয় রাইফেলটা বিলফোর্ডের, চিনতে পারল সে। লোকটা মাসুদ রানা, মিসেস ফেয়ারলি ভ্যান্স কন্যা-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাকে ভাড়া করে এনেছে।

মাসুদ রানাই কথা বলল, 'শোনো হে, রেড মাঙ্কি, তোমার হাতের ওই রাইফেল যদি এক ইঞ্চিও নড়ে, আমার বন্ধু তার রাইফেলের ট্রিগার টেনে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্তান হয়ে যাবে তুমি।'

'প্লীজ, পা! সত্যি ওরা তাই করবে!'

'শাটআপ, বিল!' গর্জে উঠল ক্লিফোর্ড। রাইফেলটা নাড়ল না। রানার চোখে চোখ রেখে বলল, 'কি ঘটছে এখানে?'

'তোমার পুত্রধন জঙ্গলে আমাদের পিছু নেয়। রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে গুলি করতে যাচ্ছিল, খুন করার জন্যে। ঠিক যেভাবে জেসিকা আর সাইফুরকে খুন করে।'

চট করে একবার ছেলেকে দেখে নিয়ে আবার রানার চোখে চোখ রাখল ক্লিফোর্ড। 'এ একেবারে ডাহা মিথ্যে! ওই ঘটনার সঙ্গে বিলের কোন সম্পর্ক নেই। আর, ও যদি জঙ্গলে তোমাদেরকে খুন করতে চাইত, এতক্ষণে তোমরা মরে ভূত হয়ে যেতে।'

রানার মুখে তিন-চারদিনের না কামানো দাড়ি। হাসল ও। তারপর ধীরে ধীরে বাম হাতের রাইফেলটা উঁচু করল। ক্লিফোর্ড লক্ষ করল, এক ফালি কাপড়ের সঙ্গে ঝুলছে রাইফেলটা।

'এটা তোমার ছেলের রাইফেল,' বলল রানা। 'ছোটবেলায় তুমি তাকে প্রেজেন্ট করেছিলে। পুলিসের ফরেনসিক এক্সপার্টরা মার্ডার বুলেট এই রাইফেল থেকে বেরিয়েছে কিনা বলতে পারবে। তোমার ছেলে বলছে, সবগুলো খুনই সে তোমার নির্দেশে করেছে। সেজন্যেই তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।'

'এ-ধরনের কোন কথা আমার ছেলে বলতেই পারে না,' ক্লিফোর্ড হিসহিস করে উঠল। আবার বিলফোর্ডের দিকে তাকাল সে। এবার সময় নিয়ে ক্ষতগুলো পরীক্ষা করল। মুখ কয়েক জায়গায় পুড়ে গেছে, চামড়া না থাকায় কাচা মাংস বেরিয়ে পড়েছে। কনুই পর্যন্ত হাত দুটোতে চামড়া প্রায় নেই বললেই চলে। শার্ট আর শর্টসও অনেক জায়গা পোড়া। খেঁকিয়ে উঠে জানতে চাইল, 'কোন্ সাহসে আমার ছেলেকে টরচার করা হয়েছে?'

'টরচার করলাম কোথায়, আগুনে ফেলে একটু ঝলসেছি,' বলল রানা। 'আসলে ভাগ্যটা ওর ভাল। সাধারণত কেউ আমাকে বা আমার বন্ধুকে খুন করতে এলে তার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করি না। ধরা পড়ার পর খুব তাড়াতাড়ি মারা যায় তারা। তবে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দরকার আমার, তাই বলছি চলো ভেতরে গিয়ে বসি, পুলিস ডাকার আগে দু'চার মিনিট গল্প করি।'

ফ্লাডলাইটের আলো অসম্পূর্ণ একটা বৃত্ত তৈরি করেছে, সেটার বাইরে চট করে একবার চোখ বুলাল ক্লিফোর্ড। কেউ নেই, কিছুই নড়ছে না। ম্যাটাবেলদের আরও সময় দিতে হবে। 'ঠিক আছে। পুলিসই ডাকব আমরা। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি বিলকে তোমরা ছেড়ে না দাও, তোমাদের বিরুদ্ধে কিডন্যাপিং, টরচার ও হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগ আনা হবে। জিম্বাবুইয়ের জেলের চেয়ে নরকও নাকি আরামদায়ক। বিলের বাঁধন খুলে দাও।'

আবার হাসল রানা। 'তুমি চালাকি করছ, ক্লিফোর্ড। পুলিস না আসা পর্যন্ত তোমার ছেলেকে আমরা ছাড়ছি না।'

'তোমাদের উদ্দেশ্য কি? কি নিয়ে কথা বলবে?' কথায় ব্যস্ত রেখে ম্যাটাবেলদের সময় দিতে চাইছে ক্লিফোর্ড। চাইছে ঘরের ভেতর ঢোকার আগেই ম্যাটাবেলরা পৌঁছে যাক। কথা শেষ হতেই রানার পিছনে, ছায়ার ভেতর, কি যেন নড়ে উঠতে দেখল। তারপর ডান দিকেও। ম্যাটাবেল বডিগার্ডরা পৌঁছে গেছে, পজিশন নিচ্ছে চারদিকে।

উঁচু ঢাল থেকে মামুনও তাদেরকে পৌঁছুতে দেখল। আলোর বাইরে থামল তারা, তবে গায়ে আভা লাগায় পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছে। সব মিলিয়ে ছয় জন ম্যাটাবেল। তিনজনের হাতে রাইফেল, সম্ভবত একে/ফরটিসেভেন। বাকি তিনজনের হাতে হ্যান্ড-গান। নিঃশব্দে পজিশন বাছাই করছে তারা।

*

এবার ক্লিফোর্ডের হাসার পালা। কিছু একটা শুনতে পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, আলোর অসমাপ্ত বৃত্তের বাইরে অস্পষ্ট কয়েকটা কালো আকৃতি দেখতে পেল।

'আজ এখানে কোন পুলিস আসছে না,' রানার চোখে চোখ রেখে বলল ক্লিফোর্ড। 'ছকটা পাল্টে গেছে। তোমরা একটা ইনফ্রারেড অ্যালার্ম টপকে এসেছ।'

'তাতে কিছু আসে যায় না,' জবাব দিল রানা। 'তোমার একমাত্র সন্তান যমের বাড়ি থেকে এক মিলি-সেকেন্ড দূরে রয়েছে। ম্যাটাবেলরা আমাকে বা আমার বন্ধুকে গুলি করলেও ট্রিগার টানার সময় পাব আমরা।'

পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছে ক্লিফোর্ড, তবে এখনও সে সময় পেতে চাইছে। আলোর বাইরে ইতিমধ্যে ছয়জন ম্যাটাবেলকে দেখেছে, আশা করছে কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কয়েকজন পৌঁছে যাবে। যত সময় পাবে, পরিস্থিতি ততই তার অনুকূলে চলে আসবে। 'বেশ, তাহলে এসো আলোচনা করি,' রানাকে বলল সে। 'তুমি একজন ইনভেস্টিগেটর, প্রাইভেট আই। কাজ করে টাকা কামাও। এসো, আমরা একটা চুক্তিতে আসি। তুমি ফিরে যাও, মিসেস ফেয়ারলি ভ্যান্সকে বলো যে যথেষ্ট ক্লু না থাকায় কেসটার কোন মীমাংসা করতে পারোনি। তার কাছ থেকে তোমার পাওনা টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। আমিও তোমাকে ভাল টাকা দিচ্ছি। কত পেলে খুশি হও, বলো। পঞ্চাশ হাজার ডলার? নগদে, নাকি সোনায়?'

আলোচনায় যোগ দিল নড়বেল। 'আগে তোমার ছেলেকে ধরে পেটাও,' বলল সে। 'কারণ, তোমার এত কষ্টের টাকা সব সে পানিতে ফেলে দিতে চায়।'

'মানে?'

'বিল এরইমধ্যে আমাদেরকে দু'লাখ ডলার সেধেছে, ক্লিফোর্ড,' বলল নড়বেল।

ক্লিফোর্ডের ভুরু কোঁচকাল, তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রানা বলল, 'ওহে, রেড মাঙ্কি, তোমার রিসার্চে ভুল আছে। আমরা টাকার বিনিময়ে কাজ করি না।'

ক্লিফোর্ড হাসল। 'এটা তোমার একদম বাজে কথা। আসলে দাম বাড়াচ্ছ। ঠিক আছে, দু'লাখ ডলারই দেব...'

ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে মামুন। ছয়জন ম্যাটাবেল একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে পজিশন নিয়েছে, সেটার একশো মিটারের মধ্যে চলে এসেছে সে। ক্লিফোর্ড আর রানার কথাবার্তা অস্পষ্টভাবে তার কানে আসছে। হঠাৎ চোখের কোণে কি যেন নড়ে উঠল, ভাল করে তাকাতে আরও একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল সে, বাম দিক থেকে এগিয়ে আসছে। আলোর বলয়ে থাকা রানা বা নড়বেল তাকে দেখতে পাবে না। মূর্তিটা স্থির হয়ে গেল। হাঁটু গাড়ল মাটিতে, তারপর রাইফেল তুলল

চোখের সামনে।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল মামুন। চিৎকার করে বলল, 'মাসুদ ভাই! নিচু হন!' পরমুহূর্তে তার হাতে গর্জে উঠল একে/ফরটিসেভেন, স্নাইপারকে গুলি করছে।

শুরু হবার পর মনে হলো বন্দুকযুদ্ধটা যেন অনন্তকাল ধরে চলছে, আসলে মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হলো। মামুনের গলা শুনে মেঝেতে বসে পড়ল রানা। ওর বসা সম্পূর্ণ হয়নি, নড্‌বেলের রাইফেল গর্জে উঠল। নাইলন কর্ডের লূপ ঝাঁকি খেলো, পিছিয়ে আনল এরইমধ্যে মৃত বিলফোর্ডকে। নড্‌বেল তার বুক এক হাতে জড়িয়ে রেখেছে। ইতিমধ্যে রাইফেলটাও মুক্ত করে নিয়েছে। লাশটা এখনও ঝাঁকি খাচ্ছে, ওটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে সে।

একটা মাত্র গুলি করার সুযোগ পেল ক্লিফোর্ড, রানার বাম নিতম্বে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেল সেটা। দ্রুত পরপর তিনবার গর্জে উঠল রানার রাইফেল, বুলেটগুলো দরজা পার করে হলের ভেতর ছুঁড়ে দিল ক্লিফোর্ডকে। কয়েকটা গড়ান নিয়ে ডান দিকে সরে যাচ্ছে রানা, তারপর শরীরটা মুচড়ে আবার টান দিল ট্রিগারে।

বিলফোর্ডের লাশ সামনে নিয়ে গুটি মেরে বসে আছে নড্‌বেল, এক হাতে রাইফেল চালাচ্ছে। বিলফোর্ডের লাশকে পাশ কাটাল একটা গুলি, গুঙিয়ে উঠল সে, তার ডান উরুতে ঢুকেছে। সামনের অন্ধকার থেকে মামুনের একে/ফরটিসেভেন গর্জে ওঠার আওয়াজ পাচ্ছে রানা, আলোর আভায় ম্যাটাবেলদের শরীরগুলোকে পাক খেতে দেখছে।

তারপর সতর্ক, টান টান নিস্তব্ধতা নেমে এল।

সবার আগে রানার গলা শোনা গেল, 'নড্‌বেল?'

নড্‌বেল বেসুরো গলায় জবাব দিল, 'পায়ে গুলি খেয়েছি।'

আলোর দিকে পিছন ফিরল রানা। 'মামুন?'

অন্ধকার থেকে জবাব এল, 'লেগেছে।'

এখনও ধুলোয় শুয়ে আছে রানা, হাতের রাইফেল একজন ম্যাটাবেলের দিকে তাক করা। লোকটা চিৎ হয়ে শুয়ে, কাঁধ খামচে ধরে গোঙাচ্ছে। 'নড়বে না, মামুন,' বলল ও, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে নড্‌বেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি অচল?'

'না, দোস্ত।'

'বাড়িটা সার্চ করো,' নির্দেশ দিল রানা।

বিলোফোর্ডের লাশ মাটিতে ফেলে সিধে হলো নড্‌বেল, তারপর দরজার দিকে এগোল। তার পিছু নিল রানা।

হলের মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে ক্লিফোর্ড, পেটটা দু'হাতে চেপে ধরা, চেহারায় শুধু ব্যথা নয়, বিহ্বল একটা ভাবও ফুটে আছে। পা দিয়ে রাইফেলটা তার নাগালের বাইরে সরিয়ে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করল রানা। নগ্ন শরীরটায় এক লাইনে সেলাইয়ের ফোঁড়ের মত তিনটে গর্ত তৈরি করেছে বুলেটগুলো। নাড়িভুঁড়ি

সব বেরিয়ে আসতে চাইছে, ছড়ানো আঙুল দিয়ে চেপে ধরে কোন রকমে আটকে রেখেছে ক্লিফোর্ড। দু'এক মিনিটের মধ্যে মারা যাবে সে।

রানার চোখে চোখ রেখে বলল, 'জলদি! জলদি! প্লীজ! হাসপাতালে নিয়ে চলো আমাকে। ছয় মাইল দূরে, বিদায়...তাড়াতাড়ি!'

মাথা নাড়ল রানা। 'আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও।'

দ্রুত এক কামরা থেকে আরেক কমরায় ঢুকছে নড়বেল, হাতে বাগিয়ে ধরা রাইফেল। ঊরুতে গুলি লাগায় হাঁটাচলায় তার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। চামড়ার নিচে ওটার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছে সে। কুশন হিসেবে ভালই ছিল বিলফোর্ড। বাড়ির ভেতর কাউকে পেল না সে, তবে বেডরুমে কমবিনেশন লক সহ প্রকাণ্ড একটা ওয়াল-সেফ দেখল। পা চালিয়ে হলে ফিরে এল আবার।

ক্লিফোর্ডের ওপর ঝুঁকে রয়েছে রানা।

'বাড়ি খালি,' বলল নড়বেল। 'বেডরুমে একটা ওয়াল-সেফ আছে। কমবিনেশন লক।'

'কমবিনেশন,' ক্লিফোর্ডকে বলল রানা। 'তারপর হাসাপাতালে পাঠাব।'

প্রায় চিৎকার করে সংখ্যাগুলো উচ্চারণ করল ক্লিফোর্ড, শুনে আবার ঘুরল নড়বেল, হল ধরে ছুটল। বেডরুমে ঢুকে নম্বরগুলো ডায়াল করল, বড়সড় হাতলটা ধরে টান দিল নিচের দিকে। ভারী দরজাটা খুলে গেল। ভেতরের শেলফে কয়েকটা মাত্র ফাইল, বাকি জায়গা দখল করে রেখেছে বান্ডিল করা একশো ডলারের নোট। গুনে শেষ করা সম্ভব নয়, নড়বেল আন্দাজ করল বান্ডিলের সংখ্যা এক হাজারের কম হবে না। প্রতিটি বান্ডিলে সম্ভবত একশোটা করে নোট আছে। একটা দেরাজে একজোড়া পিস্তলও দেখল সে।

আবার ছুটে হলে ফিরে এল নড়বেল। এবার তার ঊরু ব্যথা করতে শুরু করেছে। 'ভুল নম্বর দেয়নি। সেফ খুলে ফেলেছি।'

সিধে হলো রানা, এখনও তাকিয়ে আছে ক্লিফোর্ডের দিকে।

'ওকে তুমি হাসপাতালে পাঠাবে?' জিজ্ঞেস করল নড়বেল।

মাথা নাড়ল রানা। 'শুধু শুধু পেট্রলের অপচয়।'

কিছু বলতে গিয়ে হাঁ করল ক্লিফোর্ড, কিন্তু কথা নয়, শুধু বাতাস বেরুল। ঝাঁকি খেয়ে কাত হয়ে গেল শরীরটা, হাত দুটো খসে পড়ল পেট থেকে, মেরুন রঙের মোজাইক করা মেঝেতে হড়হড় করে বেরিয়ে এল সমস্ত নাড়িভুঁড়ি। আরেকটা ঝাঁকি খেয়ে মারা গেল সে।

'অপরাধ স্বীকার করেছে,' বলল রানা। 'সেফের ফাইলে কিছু নোট আর চিঠিপত্র আছে, প্রমাণ হিসেবে কোর্টে দাখিল করা যাবে। তুমি তাড়াতাড়ি পুলিসকে ফোন করো, আমি মামুনকে দেখতে যাচ্ছি।'

ছোট একটা ঢিবি পার হয়ে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে ছুটছে রানা। হঠাৎ মামুনের কাতর গলা শুনতে পেল। তারপর দেখল উপুড় হয়ে হয়ে শুয়ে আছে সে। পাশে হাঁটু গেড়ে জানতে চাইল, 'কোথায়, মামুন?'

ব্যথায় হাঁসফাঁস করছে মামুন, তবে গলায় জোর আছে, বলল, 'একটা কাঁধে

লাগে, ফলে শরীরটা ঘুরে যায়, তারপর পিছনে লাগে...নিচের দিকে।'

'ব্যথা করছে?'

'শুধু কাঁধে।'

'নড়বে না। একদম নড়বে না।' যতটা সম্ভব সাবধানে, মামুনের রক্তভেজা শার্টটা ওপরে তুলল রানা। শিরদাঁড়ার একেবারে নিচে ক্ষতটা কোন রকমে দেখা গেল আলোর অস্পষ্ট আভায়। ওর বুক ধক করে উঠল, মাথার ভেতর শব্দহীন ঝর্ণার মত লাফিয়ে উঠল এক ঝাঁক অভিশাপ। তবে কথা বলছে একদম শান্ত গলায়, 'নোড়ো না, মামুন। এক চুল নোড়ো না। এখুনি তোমাকে নিয়ে যাব আমরা।'

মাটিতে মুখ দিয়ে পড়ে আছে মামুন। শুধু বলল, 'মাসুদ ভাই, নিচের দিকে আমি কোন সাড়া পাচ্ছি না।'

আট

হোটেল শেরাটনের বাগানে বসে জলপ্রপাত দেখছেন মিসেস ভ্যান্স। বিশাল জাম্বেজী নদী তাঁর বিশ মিটার সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। নদীর রোমাঞ্চকর পতন, কান ফাটানো আওয়াজ, নিচে থেকে বিস্ফোরিত হয়ে উঠে আসা জলকণার মেঘ তাঁকে মুগ্ধ করলেও, মনটা ভাল না থাকায় এ-সব তিনি পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছেন না। একাই বসে আছেন, তবে দেখতে না পেলেও জানেন রানা এজেন্সির এজেন্টরা আশপাশেই আছে, নজর রাখছে তাঁর ওপর।

মনটা পড়ে আছে দূরে, রহস্যময় ও বিপজ্জনক জঙ্গলে। তাঁর ধারণা, দু'একদিনের মধ্যে ফিরে এসে রানা আর নড্‌বেল রিপোর্ট করবে, কিছুই পাওয়া যায়নি। সেজন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে আছেন তিনি। কন্যা হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সাধ্যমত সব কিছুই তো করে দেখলেন। মাসুদ রানার যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর মনে কোন সন্দেহ নেই। ও যদি খুনীকে ধরতে না পারে, মনে করতে হবে এ-কাজ আর কারও দ্বারাও সম্ভব নয়। কাজেই এরপর আর কোন চেষ্টা না করাই ভাল। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর শুনে সংবিৎ ফিরল তাঁর।

'মিসেস ভ্যান্স।'

ওয়েটার ভেবে ঘাড় ফেরালেন মিসেস ভ্যান্স। ওয়েটার নয়, নাজমুল। সঙ্গে পুলিস ইন্সপেক্টর টিকোলোও রয়েছে। 'হ্যাঁ, বলো। কি খবর?'

'মিসেস ভ্যান্স,' বলল নাজমুল, 'আমাদের ডিরেক্টর মি. মাসুদ এই মাত্র ফোন করেছিলেন। খবরটা আপনাকে জানাতে বলেছেন তিনি। আপনার মেয়ে ও মি. সাইফুরের খুনী জন বিলফোর্ড হেগেল আজ ভোরে গুলি খেয়ে মারা গেছে। তার সঙ্গে আরও চারজন।'

অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না মিসেস ভ্যান্স, বোবা দৃষ্টিতে

নাজমুলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরাই যে দায়ী ছিল, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ। আমাদের হাতে নিশ্ছিদ্র প্রমাণ আছে।'

'ওরা কি রানার হাতে মারা গেছে?'

'হ্যাঁ। তবে মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে লোটন নড়বেল আর মামুন হোসেন ছিলেন। লেকের কাছাকাছি একটা বন্দুকযুদ্ধ হয়।'

'কিন্তু আমি তো জানতাম মামুন হারারেতে আছে।'

'হ্যাঁ। আমরাও তাই জানতাম। তবে খবর পেয়েছি কাল সে হারারে থেকে রওনা হয়।'

'খুনীরা কি কালো?'

'না। সাদা। বাপ আর ছেলে।' নাজমুল হাতঘড়ি দেখল। 'বিস্তারিত সব আমি আপনাকে প্লেনে ওঠার পর জানাব।'

মিসেস ভ্যান্স যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছেন। বার কয়েক চোখ মিটমিট করে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্লেনে উঠব?'

'হ্যাঁ। আপনার প্লেনে, মিসেস ভ্যান্স। আমরা বুলাওয়েওতে যাচ্ছি। এইমাত্র আপনার নার্সের সঙ্গে কথা বলে হোটেল থেকে বেরুলাম, তাকে আমি আপনার সুটকেস গুছাতে বলে এসেছি। ম্যানেজারকে অনুরোধ করেছি, তিনি যেন ক্রুদের তৈরি হতে বলেন।'

'কিন্তু বুলাওয়েওতে কেন যাচ্ছি আমরা?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্য দিকে তাকাল নাজমুল। প্রশ্নের জবাব দিল ইন্সপেক্টর টিকোলো, 'মিসেস ভ্যান্স, রানা এজেন্সির আফ্রিকান চীফ মি. মামুন বন্দুকযুদ্ধে আহত হয়েছেন। তাঁর আঘাত খুব গুরুতর।'

'ওহ্ গড! বেঁচে যাবে তো?'

টিকোলো বলল, 'বলতে পারছি না। খবরটা যখন আসে আমি তখন বিঙ্গায় ছিলাম। বিঙ্গার হসপিটালে তাকে আমরা ভর্তি করি, কিন্তু সেটা একেবারেই ছোট, আধুনিক সুযোগ-সুবিধের অভাব। দু'ঘণ্টা আগে বিঙ্গা থেকে রওনা হই আমি, তখন তার অবস্থা অপরিবর্তিত দেখে এসেছি। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তাকে বুলাওয়েওতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওখানকার হসপিটালটা আধুনিক। তাঁর সঙ্গে মি. রানা আর মি. নড়বেল আছেন। আমাদের ডেপুটি কমিশনার জন বুকানিও হারারে থেকে বুলাওয়েওতে আসছেন। পুলিস খুনীদের তিনজন সহযোগীকে বুলাওয়েওর জেল-হাজতে পাঠিয়েছে।'

হুইলচেয়ার ঘোরালেন মিসেস ভ্যান্স। 'চলো, চলো–এখানে আর সময় নষ্ট করার কোন মানেই হয় না।'

সন্ধ্যার অনেক পর কেবিনে ঢুকল রানা। বিছানার পাশে বসে ছিল নার্স। সে একজন নানও বটে। মেয়েটা কালো। রানাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রানা বলল, 'আপনি কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করবেন, প্লীজ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল নার্স, বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। বিছানার কিনারায় বসল রানা, মামুনের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। 'কেমন আছ, মামুন?'

মামুন জবাব দিল না। রানার মুখে চোখ তুলে বলল, 'আমাকে জানান, মাসুদ ভাই।'

'ভাল নয়।'

'জানান, প্লীজ!'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল রানা। তারপর বলল, 'তোমার কাঁধের ক্ষতটা কোন সমস্যা নয়। ওটা শুকিয়ে গেলে হাতটা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারবে। আগের মতই।'

'দ্বিতীয়টা?'

'খারাপ। বুলেট তোমার স্পাইনাল কর্ড ছিঁড়ে ফেলেছে। কোমর থেকে নিচের অংশ প্যারালাইজ্‌ড হয়ে যাবে।'

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা। তারপর মামুন বলল, 'আমিও তাই আন্দাজ করেছি। এ-ও জানি যে এর কোন চিকিৎসা নেই। এখন নেই, ভবিষ্যতেও হবে না।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'এখানকার ডাক্তারকে দিয়ে লন্ডনের কয়েকজন স্পেশালিস্টকে ফোন করিয়েছি। তাঁরাও একই কথা বলেছেন। ড্যামেজটা মেরামত যোগ্য নয়। জিম্বাবুইয়ে আঠারো বছর ধরে যুদ্ধ হয়েছে, গুলি খাওয়া লোকজনের চিকিৎসা করে এখানকার ডাক্তাররা প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিছু করার থাকলে করতেন, বা অন্য কোথাও পাঠাতে বলতেন।'

'বুঝতে পারছি।'

'তোমাকে শক্ত হতে হবে, মামুন। এখানে আমরা আরও হপ্তা দুয়েক থাকব। তারপর তোমাকে নিয়ে চলে যাব আমেরিকার লাস ভেগাসে। দেশে নয়, ওখানেই নতুন জীবন শুরু করবে তুমি। দেশেও যাবে, তবে মাঝে মধ্যে। তোমার আম্মাকে লাস ভেগাসে আনাবার সব ব্যবস্থা আমরাই করব।' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'কাজটা তোমার জন্যে সহজ হবে না, জানি। তবে তুমি খুব শক্ত ছেলে, কাজেই বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে দিতে পারবে।' মামুনের হাতটায় সামান্য চাপ দিল ও।

প্রায় রুদ্ধস্বরে মামুন বলল, 'মানিয়ে নেয়ার কথা আমি ভাবতে পারছি না, মাসুদ ভাই। এভাবে জীবন কাটাবার কথা কল্পনাও করতে পারি না। যতবার মিসেস ভ্যান্সকে দেখেছি, ততবার নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি, একটা মানুষ এভাবে বেঁচে থাকে কি করে। উনি তো তবু দীর্ঘ বহু বছর সুস্থ জীবন কাটাবার পর পঙ্গু হন। কিন্তু আমার বয়েস এখনও ত্রিশ পেরোয়নি, আরও চল্লিশ বা পঞ্চাশটা বছর একটা হুইলচেয়ারে বসে কিভাবে সময় কাটাব? আর মেজাজ? সেটার কি হবে? আমার সংস্পর্শে যারাই আসবে, তাদের জীবন নরক করে তুলব আমি। দিনে দিনে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাবে। এ স্রেফ সম্ভব নয়, মাসুদ ভাই।'

'এখন তাই মনে হচ্ছে বটে,' বলল রানা, 'কিন্তু সময় তোমাকে সাহায্য

করবে। মানুষের মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা অবিশ্বাস্য, মামুন, প্রায় অসীম। তোমার মত অবস্থায় আরও অনেককে পড়তে দেখেছি আমি, অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে তারা, কেউ কেউ শুধু মানিয়ে নেয়নি, রীতিমত সুস্থ-সুন্দর জীবন কাটাচ্ছে। তারাও তোমার মত প্রথমে ফেস করতে ভয় পেয়েছে, কিন্তু ধীরে ধীরে একটু একটু করে সাহস সঞ্চয় করেছে। কাজটা কঠিন, তবে তুমি পারবে। তোমাকে আমি চিনি।'

বালিশে মাথা নাড়ছে মামুন। 'মাসুদ ভাই, ওই জীবনে আমার দরকার নেই। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেটা বদলাতে পারব না। আপনি জানেন, আপনাকে আমি কি করতে বলব?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'মামুন, এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দাও। তুমি আমার রক্ত-সম্পর্কের কেউ নও, তবু আমার আপন ভাই থাকলে তাকে আমি তোমার চেয়ে বেশি ভালবাসতাম বলে মনে হয় না। এর কোন বিকল্প নেই, ভাই–তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। কে জানে? পাঁচ কি দশ কি পনেরো বছর পর হয়তো নতুন কোন সার্জিকাল টেকনিক আবিষ্কার করবে ওরা, ছেঁড়া স্পাইনাল কর্ড হয়তো তখন জোড়া লাগানো কোন সমস্যাই হবে না।'

আবার মাথা নাড়ল মামুন। 'এ আপনি নিজেও বিশ্বাস করেন না, মাসুদ ভাই। স্রেফ কথার কথা বলছেন।'

'না, মামুন। ডাক্তাররা আজকাল অসম্ভবকে সম্ভব করছে। মেডিকেল আর সার্জিকাল টেকনিকও সত্যি খুব দ্রুত উন্নত হচ্ছে। ইরাকের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধে আহত হয়েছিল এমন কয়েকজনকে দেখেছি আমি। তাদের বাঁচার কথা ছিল না, অথচ দিব্যি বেঁচে আছে। ভিয়েৎনাম যুদ্ধে যারা আহত হয়েছিল, তাদেরও অনেকের বাঁচার কথা ছিল না, কিন্তু আজও তারা মরেনি।'

'আপনি আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছেন…আমি চাই আপনি কাজটা করবেন।'

প্রায় এক মিনিট দু'জনের কেউ আর কিছু বলল না, অপলক দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা। 'তোমাকে আমি একটা কথা দিতে পারি। আমরা লাস ভেগাসে চলে যাব। তিন মাস ওখানে থাকবে তুমি। নব্বুই দিন পার হবার পরও যদি তুমি চাও কাজটা আমি করি, বেশ, আমি একটা অ্যাক্সিডেন্টের ব্যবস্থা করব।' প্রিয় কোন ব্যক্তিকে এই প্রথম মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিল রানা। ওর ধারণা, তিন মাস পর বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই প্রবল হয়ে উঠবে মামুনের।

আবার দীর্ঘক্ষণ কেউ কথা বলছে না। তারপর মামুন জানতে চাইল, 'সত্যি? তিন মাস?'

'হ্যাঁ।'

'গুনে গুনে নব্বুই দিন, একদিনও বেশি নয়?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি প্রতিজ্ঞা করছেন?'

'হ্যাঁ।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল মামুন, চাপ দিল রানার হাতে। 'ঠিক আছে, তাহলে সেই কথাই রইল।'

ট্রাইবাল প্রিন্সেস-এ রাত আটটায় ফিরল রানা। হোটেলটা পাহাড়ের ঢালে, হসপিটাল থেকে খুব একটা দূরে নয়। রিসেপশনিস্ট ওর কামরার চাবি আর তিনটে মেসেজ দিল ওকে। একটা মেসেজ মিসেস ভ্যাঙ্গের–তিনি জানিয়েছেন, ডেপুটি পুলিস কমিশনার ইন্সপেক্টর টিকোলোকে নিয়ে তাঁর স্যুইটে অপেক্ষা করছেন। দ্বিতীয়টা ইন্সপেক্টর টিকোলোর, তাতেও ওই একই কথা বলা হয়েছে। শেষটা নড্‌বেলের–রানার অপেক্ষায় বার-এ বসে আছে সে।

বারে এসে রানা দেখল হুইস্কির গ্লাসে একদৃষ্টে তাকিয়ে মূর্তির মত বসে আছে নড্‌বেল। পাশের টুলটায় বসে ইঙ্গিতে বারটেন্ডারকে বিরক্ত করতে নিষেধ করল ও। 'কেমন দেখলে?' গ্লাস থেকে চোখ না তুলেই জানতে চাইল নড্‌বেল।

'খারাপ, খুব খারাপ। আমার হাতে মরতে চায়।'

'ওহ্ গড!'

'ওকে আমি তিন মাস লাস ভেগাসে থাকার কথা বলেছি। তারপরও যদি সিদ্ধান্ত না পাল্টায়, কথা দিয়েছি কাজটা করব।'

'সত্যি করবে?'

'তিন মাস পর ওই বলবে, বাঁচতে চায়। এ-সব ক্ষেত্রে কি হয় তুমি জানো।'

'হ্যাঁ। সময় পেলে শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়। ভাগ্য বেচারাকে এতটুকু দয়া করেনি। ডান বা বাম দিকে কয়েক মিলিমিটার দূরে লাগলে দু'হপ্তার মধ্যে হেঁটে-চলে বেড়াত।' রানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল নড্‌বেল। 'আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি তুমি।'

কথা না বলে মাথা নাড়ল রানা।

'মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ।'

'আর কিছু করার ছিল?' মাথার চুলে আঙুল চালাল রানা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নড্‌বেল জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি অবস্থা?'

'এ-সব আমি অনেক দেখেছি।'

'তা বটে। এ-সব দেখে আমরা অভ্যস্ত।'

রানা বলল, 'এখানে বসে না থেকে এবার তোমার ঘুমাতে যাওয়া দরকার।'

মাথা নাড়ল নড্‌বেল। 'জন বুকানি মিসেস ভ্যাঙ্গের স্যুইটে অপেক্ষা করছেন। ওরা তোমাকে এক ঘণ্টার আগে ছাড়বেন না। তুমি নিজের কামরায় ঢোকার পর শুতে যাব আমি।'

'মিসেস ভ্যাঙ্গকে কেমন দেখলে?'

'নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। মামুনের এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে শুনে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন।'

'কেঁদে ফেললেন? মিসেস ভ্যান্স?'

'হ্যাঁ। আমার ধারণা, নিজেকে দায়ী বলে ভাবছেন।'

'কেন?'

'তা জানি না। গোটা ব্যাপারটা তিনিই শুরু করেন, হয়তো সেজন্যে।'

'ওনার তো খুশি হবার কথা। উনি যা চেয়েছিলেন আমরা তাই করেছি। খুনীরা মারা গেছে।'

'যাও, দেখলে বুঝতে পারবে,' বলল নড়বেল। 'উনি মামুনের ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছেন না।'

'তুমিও আমার সঙ্গে এসো,' টুল ছাড়ল রানা।

মিসেস ভ্যান্সের স্যুইটে নক করল রানা, দরজা খুলে দিলেন ডেপুটি কমিশনার জন বুকানি। রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় ওখানে দাঁড়িয়েই ভদ্রলোক বললেন, 'মি. মামুন আহত হয়েছেন শুনে নিজেই চলে এলাম। সত্যি আমি মর্মাহত, মি. রানা। এ আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি, বিলিভ ইট অর নট। মামুন হারারেতে রানা এজেন্সির দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে অপরাধের সংখ্যা শতকরা বিশ ভাগ কমে গেছে। এখানে পৌঁছে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। এখন আপনি বলুন, আমার যদি কিছু করার থাকে...'

'ওকে নিয়ে এখন আর কারুরই কিছু করার নেই, মি. বুকানি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আপনি আমাকে বিঙ্গা সম্পর্কে শেষ কি খবর জানেন বলুন।'

পুলিস ও রানা এজেন্সির তরফ থেকে দুটো আলাদা রিপোর্ট এসেছে ডেপুটি কমিশনারের হাতে। ক্লিফোর্ড হেগেলের বাড়ির মোজাইক করা মেঝের নিচে চোরা কুঠরি পাওয়া গেছে, সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সাত টন গণ্ডারের শিং–ঠিক শিং নয়, শিং গুঁড়ো করা পাউডার। আরও পাওয়া গেছে হাতির দাঁত, তিনশো বাহাত্তর জোড়া। স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যা এত বেশি যে গোণার কাজ এখনও শেষ করা সম্ভব হয়নি। চোরা কুঠরিতেও ডলার পাওয়া গেছে, আনুমানিক তিন কোটির মত।

এতসব ফিরিস্তি শুনতে বিরক্ত বোধ করছে রানা, জন বুকানিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'সময় বা মানসিকতা, কোনটাই নেই, কাজেই থানা আর কোর্টে ছুটোছুটি করতে পারব না। লিগাল প্রসিডিং এমনভাবে সম্পন্ন করুন, সব কাজ যাতে বুলাওয়েওতে বসেই সারতে পারি।'

'কেসটার সঙ্গে আপনাকে জড়ানোই হয়নি, মি. রানা,' বললেন ডেপুটি কমিশনার। 'মি. লোটন নড়বেলকে রানা এজেন্সির এজেন্ট বলা হয়েছে, তাকেই যা একটু সময় দিতে হবে।'

পথ ছেড়ে দিলেন জন বুকানি, পিছনে নড়বেলকে নিয়ে সিটিংরূমে ঢুকল রানা। মিসেস ভ্যান্স তাঁর হুইলচেয়ারে বসে আছেন। ইন্সপেক্টর টিকোলো বসেছে একটা সেটিতে। মিসেস ভ্যান্সের দিকে তাকাল রানা। ভদ্রমহিলার বয়েস যেন হঠাৎ করে দশ বছর বেড়ে গেছে।

রানাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেমন আছে ও?'

'কোমর থেকে নিচের দিকটা সম্পূর্ণ প্যারালাইজড, কাজেই কেমন আছে আমার চেয়ে আপনিই ভাল বলতে পারবেন।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলল?'

'হ্যাঁ।'

'কথাটা তাকে বলেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কি প্রতিক্রিয়া হলো?'

'মামুন শক্ত ছেলে। আমি জানতাম ও কাঁদবে না।'

গলার ঝাঁঝ বা কর্তৃত্বের সুর অনুপস্থিত, মিসেস ভ্যান্স বললেন, 'আমি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমেরিকার সেরা স্পেশালিস্টদের আনাতে পারি এখানে। আমাদের প্রেসিডেন্ট যে চিকিৎসা পেতে পারেন, মামুনের জন্যে আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি।'

রানা মাথা নাড়ল। 'মিসেস ভ্যান্স, জাদুর লাঠি ঘোরাবার দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এ-সব কেসে এখানকার ডাক্তাররা অত্যন্ত অভিজ্ঞ।'

মাথা তুলে অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকলেন মিসেস ভ্যান্স, তারপর অনেকটা বোকার মত জানতে চাইলেন, 'এখন তাহলে আমার করণীয় কি?'

'কিছু করতে চেয়েছেন, সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, মিসেস ভ্যান্স,' বলল রানা। 'তবে দুঃখিত, আপনার কিছু করার নেই। আপনি দেশে ফিরে যান।'

'কিছু করার নেই? দেশে ফিরে যাব?' হতভম্ব দেখাল মিসেস ভ্যান্সকে। 'তা কি করে হয়! ছেলেটা আমার কাজ করতে গিয়ে চিরকালের জন্যে পঙ্গু হয়ে গেল, আর তুমি বলছ আমার কিছু করার নেই?'

'আপনিই তাহলে বলুন কি করার থাকতে পারে।'

'কেন, মামুনকে আমি আমার ব্যবসার একজন ডিরেক্টর বানাতে পারি না?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ভ্যান্স। 'আমেরিকায় ওকে আমি একটা বিশাল বাড়ি কিনে দিতে পারি না? ও যদি নিজে একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্ম খুলতে চায়, আমি ওকে পুঁজি দিতে পারি না? আমি চাইলেই নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে...'

তাঁকে বাধা দিয়ে রানা বলল, 'এ-সব সাহায্য মামুন নেবে কিনা সেটা ভেবে দেখেছেন? কিংবা নেয়ার দরকার হবে কিনা?'

'তুমি বলতে চাইছ দরকারই হবে না?'

'রানা এজেন্সি থেকে যথেষ্ট টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাবে সে,' বলল রানা। 'তাছাড়া, বীমার টাকা তো আছেই। ব্যক্তিগত সঞ্চয়ও তো ওর কম নয়।'

'তাহলে...ঠিক আছে, আমি নিজে মামুনের সঙ্গে কথা বলব।'

'কেন?'

'এতটা নিষ্ঠুর হয়ো না, রানা। একটু আগেই তুমি বলেছ, ওর অবস্থা আর সবার চেয়ে আমিই ভাল বুঝব। কথাটা সত্যি। আমার কথা ও হয়তো শুনবে। আমি হয়তো সত্যি ওকে সাহায্য করতে পারব।'

অস্বস্তিবোধ করছে রানা। তবে উপলব্ধি করল, দেখা করতে না দিলে মিসেস ভ্যান্সের ওপর অবিচার করা হবে। তাঁর শোক আর সহানুভূতির মধ্যে কোন খাদ নেই। 'ঠিক আছে, কাল সকালে আপনি তার সঙ্গে দেখা করবেন। তবে কান্নাকাটি বা কোন সিন ক্রিয়েট করবেন না, প্লীজ।'

শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল, হুইলচেয়ারের হাতল দুটো দু'হাতে চেপে ধরলেন মিসেস ভ্যান্স। 'এ-সব আমাকে শেখাতে হবে না।'

ঘুম ভাঙার পর মামুন দেখল জানালা দিয়ে রোদ ঢুকেছে কেবিনে। ঘুমের ট্যাবলেট কোন কাজে আসেনি, প্রায় সারারাতই জেগে ছিল সে। ভোরের দিকে যা-ও বা ঘুমিয়েছে, দু'তিন ঘণ্টা পর সেটাও ভেঙে গেল। মাথা ঘুরিয়ে তাকাতে নার্সকে দেখতে পেল। এ-ও একজন নান, তবে শ্বেতাঙ্গিনী। টুলে বসে একটা বই পড়ছে।

'কি পড়ছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল মামুন।

ঝাঁকি খেয়ে মুখ তুলল নার্স। মেয়েটা পরীর মত সুন্দর, মাথার কালো লম্বা চুল সাদা ফিতে দিয়ে বাঁধা। 'এখন আপনার কেমন লাগছে?'

'খারাপ না। কি পড়ছেন আপনি?'

একটু যেন লজ্জা পেল নার্স। 'রোমান্টিক উপন্যাস। নানদের পড়া নিষেধ কিনা জানি না, তবে পড়তে ভালই লাগে।' বইটা নামিয়ে রাখল সে। এগিয়ে এসে মামুনের পালস দেখল, টেমপারেচার মাপল, একটা ক্লিপবোর্ডে লিখে রাখল সব। 'ডাক্তার আসবেন এক ঘণ্টা পর,' হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে বলল। টেলিফোনের রিসিভার তুলে চীফ মেট্রনকে জানাল মামুনের অবস্থা আগের মতই, কোন পরিবর্তন নেই।

'বই পড়তে আমিও ভালবাসি,' বলল মামুন। 'আপনাদের এখানে বেশ ক'টা দিন থাকতে হবে আমাকে...হাসপাতালে কি কোন লাইব্রেরী আছে?'

'হ্যাঁ, বেশ বড় একটা লাইব্রেরী আছে। সকালে আর সন্ধ্যায় প্রতি ওয়ার্ডেই বই পাঠানো হয়।'

'সকালে কোন্ সময়?'

'দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে।'

'এখন ক'টা বাজে?'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নার্স বলল, 'সাড়ে সাতটা।'

বালিশে মাথা ঘুরিয়ে বেডসাইড টেবিলটার দিকে তাকাল মামুন। ওটায় একটা জাগ আর গ্লাস রয়েছে। 'আমাকে একটু পানি খাওয়াবেন?'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে খানিকটা পানি ঢালল নার্স, নরম হাত রাখল মামুনের ঘাড়ের পিছনে, গ্লাসটা ধরল তার ঠোঁটের ওপর। কাঁধে যেন কেউ ছুরি চালাল, তবে মামুন কোন শব্দ করল না। এক ঢোক পানি খেয়ে বালিশে মাথা নামাল, বন্ধ করল চোখের পাতা। টুলে ফিরে এসে বসল নার্স, বইটা হাতে নিল আবার।

খানিক পর চোখ খুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মামুন। ছয় তলায় রয়েছে সে, আকাশ ছাড়া বিছানা থেকে দেখার কিছু নেই। পাঁচ মিনিট পার হলো। ঘাড় ফিরিয়ে নার্সের দিকে তাকাল সে। 'আপনার নাম কি, সিস্টার?'

নার্স হাসল। গোল মুখ, কমনীয় চেহারা; চোখ দুটো সরল, চেহারায় পবিত্র ভাব। 'সিন্থিয়া।'

মামুনও হাসল। 'খুব সুন্দর নাম। সিন্থিয়া, আপনি আমার একটা উপকার করবেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। বলুন কি করতে হবে।'

অক্ষত হাতটা তুলে বইটা দেখাল মামুন। 'আমার আর ঘুম আসবে না, মনটাকে শান্ত রাখার জন্যে একটা কিছু পেলে ভাল হত। আপনি কি লাইব্রেরীতে গিয়ে আমার জন্যে একটা বই আনতে পারেন? একটা বা দুটো?'

চিন্তা করছে নার্স। একবার হাতঘড়ি দেখল। 'না পারার কি আছে। করিডরের শেষ মাথাতেই লাইব্রেরী। কি ধরনের বই পছন্দ করেন আপনি?'

'দুটো নয়, চার-পাঁচটা নিয়ে আসবেন। ওয়েস্টার্ন আর ডিটেকটিভ গল্প পছন্দ করি আমি, কিংবা ভাল থ্রিলার।'

হাতের বইটা রেখে দিয়ে দাঁড়াল সিন্থিয়া। 'আপনাকে একা রেখে কোথাও যাওয়া আমার উচিত নয়, তবে ফিরে আসতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না।' মামুনের মাথার পিছনে একটা কর্ড ঝুলছে, কর্ডের শেষ মাথায় একটা বোতাম, ইঙ্গিতে সেটা দেখাল সে। 'শরীর খারাপ লাগলে ওই বোতামটায় চাপ দেবেন।'

'চিন্তা করবেন না, সিস্টার সিন্থিয়া। আমি ভাল আছি। হাতে ভাল একটা বই পেলে আজেবাজে চিন্তা থেকে মনটাকে সরিয়ে আনতে পারব।'

করিডরে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা ঠেলে দিল নার্স। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজল মামুন। এক চুল নড়ল না, ঝাড়া দু'মিনিট নিঃসাড় পড়ে থাকল। তারপর চোখ মেলল সে, ডান হাত দিয়ে গা থেকে চাদরটা সরাল। মাথা সামান্য উঁচু করে অকেজো পায়ের পাতার দিকে তাকাল একবার। তার পরনে এক প্রস্থ সাদা কাপড় জড়ানো, পিছন দিকে আলগা করে বাঁধা। কাপড়টা খানিক টেনে পা দুটো উন্মুক্ত করল সে। ওগুলোর পাশে এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে। কাগজটা তুলে টেবিলের ওপর রাখল, জাগের পাশে গ্লাস চাপা দিয়ে। তারপর বিছানা থেকে গড়িয়ে ঝুপ করে পড়ল মেঝেতে।

মেঝেতে নামার পর দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড গোঙাল মামুন। তারপর আরেকটা গড়ান দিয়ে উপুড় হলো। অক্ষত কাঁধটা মেঝেতে রেখে ক্রল করছে, প্রতিবার এক ইঞ্চির বেশি এগোতে পারছে না। বাম কাঁধে যেন আগুন ধরে গেছে, তীব্র ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে সে। মনে হলো অনন্তকাল ধরে ঘটছে ব্যাপারটা, তবে এক সময় পৌঁছে গেল গন্তব্যে। ডান হাত তুলে জানালার কিনারা ধরল। নিয়মিত ব্যায়াম করায় হাতের পেশীতে যথেষ্ট শক্তি আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শরীরটাকে উঁচু করার জন্যে ডান কনুইয়ের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করতে হলো। জানালার কিনারা

পর্যন্ত তুলতে পারল বুক. অসাড় পা দুটো খানিকটা ঝুলছে. খানিকটা মেঝেতে পড়ে আছে। মামুন ভয় পেল, ব্যথায় না জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আরও একটু মাথা তোলার পর বাইরে তাকাল সে। ওর সামনে সযত্নে সাজানো একটা পার্ক—সারি সারি গাছ, খোলা লন, কেয়ারি-করা ফুলবাগান। জানালার চৌকাঠে আরও খানিক তুলে আনল শরীরটা, তারপর নিচে তাকাল। হাসপাতালের প্রাইভেট কেবিনগুলো সবই টপ ফ্লোরে, ছয়তলায়। তার সরাসরি নিচে কংক্রিটের চওড়া রাস্তা। নিচে তাকিয়ে আছে, মহাকাল থেকে আরও একটা মিনিট বেরিয়ে গেল। মাতৃভাষায় বিড়বিড় করল মামুন, পাশে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলেও শুনতে পেত না কি বলল। তারপর কাঁধের ব্যথাটাকে দাঁতে দাঁত চেপে অগ্রাহ্য করে, জানালার কিনারা থেকে খসে পড়ল নিচে।

করিডরে হুইলচেয়ার ঠেলছে সিলভিয়া, চোখ বুলাচ্ছে কেবিন নম্বরে। তবে মিসেস ভ্যান্সই প্রথম দেখতে পেয়ে হাত তুললেন। 'ওই তো, তিন নম্বর।'

দরজায় নক করল সিলভিয়া। কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

মিসেস ভ্যান্স বললেন, 'চীফ মেট্রন বলেছেন ও জেগে আছে। চলো ভেতরে ঢুকি।'

হাতল ঘুরিয়ে কবাট ফাঁক করল সিলভিয়া, তারপর হুইলচেয়ারের পিছনে ফিরে এল. মিসেস ভ্যান্সকে নিয়ে ঢুকে পড়ল কেবিনে। বিছানা খালি।

জানালা দিয়ে লোকজনের চিৎকার ভেসে আসছে। হুইলচেয়ার ছেড়ে সেদিকে ছুটল সিলভিয়া। নিচে তাকিয়ে সাদা কাপড়ে জড়ানো আকৃতিটা দেখল, লোকজন সেটার ওপর ঝুঁকে আছে, একসঙ্গে চিৎকার করছে সবাই। 'ওহ্ গড! ওহ্ গড!' মুখে একটা হাত, ঘুরে মিসেস ভ্যান্সের দিকে তাকাল সে।

মিসেস ভ্যান্সের হুইলচেয়ার বিছানার পাশে। হাতে একটা কাগজ, পড়ছেন তিনি। আঙুল থেকে কাগজটা খসে পড়ল। তারপর হাত দুটো তুলে মুখ ঢাকলেন।

জানালার কাছ থেকে হেঁটে এল সিলভিয়া, ঝুঁকে মেঝে থেকে কাগজটা তুলল। কানে কান্নার শব্দ, চিরকুটটা পড়ছে।

'মি. জন বুকানি ও মাসুদ ভাইকে,

নানকে দায়ী করবেন না। জানি তাকে আমার কৌশলে সরিয়ে দিতে হবে। মাসুদ ভাই, আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু জীবনে সম্ভবত এই একটা কথাই আপনি রাখতে পারবেন না। যে নতুন জীবন দান করে, সে কখনও মরার অনুমতি দেয় না—কি করে ভুলি আপনিই আমাকে বাঁচতে শিখিয়েছিলেন। সমস্যা হলো, তিন মাস পর আমি আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাব না। পরিচয় হবার পর থেকে হুইলচেয়ারে বসা ভদ্রমহিলাকে লক্ষ করছি আমি—নিজের যন্ত্রণা একা ভোগ করতে রাজি নন, সবাইকে অতিষ্ঠ করে রেখেছেন। খুব অল্পদিন বাঁচলাম, তবে আপনার কল্যাণে সেগুলো খুব উপভোগ্য আর রোমাঞ্চকর ছিল। মাসুদ ভাই, দুঃখ

কেবল একটাই. আপনার ঋণ শোধ করা হলো না। আম্মাকে বলবেন. আমার অপরাধ যেন তিনি ক্ষমা করেন। আরেকটা কথা. আমাকে যেন দেশে কবর দেয়া হয়। মামুন।'

খাকি ট্রাউজার আর ছাই রঙের শার্ট পরেছে। সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই। ল্যান্ড-রোভার থেকে নেমে দু'ঘণ্টা হাঁটল। মাতোপোস-এর দক্ষিণ প্রান্তের দিকে যাচ্ছে, বুলাওয়েওর দক্ষিণে ছোট্ট একটা অভয়ারণ্য। সাধারণত উত্তর দিকেই ভিড় করে ট্যুরিস্টরা, সেখান থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। এদিকে কোন রাস্তা বা মানুষের তৈরি ট্রেইল নেই। স্রেফ আদিম আফ্রিকার প্রকৃতি, সভ্যতার হাত এখনও কলঙ্কিত করেনি, কোন হুমকি ছাড়াই স্বাধীনভাবে বসবাস করছে বন্য প্রাণীকুল।

কুডু, ইম্পালা আর জেব্রার পালকে পাশ কাটিয়ে এল। দূরে কয়েকটা বাফেলো দেখল, ওগুলোকে এড়াবার জন্যে ঘুরপথে এগোতে হলো। বন্য কুকুর, শুয়োর আর হায়েনাও আছে—একটার দিকেও সরাসরি তাকাল না বা কাছাকাছি হলো না। এমন ভঙ্গিতে হাঁটছে. যেন চাবি দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ-পথে আগেও এসেছে, তবে অনেক বছর আগে।

বনভূমি হালকা হয়ে এল। শুরু হলো ঢেউ খেলানো পাহাড়, ঢাল ও চূড়াগুলো প্রকাণ্ড সব বোল্ডারে ঢাকা। কোন কোন বোল্ডার আকারে বাড়ির সমান। কোথাও দেখা গেল কিভাবে যেন একটার ওপর আরেকটা চড়ে বসেছে; কিন্তু পড়ে না যাবার দৃশ্যত কোন কারণ নেই, অথচ পড়ছে না। বাম দিকে গেল না, ওদিকে শ্বেতাঙ্গদের কবরস্থান আছে—কালোদের স্বাধীনতা দিতে রাজি হয়নি তারা।

সূর্য ডোবার ঠিক আগে ছোট একটা লেকের সামনে পৌঁছল। একা আসার পথে কয়েকবারই থামতে হয়েছে, কান পেতে অপেক্ষা করেছে কোন শব্দ হয় কিনা শোনার জন্যে। দৃঢ় একটা বিশ্বাস জন্মেছে মনে, সে ছাড়া কয়েক মাইলের মধ্যে অন্য কোন মানুষ নেই। প্রকৃতির নিজের তৈরি শব্দে বৈচিত্র্য, ছন্দ, চমক আর সুর আছে, তা কেবল তার দ্বারাই মাঝে-মধ্যে বিঘ্নিত হয়েছে, তবে তা অতি নগণ্য। সে যখন হেঁটে আসছিল, ভাব বা আচরণ দেখে মনে হয়েছে বণ্য প্রাণীরা তাকে যেন নিজেদের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়েছে। লেকের কাছাকাছি সমতল একটা জায়গা বাছল সে, নিঃসঙ্গ এক মোপানি গাছের তলায়। তারপর আধ ঘণ্টা ধরে আশপাশ থেকে শুকনো কাঠ কুড়িয়ে আনল। তার চারপাশ থেকে ঢাল বেয়ে নিচের লেকে নামছে পশুর পাল, রাত নামার আগে শেষবার পানি খাবে—প্রাণচঞ্চল ইম্পালা, সাবধানী কুডু, কোমর ভাঙা তালগাছের মত জিরাফ। মিছিলটায় শৃঙ্খলা আছে। প্রত্যেকেই যেন জানে মিছিলে কে কোথায় থাকবে, হাঁটার গতি কি হবে, কখন এক পাশে সরে গিয়ে পথ ছাড়তে হবে অন্যকে। ঘণ্টাখানেক আগে একদল সিংহকে দেখেছে সে, সদ্য শিকার করা একটা হরিণের মাংস খাচ্ছে। মাতাপোস-এ খুব বেশি সিংহ নেই, যে-ক'টা আছে অন্য প্রাণীরা সেগুলোর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। এরইমধ্যে চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়েছে, বাকি সব প্রাণীরা বুঝে নিয়েছে

আগামী কয়েকটা দিন নিরাপদে থাকবে তারা–কারণ, খিদে না পেলে সিংহ শিকার ধরে না।

সূর্য ডোবার পর আগুন জ্বালল সে। পিছনে, কাছাকাছি, শুকনো কাঠের একটা স্তূপ তৈরি করেছে, আগুনটা যাতে সারারাত জ্বালিয়ে রাখতে পারে। একটা লগ টেনে এনে সেটার ওপর বসল। ট্রাউজারের ব্যাক পকেট থেকে একটা হিপ ফ্লাস্ক বের করল। আরেক ব্যাক পকেট থেকে বের করল শুকনো মাংসের একটা ফালি। পশুরা যখন ফিরে যাচ্ছে, মুখে মাংস পুরে চিবাল, ঠোঁটে হিপ ফ্লাস্ক তুলে মদ খেলো মাঝে-মধ্যে।

গোধূলির নিস্তব্ধতা একটু একটু করে ভাঙছে, সন্ধ্যার বিচিত্র শব্দগুলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আশপাশের গাছে রাতের মত আশ্রয় নিয়েছে পাখিরা, আরাম করে শোয়া-বসার কাজে ব্যস্ত, নিজেদের মধ্যে কিচিরমিচির করছে। অগণিত পোকামাকড়ের ডাক, যৌনমিলনে মত্ত একজোড়া বন্য শূকরের গোঙানি। দূর থেকে ভেসে আসা একটা হায়েনার বিদ্রূপাত্মক, কর্কশ হাসি। আরও দূরে একটা সিংহের কাশি, তা-ও গর্জনের মত শোনাল। খুদে, কালো আকৃতি, আগুনের মাথার ওপর দ্রুত ডানা ঝাপটে উড়ছে–বাদুড়, আলোর আকর্ষণে ছুটে আসা পোকা ধরে খাচ্ছে।

প্রিয়জনকে হারানোর গভীর বেদনা অসুস্থ করে তুলেছে রানাকে। গোটা অস্তিত্ব জুড়ে তীব্র একটা কষ্ট। এই কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে চায় ও। লোকজনের সামনে আবেগ চেপে রেখে নিজের সহ্যক্ষমতা বা মনের জোর দেখানো তেমন কঠিন কাজ নয়। এতটা পথ হেঁটে মাতোপোস-এ এসেছে যাকে ও বোঝে না সেই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। মনে কত প্রশ্ন জাগছে, সেগুলোয় ক্ষোভ আর অভিযোগ এত বেশি যে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সব প্রশ্নই তাঁর কাছে, যিনি তার জীবন নয়, কেড়ে নিলেন মামুনের জীবন। নিঃশেষ প্রায় আলোয় চারদিকে তাকিয়ে ভাবল, ঈশ্বর এত সুন্দর স্বর্গ বানালেন, অথচ তারপরও, প্রায়ই, প্রাপ্য নয় এমন মৃত্যু ও কষ্টভোগ সমর্থন করেন কিভাবে! সারাটা জীবন এই হেঁয়ালি চাক্ষুষ করে আসছে সে।

আজ এখানে, এই মাতোপোস-এ, রানার মনে হলো, এ-সবে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা থাকে না। ভূমিকা রাখে শুধু প্রকৃতি। প্রকৃতির বিধান একটা নিয়মে বাঁধা। প্রাণীকুল সেই নিয়মের বলি মাত্র। কেউ আঙুল তুলে কাউকে দেখিয়ে দিচ্ছে না। চিতা হরিণ শিকার করছে ইন্সটিঙ্কটবশত, পূর্ব-পরিকল্পনা বা আক্রোশ বলে কিছু নেই। ব্যাপারটা তার কাছে শুধুই পেটপূজা।

সিংহরা এল আরও প্রায় দু'ঘণ্টা পর। মোট চারটে, তিনটে মেয়ে, কালো কেশর নিয়ে একটা পুরুষ। পুরুষটাকে চিনতে পারল রানা, আসার পথে তাকে শিকার করা হরিণের মাংস খেতে দেখেছে–তার ভোজন শেষ হবার অপেক্ষায় মেয়েরা একপাশে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।

ওরা এসেছে স্রেফ কৌতূহলবশত। পেট তো ভরাই। ধীর পায়ে এত কাছে চলে এল, যাতে আগুনের আঁচ পায়। ধীর পায়ে এলেও, হাবভাবে ভয়ের লেশমাত্র

নেই। জমিনে পেট ঠেকাল, আগুনের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। রানাও তাকিয়ে থাকল। মাঝখানে মাত্র বিশ মিটার দূরত্ব। আগুনটা কমে আসছে। পিছনে হাত বাড়িয়ে শুকনো ক'টা কাঠ ধরল ও, ধীরে-সুস্থে ফেলল আগুনের ওপর। মেয়েদের একজন চিৎ হলো জমিনে, ভেতর থেকে ফুলে থাকা পেট মেলে ধরল আগুনের দিকে, আঁচ পোহাচ্ছে।

পুরুষটা গুড়ি মেরে বসে আছে, উজ্জ্বল হলুদ চোখে দেখছে রানাকে। পরবর্তী এক ঘণ্টায় বাকি মেয়ে দুটোও আগুনের খানিকটা কাছে সরে এসে কাত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পুরুষটা নড়াচড়া করছে না, বাতাস লাগায় শুধু মাঝে মধ্যে ঢেউ উঠছে কালো কেশরে। রানাও স্থির; তবে কিছুক্ষণ পরপর পিছন থেকে কাঠ নিয়ে আগুনটার ওপর ফেলছে। আরও এক ঘণ্টা পার হলো, ওর মনের গহীনে নিজের সঙ্গে তর্ক আর বোঝাপড়া চলছে। আরও এক ফালি মাংস চিবাতে শুরু করল, মদ খেলো আরও দু'ঢোক। মাঝে-মধ্যে সশব্দে ঢেকুর তুলল সিংহটা। অবশেষে, শান্ত ভঙ্গিতে লগ থেকে নামল রানা, ফ্লাস্কের বাকি তরলটুকু শেষ করল কয়েক চুমুকে। তারপর মাটিতে শুয়ে চোখ বুজল। আধো ঘুম থেকে জেগে চোখ মেলতে দেখল, সিংহটাও মাটিতে মাথা নামিয়ে চোখ বন্ধ করেছে।

রাতের আওয়াজ পরিবেশটাকে শান্ত বা নিস্তব্ধ হতে দিল না। তবে তাতে করে ওদের ঘুমে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হলো না। ভোর হবার ঠিক আগে নতুন একটা আওয়াজ যোগ হলো। হায়েনার কর্কশ কাশি, কুৎসিত হাসির মত লাগল সদ্য জেগে ওঠা রানার কানে। শব্দটা ওর পিছন থেকে আসছে। ইচ্ছে হচ্ছে না, তবু জোর করে চোখ খুলল ও।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাবার আগেই লক্ষ করল রানা, সিংহটা মাটি থেকে মাথা তুলেছে, তাকিয়ে আছে আগুন আর ওর পিছনে। তারপর চারপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল ওটা, আগুনটাকে ঘুরে হেঁটে এল, স্থির হলো ওর আড়ষ্ট শরীর থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে। সামনে তাকিয়ে আছে সিংহ, অন্ধকারে চোখ। তারপর শ্বাস নিয়ে একটা গর্জন ছাড়ল। এই গর্জন সহস্র বছর ধরে আফ্রিকার হৃদয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।

পিছু হটার ত্রস্ত পায়ের আওয়াজ ঢুকল রানার কানে। আগুনের উল্টোদিকে সিংহীরাও মাথা উঁচু করে তাকিয়ে আছে অন্ধকারে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড কান পেতে শোনার পর আবার তারা কাত হয়ে চোখ বুজল। আগুনটাকে ঘুরে নিজের জায়গায় ফিরে এল সিংহ, বসল আবার। আগুন প্রায় নিভে গেছে। রানা আর তাতে কাঠ গুঁজল না। ওর ডান দিকে রাঙা হতে শুরু করেছে পুব দিগন্ত। সিধে হলো ও, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর মাটি ফেলে নেভাতে শুরু করল আগুনটা। এবার ওকে ফিরতে হবে। দু'ঘণ্টা হেঁটে পৌঁছুতে হবে ল্যান্ড-রোভারের কাছে।

রওনা হবার পর, মাত্র একশো গজ এগিয়ে, থামল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। সিংহীরা এখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে। একা শুধু সিংহ জেগে। রওনা হবার সময় ও দেখেছে, বসে ছিল; এখন দাঁড়িয়ে আছে, সরাসরি ওর দিকে

তাকিয়ে।

হাত নেড়ে বিদায় সঙ্কেত জানাল ওকে রানা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার নিজের পথ ধরল।

রানা জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সদ্য নেভা আগুনের কাছ থেকে দেড়শো মিটার দূরে কয়েকটা বোল্ডারের ভেতর সিধে হলো ঘন কৃষ্ণবর্ণ একটা ছায়ামূর্তি।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম লোটন নড়বেল তার রাইফেলের সেফটি ক্যাচ অন করল। তারপর, অত্যন্ত সাবধানে অনুসরণ করল তার প্রাণপ্রিয় বন্ধুকে।

***

সার্বিয়া চক্রান্ত

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

এক

অন্ধকার হোটেল কামরায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। সড়সড় করে খাড়া হয়ে যাচ্ছে ঘাড়ের চুল। পরিচিত সেই অনুভূতিটা সতর্ক করে তুলল মাসুদ রানাকে—খুব কাছ থেকে কেউ যেন ওর ওপর নজর রাখছে।

কামরার ভেতর কেউ আছে। নিঃশ্বাস ফেলার কাঁপা কাঁপা শব্দ। লোকটা নার্ভাস, নাকি আতঙ্কিত? রানার বালিশের তলায় কোন অস্ত্র নেই। খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে, বেডসাইড টেবিলের আলোটা জ্বালার জন্যে কর্ডের দিকে হাত বাড়াল ও।

বেসুরো গলায় ফিসফিস করল লোকটা; ভাষাটা ইংরেজি, উচ্চারণে বলকান এলাকার টান। 'ভয় পাবেন না। আলোও জ্বালবেন না, প্লীজ। আমাকে মুর্তজা সাহেব পাঠিয়েছেন। কিন্তু এক লোক আমার পিছু নিয়ে…'

গুলির প্রচণ্ড শব্দে ঝাঁকি খেলো রানা, ঘরটাও কেঁপে উঠল। ভারী বস্তার মত কিছু একটা পড়ল বিছানার ওপর, একটা হাত ওর আঙুলগুলো খামচে ধরল করমর্দনের ভঙ্গিতে, পরমুহূর্তে শিথিল হয়ে গেল। নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয়ার আগে ওয়ার্ড্রোবের সামনে ছায়ামূর্তিটাকে দেখতে পেল রানা। আততায়ী পিছু হটছে। তার পিছনে ফ্রেঞ্চ উইন্ডো, পর্দাটা উড়ছে বাতাসে। লাশের হাত থেকে আঙুলগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে অকস্মাৎ ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত বিছানা থেকে লাফ দিল রানা। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা পেল, সম্ভবত ওয়ার্ড্রোবের চোখা কোণটার সঙ্গে বাড়ি খেয়েছে। কিন্তু পড়ে যাবার সময় ছায়ামূর্তির হাতে উল্টো করে ধরা আগ্নেয়াস্ত্রটা দেখে বুঝতে পারল একপাশে সরে গিয়ে ওই লোকটাই ওর মাথায় বাড়ি মেরেছে। বন বন করে ঘুরছে ঘর, তালগাছের মত লম্বা ছায়ামূর্তি ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে, যেন দম ফুরিয়ে আসা একটা লাটিম। তারপর প্রায় নাচতে নাচতে দূরে সরে গেল। ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে চলে গেল ঝুল-বারান্দায়, সেখান থেকে রেইলিং টপকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে নিচে। জ্ঞান হারাবার আগে বমি পাচ্ছে রানার, এখনও তাকিয়ে আছে ছায়ামূর্তির দিকে। লোহার রেইলিঙের মাথায় ধবধবে সাদা হাত দেখতে পেল, আঙুলগুলো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছে রেইলিং। হাত ছেড়ে দিল লোকটা, ঝপ করে খসে পড়ল হোটেলের পার্কিং এরিয়ায়। অন্ধকার গ্রাস করল রানাকে।

জ্ঞান ফেরার পর রানা দেখল, মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে ও, মাথায় অসহ্য ব্যথা, ঘরের ভেতর পুলিস। বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে মাথার ব্যথাটা অগ্রাহ্য করে যে-ই উঠে বসতে যাবে, অমনি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ইউনিফর্ম পরা দু'জন পুলিস নড়ে উঠল—একজন এক পা পিছিয়ে গেল, অপরজন

বুট দিয়ে খোঁচা মারল রানার পাঁজরে। অপমানটা নিঃশব্দে হজম করল ও। কিন্তু বুটটা আবার এগিয়ে আসছে দেখে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল পা, ধরেই ঠেলে দিল সামনের দিকে। দেয়াল ধরে তাল সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল লোকটা, দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে। পরমুহূর্তে এক লাফে সিধে হলো, বেল্ট থেকে অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে বেয়োনেট। রানা যেই দাঁড়িয়েছে, দ্বিতীয় পুলিসটা সরে এসে ওর গায়ে গা ঠেকাল, হাতের রিভলভার পাঁজরে ডেবে যাচ্ছে।

তীক্ষ্ণ একটা গলা শুনে ঘাড় ফেরাল রানা। সিভিলিয়ান লোকটাকে এই প্রথম দেখল। শক্ত-সমর্থ, দীর্ঘদেহী মানুষ; আর্মচেয়ারে বসে আছে, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওকে, নীল রেইনকোট পরে আছে, হাত জোড়া বুকের ওপর ভাঁজ করা। 'যুগোস্লাভিয়ায় কেউ যদি গ্রেফতার এড়াবার চেষ্টা করে, আমাদের আইনে তাকে গুলি করার অনুমতি দেয়া আছে। শুধু আমি নিষেধ করায় এখনও অফিসাররা আপনাকে মেরে ফেলেনি।'

'গ্রেফতার?' গলায় দৃঢ়তা আনার চেষ্টা করল রানা। চোখে এখনও ঝাপসা দেখছে, লোকটার চেহারা পরিষ্কার হচ্ছে না। 'কেন?'

লোকটা মাথা নাড়ল, নাকি দৃষ্টিভ্রম, ঠিক বোঝা গেল না। তবে ঝাড়বাতির আলো লেগে ঝিক্ করে উঠল চোখের চশমা। ঘাড় ফেরাতে লাশটা দেখতে পেল রানা—শরীরের অর্ধেকটা ওর বিছানার ওপর, ভাঁজ করা হাঁটু সহ বাকি অংশ মেঝেতে, লোকটা যেন নামাজ পড়ার সময় খুন হয়েছে। সাদাটে জিনসের ট্রাউজার আর শার্ট পরনে, পায়ের কেডস জোড়া পুরানো ও কাদামাখা। চোখের চশমা আবার ঝিক্ করে উঠল। খাপের ভেতর বেয়োনেটটা ভরে নিয়ে সেই পুলিস লোকটা আবার এগিয়ে এল। বুট দিয়ে লাথি মারল লাশের গায়ে, কিন্তু তাকিয়ে আছে রানার চোখের দিকে।

লাশের মাথা থেকে ক্যাপটা খসে পড়ল। বিস্মিত হলো রানা, সেই সঙ্গে বেদনায় টনটন করে উঠল বুকটা। লোক নয়, খুন হয়েছে একটা কিশোর—টেনেটুনে ষোলো বছর বয়স হবে। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা, এখনও ভাল করে দাড়ি-গোঁফ গজায়নি, খোলা কালো চোখ স্থির হয়ে আছে ঝাড়বাতির দিকে। দুর্বল, অসুস্থবোধ করল রানা; মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরল, ভয় পাচ্ছে আবার না জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

আর্মচেয়ার থেকে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে জানতে চাইল লোকটা, 'ওকে আপনি চেনেন?'

ঘাড় ফিরিয়ে আবার তার দিকে তাকাতে চশমার আকৃতিটা অদ্ভুত লাগল রানার। লোকটা ইউনিফর্ম পরেনি, সুটের ওপর নীল রেইনকোট চাপিয়েছে। কথা না বলে রানা শুধু কাঁধ ঝাঁকাল।

'ওর নাম আলভিক নুরানিক, মি. রানা।'

রানা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল নাম দুটো সে জানল কিভাবে? তার আগেই লোকটা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিল পুলিস দু'জনকে। বিছানার চাদর দিয়ে লাশটা মুড়ল তারা, ধরাধরি করে দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে গেল। দু'জনেই এত কম নড়াচড়া করল, সন্দেহ নেই এ-ধরনের কাজে তারা

অভ্যস্ত।

চেয়ারটায় আবার বসে একটা চুরুট ধরাল লোকটা। 'এবার বলুন, মি. রানা, যুগোস্লাভিয়ায় আপনি কি করছেন।'

কথা না বলে ক্লান্ত পায়ে খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর সামনে এসে দাঁড়াল রানা। নিচে প্রচুর গাছপালা, তারই মধ্যে পার্কিং এরিয়া। আলো আছে, তবে যথেষ্ট নয়। হাতঘড়ির উপর চোখ বোলাল একবার। রাত দুটো। রানার এই স্যুইট দোতলায়, ঝুল-বারান্দার রেইলিং থেকে নিচের পার্কিং এরিয়ায় নেমে যেতে তালগাছের মত লম্বা ছায়ামূর্তির কোন অসুবিধেই হয়নি। সেরকম কোন লোককে কি সত্যি দেখেছে ও? দৃষ্টিভ্রম বা দুঃস্বপ্ন নয়তো? ঘাড় ফিরিয়ে বিছানার দিকে তাকাল রানা। তোষকে রক্তের দাগ দেখতে পেল, ওর হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে।

'আপনি বরং গায়ে ড্রেসিং গাউনটা পরে পায়ে স্লিপার গলান, মি. রানা,' বলল লোকটা। 'আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।'

পিছিয়ে এসে ড্রেসিং গাউনটা পরল রানা। কিন্তু স্লিপার জোড়া কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। ওগুলো সম্ভবত কারও পায়ের ধাক্কায় খাটের তলায় সরে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে খোঁজার ইচ্ছে হলো না। উদ্ভট বা আনাড়ি মনে হয় এমন কিছু করতে এই মুহূর্তে রাজিও নয়।

'আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেননি,' বলল লোকটা। 'যুগোস্লাভিয়ায় কেন এসেছেন?'

'আমি একজন প্রকাশক। এখানকার…'

'প্রকাশক? আচ্ছা! তা কি প্রকাশ করেন, মি. রানা? এক দেশের গোপন তথ্য চুরি করেন, তারপর আরেক দেশে নিয়ে গিয়ে বেচে দেন?'

'আমি একটা প্রতিষ্ঠিত পাবলিশিং হাউসের মালিক,' বলল রানা। 'আমার প্রকাশনা সংস্থার হেড অফিস লন্ডনে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, এমন সব কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিকের লেখা ছাপি।'

'পাসপোর্টে আপনাকে প্রকাশকই বলা হয়েছে, কিন্তু সেটাই কি আপনার আসল পরিচয়?'

চোখ সরু করে লোকটার দিকে তাকাল রানা।

'এতে অবাক হবার কিছু নেই,' আবার বলল লোকটা। 'লাশটা পাবার পর আপনার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চেয়েছি আমরা। পাসপোর্টটা হোটেল ম্যানেজারের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। আপনি বৈধ ভিসা নিয়েই যুগোস্লাভিয়ায় এসেছেন, তবে পাসপোর্টে দেয়া সব তথ্য সত্যি কিনা তা একমাত্র আপনিই বলতে পারবেন।'

'আপনারা খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন আমি সত্যি একজন প্রকাশক কিনা।'

'হ্যাঁ, খোঁজ তো অবশ্যই নেয়া হবে,' কঠিন সুরে বলল লোকটা। 'লন্ডনে আমাদের লোক আছে। শুধু পরিচয় নয়, আরও অনেক বিষয়ে খোঁজ নেয়া হবে। আপনাকে যে-সব প্রশ্ন করা হবে তার উত্তর সঠিক না হলে আমরা জানতে পারব। কাজেই, সাবধান, মি. রানা।'

'উত্তর দেয়ার আগে আমাকে জানতে হবে, আপনি কে। তারপর আপনাকেও আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।' লোকটার দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে রানা।

লোকটা তার পকেট থেকে রানার ওয়ালেট, নোটবুক, কয়েক প্রস্থ পরিচয়-পত্র বের করে সামনের নিচু টেবিলে রাখল। 'এগুলোও পরীক্ষা করতে হয়েছে।' আরেক পকেট থেকে নিজের ওয়ালেটটা বের করল, তা থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'আমার কার্ড।'

ভিজিটিং কার্ডের বাঁ দিকে লেখা রয়েছে—ড. দেবারভিল সিডাক। ডান দিকে ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর। পেশা সম্পর্কে কোন তথ্য নেই।

'আমি,' রানা মুখ তুলতে বলল লোকটা, 'পুলিস বিভাগে আছি।'

'কিন্তু ইউনিফর্ম?'

'সিক্রেট পুলিসের চীফকে ইউনিফর্ম পরতে হয় না।'

'ও। কিন্তু ডক্টর মানে? আপনি কি চিকিৎসাও করেন?'

'না।' চুরুটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে জবাব দিলেন বেল্‌গ্রেড পুলিস চীফ। আপনমনে হাসছেন, বয়েস তাতে বেশ কিছুটা কমে পঞ্চাশে নেমে এল। 'ভিয়েনার পুবে ইউনিভার্সিটির যে-কোন গ্র্যাজুয়েটকে ডক্টর বলা হয়। আমার সাবজেক্ট ছিল আইন।' হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুললেন। সার্ব-ক্রোট ভাষায় দ্রুত কয়েকটা কথা বলে তাকালেন রানার দিকে। 'আপনি সরাসরি জার্মানী থেকে এখানে আসছেন?'

'হ্যাঁ, ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে।'

'ফ্রাঙ্কফুর্টে কেন গিয়েছিলেন?'

'ওখানকার বাৎসরিক বইমেলা আর পাবলিশারদের কনফারেন্সে যোগ দিতে।'

'এখানে কেন এসেছেন?'

'যুগোস্লাভিয়ায় নামকরা অনেক লেখক-সাহিত্যিক আছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলব। কেউ যদি লন্ডন থেকে কিছু ছাপাতে চান, আমি তার ব্যবস্থা করব।'

'বিশেষ কারও কথা ভাবছেন নাকি?' সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলেন সিডাক।

মাথা নাড়ল রানা। 'আপনাদের লেখক বা লেখালেখি সম্পর্কে আমার তেমন পরিষ্কার ধারণা নেই। তবে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে কয়েকজনের নাম বলা হয়েছে আমাকে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'কাদের নাম বলা হয়েছে?'

হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে নোটবুকটা নিল রানা। পাতা ওল্টাচ্ছে। 'স্টিফান তাজিনোভা, ইভানো গার্দিস, সাঈদ মুর্তজায়েভ, অদ্রে ডিয়াব...' থেমে মুখ তুলল রানা। 'নাম তো অনেকগুলোই, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে এখানকার লেখক সংঘের অনুমতি নিতে হবে।'

'তার আগে লেখক সংঘকে পেতে হবে পুলিস বিভাগের অনুমতি,' পুলিস চীফ বললেন। 'ফ্রাঙ্কফুর্টের কারা আপনাকে এই নামগুলো দিল? তারা সবাই কি জার্মান?'

'দু'একজন,' বলল রানা, 'সবাই নয়। দু'জন ফ্রেঞ্চ, একজন ইটালিয়ান আর একজন ইংরেজও ছিল। কেন?'

'তাদের মধ্যে সাঈদ মুর্তজায়েভের নামটা কে বলল আপনাকে?'

আলভিক নুরানিকের রুদ্ধশ্বাস ফিসফিসানি এখনও রানার কানে লেগে রয়েছে—'আমাকে মুর্তজা সাহেব পাঠিয়েছেন।' নোটবুক খুলে আবার চোখ বোলাবার ভান করল ও। 'সাঈদ…সাঈদ…হ্যাঁ, সাঈদ মুর্তজায়েভ।' পুলিশ চীফের দিকে তাকাল। 'এখানে শুধু নামটাই আছে, কে জানিয়েছে তা তো লিখে রাখিনি।'

'আপনাকে বিশেষভাবে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কই, না, সেরকম কিছু আমার মনে পড়ছে না।'

'উনি কিছু লিখছেন কিনা জানি না, তবে বহু বছর হলো তাঁর কোন লেখা ছাপা-টাপা হচ্ছে না—সেই ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর থেকে।'

আবার নোটবুকে চোখ বোলাল রানা, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'উনি কি আপনাদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট?'

'নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু শপথ নিতে পারেননি,' খুব নরম সুরে কথা বলছেন রাজধানীর পুলিস চীফ। 'রাজনৈতিক কারণে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। এ-সব আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, বিস্তারিত জানতে চেষ্টা করে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না, প্লীজ। আমার ধারণা, তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হবে না।'

'দেখা না হলে দুঃখ পাব,' বলল রানা। 'শুনেছি বিরল একটা প্রতিভা, কবি ও দার্শনিক হিসেবে খুব নাম…'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন দেবারভিল সিডাক, 'সাঈদ মুর্তজায়েভ যে বিরল প্রতিভা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

দরজায় নক হলো। পুলিস চীফ অনুমতি দিতে মধ্যবয়স্কা এক চেম্বারমেইডকে নিয়ে হোটেলের নাইট পোর্টার ঢুকল বেডরুমে। মহিলা সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে, এক হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে, অপর হাতের ভাঁজে একজোড়া চাদর। তোষকের ওপরও রক্ত লেগে রয়েছে দেখে কামরা থেকে আবার বেরিয়ে গেল নাইট পোর্টার। একটু পর আরও দু'জন লোককে নিয়ে ফিরে এল সে, ধরাধরি করে একটা নতুন তোষক নিয়ে এল তারা। বিছানার তোষক বদলের পর অতিরিক্ত লোক দু'জন চলে গেল। একপাশে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে নাইট পোর্টার, চেম্বারমেইড বিছানায় চাদর বিছাচ্ছে। দু'জনের কেউই পুলিস চীফ বা রানার দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না। ড. সিডাক নিঃশব্দে মহিলার কাজ দেখছেন, কথা বলছেন না। রানা বুঝতে পারল, হোটেল কর্মচারীদের সামনে রানার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক নন তিনি। ভালই হলো, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার সময় পাচ্ছে ও।

বেলগ্রেডের সিটি শেরাটন হোটেলে রানা বিদেশী একজন বোর্ডার, ওর কামরায় কেউ খুন হলে সঙ্গত কারণে ওকেই প্রথমে সন্দেহ করা হবে। কয়েকজন পুলিসকে নিয়ে একজন ইন্সপেক্টর তদন্ত করতে আসবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু

ইন্সপেক্টরের বদলে স্বয়ং পুলিস চীফ হাজির হওয়ায় বোঝা যাচ্ছে কেসটাকে সাধারণ একটা মার্ডার কেস হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে না। সবাই জানে যুগোস্লাভিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। এখানে নানা দেশের স্পাইরা তৎপর। বসনিয়ান মুসলিম গেরিলারা মন্ত্রী-মিনিস্টারদের হত্যা করার জন্যে সুইসাইড মিশন নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু যুগোস্লাভিয়া নয়, গোটা বলকান এলাকাই বারুদ হয়ে আছে। ন্যাটো কসোভোয় বোমাবর্ষণ করার পর জাতিগত বিরোধের একটা রাজনৈতিক মীমাংসা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষই সন্তুষ্ট নয়। বসনিয়ান মুসলমানদের আত্মঘাতী বোমায় বেলগ্রেডের মেয়র সহ একজন প্রতিমন্ত্রী খুন হয়েছে গত মাসে। তার দু'দিন পরই ক্রোট দাঙ্গাবাজরা বেলগ্রেডের দুটো শপিং মলে আগুন ধরিয়ে দেয়ায় নিহত হয়েছে পঞ্চাশজন। এক সময় এক সারি পাহাড়ের নাম ছিল বলকান, সেই বলকান বলতে এখন বোঝায় দক্ষিণ-পুব ইউরোপের বিশাল অববাহিকা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, জাতিগত বিদ্বেষ, পাইকারী হত্যাকাণ্ড—বলকান আর অভিশাপ সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলকানদের রক্তপিপাসা সম্পর্কে কে না জানে! পরস্পরকে ঘৃণা করার প্রতিযোগিতায় চিরকালই তারা অক্লান্ত। তাদের আহাম্মকি দুনিয়াটাকে বেশ কয়েকবার ঝাঁকি দিয়েছে। বলকানের নিয়ম হলো জোর যার মুল্লুক তার। পছন্দ না হলে তোমাকে বন্দী করা হবে, কথায় না বনলে হত্যা।

রানা সতর্ক, তবে ভয় পাচ্ছে না। বিপদ আছে জেনেই যুগোস্লাভিয়ায় ঢুকেছে ও।

চেম্বারমেইড দ্রুত কাজ সারল। বিছানাটা দেখে এখন আর কারও মনে হবে না আলভিক নুরানিক এখানে খুন হয়েছে। তোষক পাল্টাবার সময় খাটটা একটু সরানো হয়েছে, কার্পেটের ওপর স্লিপার জোড়া দেখতে পাচ্ছে রানা। এগিয়ে এসে ওগুলোয় পা গলাতে যাচ্ছে, কিন্তু ডান পা পুরোপুরি ভেতরে ঢুকছে না। দ্বিতীয়বার জোরে চেষ্টা করায় ঢুকল বটে, কিন্তু টের পেল আঙুলের ফাঁকে কি যেন একটা আটকে গেছে। আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে বোঝার চেষ্টা করল জিনিসটা কি, কিন্তু লাভ হলো না।

ব্যাঙের চোখের পাতার মত লাফালাফি করছে পোর্টারের চোয়াল। মহিলাটি এখনও চোখ রগড়াচ্ছে। কাজ শেষ, পিছু হটার সময় মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাচ্ছে পুলিস চীফকে, যদিও ড. সিডাক ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল তারা, রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করছে মহিলা, রানা লক্ষ করল মহিলার একটা চোখ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে আবার খুলে গেল। ঝট করে পায়ের আঙুলে আটকে থাকা জিনিসটার কথা মনে পড়ে গেল রানার। মহিলার চোখ-ইশারার সঙ্গে ওটার কি কোন সম্পর্ক আছে?

বাঘের গর্জন শুনে চমকে উঠল রানা। ড. সিডাক হুঙ্কার ছেড়ে চেম্বারমেইড ও পোর্টারকে ঘরে ফিরে আসার হুকুম করলেন। দরজা আবার খুলে গেল। মহিলা কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে ঢুকল, পেছনে পোর্টার। রানা খানিকটা হতভম্ব—দরজার

দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভদ্রলোক, তাঁর পক্ষে কি মহিলার চোখ বন্ধ করা দেখতে পাওয়া সম্ভব? তারপর, হঠাৎ বুঝতে পারল চশমা জোড়া কেন এতক্ষণ অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। চশমার দু'দিকে দুটো সাইড প্যানেল আছে, ওগুলোর সাহায্যে চোখের কোণ দিয়ে পিছনের দৃশ্যও দেখতে পান ড. সিডাক। চশমার বর্ধিত অংশের কারণে আলোও ঘনঘন প্রতিফলিত হয়। কোনও সন্দেহ নেই, চেম্বারমেইডের ওপর নজর রাখছিলেন তিনি। কিন্তু কেন?

অসহ্য ধীরগতিতে ছুরি চালানোর ভঙ্গিতে কথা বলছেন ড. সিডাক। হতবিহ্বল পোর্টার শুধু কাঁপছে, কথা বলতে পারছে না। চেম্বারমেইডের চেহারা থমথমে হয়ে উঠল। সে-ও কথা বলছে না, শুধু মাথা নাড়ছে। পুলিস চীফ আবার তাকে প্রশ্ন করলেন, এবারও শুধু মাথা নাড়ল মহিলা, পুলিস চীফের জুতোর দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের দিকে পিছন ফিরে রানার মুখোমুখি হলেন ভদ্রলোক। 'মি. রানা, মেয়েলোকটা কি আপনাকে চোখ টিপল?'

'চোখ টিপল?' আকাশ থেকে পড়ার ভান করল রানা। 'কই, না তো। আমি শুধু দেখলাম উনি চোখ রগড়াচ্ছেন। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসেছেন, চোখ মিটমিট করতে পারেন, টিপবেন কেন?'

'ধন্যবাদ, মি. রানা,' নরম সুরে বললেন পুলিস চীফ। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল তাঁর শরীরে। বন করে আধ পাক ঘুরেই মহিলার পায়ের পাতা থেঁতলে দিলেন ডান পায়ের জুতো দিয়ে। আর্তনাদ শোনা গেল। রানা আন্দাজ করল, মহিলার পায়ের অন্তত পাঁচ-ছটা হাড় ভেঙে গেছে। কার্পেটে শুয়ে ব্যথায় ছটফট করছে সে। তাকে সাহায্য করা দরকার, কিন্তু মনস্থির করতে এক সেকেন্ড দেরি করে ফেলল রানা। মহিলাকে ধরে তোলার জন্যে যেই পা বাড়িয়েছে, ড. সিডাক কাঁধের ধাক্কায় একপাশে সরিয়ে দিল ওকে। 'না, মি. রানা। আপনার নাক গলানোটা বোকামি হবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল রানা।

'উঠে বসো!' মহিলাকে নির্দেশ দিলেন পুলিস চীফ।

এক হাঁটুর ওপর খানিকটা সিধে হলো মহিলা, দু'হাতে আহত পা ধরে আছে। রেইনকোটের পকেট থেকে একজোড়া গ্লাভস বের করলেন ড. সিডাক, শুয়োরের চামড়া দিয়ে তৈরি। গ্লাভস পরে মহিলার গালে থাপ্পড় মারলেন। একবার মারার পর কিছুক্ষণ থেমে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর আবার মারলেন। এভাবে চলতেই থাকল। খুব যে জোরে আঘাত করছেন তা নয়, তবু মহিলার ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়াতে শুরু করল। ফোঁপাচ্ছে সে, কিন্তু এখনও কিছু বলছে না। রানা খেয়াল করল, একবারও সে ড. সিডাক বা ওর দিকে তাকায়নি।

সাত-আটটা চড় মারার পর থামলেন ড. সিডাক। ইতিমধ্যে পুলিস দু'জন দোরগোড়ায় ফিরে এসেছে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, যেন জমে পাথর হয়ে গেছে। অবশেষে আবার ঝিক্ করে উঠল পুলিস চীফের চশমার কাঁচ। ইঙ্গিত পেয়ে পোর্টার এগিয়ে এসে মহিলাকে ধরে তুলল, সাহায্য করল কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে। তাকে খোঁড়াতে দেখে রানার বুকটা টনটন করে উঠল। ওকে কিছু একটা বলার ঝুঁকি নেয়াতেই বেচারির এই ভোগান্তি।

কামরার ভেতর পায়চারি শুরু করলেন ড. সিডাক। মাথাটা দপদপ করছে, সদ্য তৈরি বিছানায় বসে পড়ল রানা। প্রায় মিনিট তিনেক পর আবার সেই আর্মচেয়ারে বসলেন পুলিস চীফ। 'ব্যাপারটা আপনার পছন্দ হয়নি, তাই না, মি. রানা?' অস্বাভাবিক চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বললেন, 'পছন্দ আমারও হয়নি।'

রানার চোয়াল দুটো শক্ত হলো।

'তাহলে কাজটা আমি করলাম কেন?' চোখ থেকে চশমা খুলে আঙুল দিয়ে কপালটা টিপে ধরলেন ড. সিডাক। 'এদেশের লোকজনকে আপনি চেনেন না, মি. রানা। তারা বুনো, আদিম, হিংস্র। আইন না মানার প্রবণতা নিয়েই তারা বড় হয়। কোন কারণ ছাড়াই খুনোখুনি করে। কারণ যে নেই, তা-ও কিন্তু নয়। এদেশে কারা বসবাস করে জানেন? ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠির সংখ্যা এত বেশি, গুনে শেষ করতে পারবেন না। জাতপাত নিয়ে হরদম দাঙ্গা-ফ্যাসাদ লেগে আছে। এ স্রেফ নরক, মি. রানা। একটা আইনকেই ওরা ভয় পায়, বুঝলেন। সেটা হলো নির্যাতন। সেজন্যেই ওদেরকে লাথি মারি আমরা, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হাড়গোড় ভাঙি, প্রয়োজনে গুলিও করি।'

'কোন রকম বাছবিচার না করেই? নিরপরাধ লোকজনকেও?'

'নিরপরাধ? মি. রানা, এদেশে নিরপরাধ বলে কেউ নেই। সবাই যে যার নিজের খেয়াল-খুশি মত চলতে চায়। তা চলার অনুমতি দিলে সমাজ টিকবে না। মি. রানা, আপনি কি সম্রাট ব্যালিস সম্পর্কে জানেন? এগারো শতাব্দীতে বিয্যানটাইন গ্রীক সম্রাট ছিলেন? আমাদের প্রতিবেশী বুলগেরিয়ানরাও কম হিংস্র নয়, সম্রাট ব্যাসিল তাদেরকে পরাজিত করেন। যুদ্ধে অনেক যোদ্ধা বন্দী হয়। সম্রাট ব্যাসিল দশ হাজার সৈন্যকে বুলগেরিয়ার রাজার কাছে ফেরত পাঠান। কি দয়া, তাই না? কিন্তু না! ব্যাসিল একজন বাদে দশ হাজার সৈন্যকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন, ওই একজন বাকি সবাইকে পথ দেখিয়ে রাজার কাছে ফিরিয়ে আনে। বলা হয়, সৈন্যদের দেখে হৃদরোগে আক্রান্ত হন রাজা, এবং মারা যান। এই যে শোকে তিনি মারা গেলেন, এটা আমার কাছে আশ্চর্য লাগে। কারণ তাঁর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে যে-সব কাহিনী প্রচলিত আছে, কোন কাজে লাগবে না ভেবে ওই দশ হাজার সৈন্যকে তিনি মেরে ফেললে স্বাভাবিক ও মানানসই হত।'

'আমি ঠিক এভাবে শুনিনি,' বলল রানা। 'ব্যাসিল প্রতি একশোজনের মধ্যে নিরানব্বুইজনকে অন্ধ করেছিলেন, বাকি লোকটা যাতে পথ দেখিয়ে তাদেরকে নিয়ে যেতে পারে। তারও মাত্র একটা চোখ অক্ষত রাখা হয়েছিল।'

'আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে আপনার দেখা যাচ্ছে ভালই ধারণা আছে, মি. রানা,' বললেন ড. সিডাক। 'আমাদের গল্পে-সাহিত্যে, লোকগীতিতে, কবিতায়, ছবিতে একটা জিনিসই শুধু দেখতে পাবেন—রক্তপাত, হিংস্রতা, খুনোখুনি। এই বিষ আমাদের রক্তে মিশে আছে। একটা দুরারোগ্য ব্যাধি, মি. রানা।'

রানা বড় করে শ্বাস টেনে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল। 'আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে, ড. সিডাক।'

'বলুন।'

'হোটেলের চারদিকে সশস্ত্র পুলিস পাহারা দিচ্ছে, ভেতরেও কয়েকজনকে টহল দিতে দেখেছি,' বলল রানা। 'একজন ট্যুরিস্ট এরকম কড়াকড়ি দেখে স্বভাবতই নিরাপদ বোধ করবে। আমিও করেছিলাম। সেজন্যেই ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর কবাট বন্ধ করে শুইনি। আমার প্রশ্ন হলো, এতগুলো পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঝুল-বারান্দা হয়ে দু'দু'জন লোক কিভাবে ঢুকল আমার কামরায়?'

'সব দেশের পুলিসই ঘুষ খায়, মি. রানা।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন পুলিস চীফ, চোখে চশমা পরছেন। 'তাদের ওপর রাজনৈতিক চাপও থাকে, কেউ অনুরোধ করলে বা নির্দেশ দিলে ফেলতে পারে না।'

রানা কিছু বলতে যাবে, হাত তুলে থামিয়ে দিলেন পুলিস চীফ।

'আজ দুপুর আড়াইটায়, মি. রানা, আমার সঙ্গে আপনি দেখা করবেন, প্লীজ,' বললেন তিনি, রানাকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে এগোলেন। তাঁর পিছু নিয়ে দরজা পর্যন্ত যাচ্ছে রানা। ইচ্ছে করেই, জানে পুলিস চীফ চশমার সাইড প্যানেল দিয়ে ওকে লক্ষ করছেন, নাক দিয়ে ভদ্রলোকের কাঁধে গুঁতো মারার ভঙ্গি করল ও। দায়িত্বজ্ঞানহীন, ছেলেমানুষি আচরণ, সন্দেহ নেই; তবু নিজেকে রানা দমন করতে পারেনি। ভদ্রলোকের কাঁধ জোড়া আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখে অদ্ভুত একটা তৃপ্তিবোধ করল ও। আধ পাক ঘুরে ওর মুখোমুখি হলেন ড. সিডাক।

'স্রেফ একটা জোক, ড. সিডাক। বোঝাতে চেয়েছি, আপনার চশমার বর্ধিত অংশটুকু আমাকে মুগ্ধ করেছে।'

পুলিস চীফ ড. সিডাকের রাগ পানি হয়ে গেল, তাঁর হাসি দেখে মনে হলো শিক্ষকের প্রশংসা শুনে প্রিয় ছাত্র আহ্লাদ বোধ করছে। 'খুব কাজের জিনিস, কি বলেন?'

'কি জানি, আমার সন্দেহ আছে,' বলল রানা। 'এক লোককে চিনতাম, সে-ও এ-ধরনের চশমা পরত। পরিণতি মোটেও ভাল হয়নি।'

'কেন? কি ঘটেছিল?'

'চশমার সাহায্যে দেখা যায় বলে লোকটা বারবার শুধু পিছনটাই দেখত,' বলল রানা। 'ফলে একজন তাকে সামনে থেকে পেটে গুলি করে।'

পরিবেশ নিস্তব্ধ ও আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

ড. সিডাকই নিস্তব্ধতা ভাঙলেন। মাথা নিচু করে ছিলেন, চোখ তুলে রানার দিকে তাকালেন। 'আপনি আশ্চর্য একজন মানুষ দেখছি, মি. রানা। গুড নাইট। আশা করি বাকি রাতটুকু নিরুপদ্রবেই ঘুমাতে পারবেন।'

'গুড নাইট, ড. সিডাক।'

দরজা ও ফ্রেঞ্চ উইন্ডো বন্ধ করে দুটো পেইনকিলার ট্যাবলেট খেলো রানা, তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল বিছানায়। মাথাব্যথা কমে আসতে ডান পা থেকে স্লিপারটা খুলল, আঙুলের ফাঁক থেকে বের করে আনল খুদে ও প্রায় গোলাকার একটা বস্তু। চুল, ঝুল, দেশলাইয়ের ভাঙা কাঠি, সুতো, তুলো, দু'এক চিলতে রাঙতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি জিনিসটা—আবর্জনার সমষ্টি, দেখে কারও কিছু সন্দেহ হবে না, লুকিয়ে রাখা সহজ, ফেলে দিতেও সমস্যা নেই। দু'আঙুলে ধরে ওটাকে ঝাঁকাল রানা, ভেতর থেকে ভাঁজ করা চৌকো একটা কাগজ পড়ল

কার্পেটে। খোলার পর দেখা গেল ইংরেজিতে লেখা একটা চিঠি। চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই, তবে নিচে প্রেরকের নাম আছে।

> 'চেষ্টা করে দেখুন আমার সঙ্গে দেখা করার সরকারী অনুমতি পাওয়া যায় কিনা। অযথা কোন ঝুঁকি নেবেন না, প্লীজ। পত্রবাহক আমার বিশ্বস্ত, কিছু বলার থাকলে নির্দ্বিধায় তাকে বলতে পারেন। তবে লিখিত কিছু দেবেন না ওকে। এই কাগজটাও পুড়িয়ে ফেলুন। সরকারী অনুমতি পাওয়া না গেলে আমার লোক আবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। শুভেচ্ছা, সাঈদ মুর্তজায়েভ।'

অ্যাশট্রেতে ফেলে চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলল রানা। আলো নিভিয়ে বিছানায় উঠল বটে, কিন্তু ঘুম আসছে না। বেলগ্রেডের পুলিস প্রধান নিজেই স্বীকার করেছেন, কারও অনুরোধে বা নির্দেশে আলভিক নুরানিককে ওর স্যুইটে ঢুকতে দিয়েছে প্রহরী পুলিসরা। আর অপর লোকটি যে-ই হোক, নুরানিককে খুন করে যখন চলে যাচ্ছে, তখন তাকেও বাধা দেয়নি তারা। অর্থাৎ ড. সিডাক স্বীকার করে গেলেন, পুলিসের ওপর তাঁর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রশ্ন হলো, কে সে, পুলিস যার কথায় নাচে?

ঝট্ করে একজনের নাম মনে পড়ল রানার। সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল ওর। লোকটা সম্পর্কে জানে ও, তার ডোশিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়েছে। কার্চিক জোড়া রক্ত-মাংসের তৈরি নির্ভীক এক কিলিং মেশিন। তালগাছের মত লম্বা...হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, ওর স্যুইটে ঢুকে নুরানিককে সে-ই খুন করে গেছে।

রানার মন ঢাকায় ফিরে গেল। আজ যা ঘটল তার সূচনাপর্ব ওখান থেকেই শুরু হয়। কে জানে এর শেষ কোথায়!

দুই

ঢাকা, বিসিআই হেডকোয়ার্টার।

ছয় ও সাত, দুটো ফ্লোরেই আশ্চর্য এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। লাঞ্চের এই সময়টায় এজেন্টদের কামরা থেকে সুন্দরী প্রাইভেট সেক্রেটারিদের রিনিঝিনি হাসির আওয়াজ ভেসে আসে, কিন্তু ওদের কামরাগুলো আজ বন্ধ, ভেতরে কেউ নেই। প্রতিটি করিডর ফাঁকা। কোথাও কোন ইন্টারকম বাজছে না।

থাকার মধ্যে আছে শুধু টেকনিশিয়ানরা, সাউন্ডপ্রুফ কমিউনিকেশন রুমে সবাই তারা অত্যন্ত ব্যস্ত। দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তিটি একদিনের জন্যে সরকারী সফরে ঢাকায় এসেছেন, তাঁর অবস্থান, সম্ভাব্য গন্তব্যস্থান ও সংশ্লিষ্ট এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা মনিটরিং করছে তারা।

কমিউনিকেশন রুমের সমস্ত তথ্য সরাসরি মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের চেম্বারে চলে আসছে। ডেস্ক ও রিভলভিং চেয়ারের ডান দিকে এক সারিতে সাতটা মনিটর বসানো হয়েছে, প্রতিটি স্ক্রীনে আলাদা দৃশ্য—মার্কিন

দূতাবাস, সোনারগাঁও হোটেল, রাষ্ট্রীয় অতিথিভবন, সেনাবাহিনী প্রধানের দফতর, গণভবন ইত্যাদি। চেম্বারে রানাও উপস্থিত।

বিসিআই এজেন্টরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় ছড়িয়ে আছে, কানে হেডফোন লাগিয়ে সরাসরি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে রানা। হেডফোনের সঙ্গে মাউথপীসও আছে, মাঝে মধ্যে দু'একটা নির্দেশও দিচ্ছে ও। রাহাত খানের মত ওর চোখও ঘুরে বেড়াচ্ছে সাতটা মনিটর স্ক্রীনে।

অকস্মাৎ রানার শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। মাউথপীসে হাতচাপা দিয়ে বসের দিকে তাকাল ও, কথা বলার আগে একটা ঢোক গিলল। 'স্যার, খারাপ খবর! মেডিলিন অলব্রাইটকে পাওয়া যাচ্ছে না!'

এক সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন রাহাত খান। 'হোয়াট?'

'কনফার্মড্ নিউজ, স্যার,' বলল রানা, এরইমধ্যে ঘামতে শুরু করেছে হাতের তালু। 'উনি আমেরিকান দূতাবাসে ছিলেন, কিন্তু লাঞ্চের সময় তাঁকে টেবিলে না দেখে সিআইএ এজেন্টরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারে, মেডিলিন অলব্রাইট দূতাবাসের কোথাও নেই!'

রাহাত খান যেন একটা রোবট, এক চুল নড়লেন না। 'অ্যাবসার্ড!'

'খোদ সিআইএ এজেন্টরাই আমাদের লোকজনকে এ খবরটা জানিয়েছে,' বলল রানা, উত্তেজনায় ও উদ্বেগে গলাটা কেঁপে গেল। 'ওরা বলছে, দূতাবাসে অনেক গাড়ি আসা-যাওয়া করছে, প্রতিটি গাড়ি চেক না করে ছাড়া হচ্ছে না; অথচ সিকিউরিটি গার্ডরা একবাক্যে বলছে তারা ওঁকে দূতাবাস থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি।'

'একা শুধু অলব্রাইটকে পাওয়া যাচ্ছে না?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান। তিনি বিচলিত নন, তবে নির্লিপ্তও বলা যাবে না।

'না—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল আফতাব ওঁদের দূতাবাসে ছিলেন, তাঁকেও পাওয়া যাচ্ছে না।'

'মেজর জেনারেল আফতাব? জন সি হোলজম্যানের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক আছে তাঁর,' বললেন রাহাত খান। 'উনি সম্ভবত রাষ্ট্রদূতের ব্যক্তিগত বন্ধু হিসেবেই আজ দূতাবাসে গিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করো, মেজর জেনারেল কি সিভিল ড্রেসে ছিলেন?'

একটা মনিটরে বিসিআই-এর একজন এজেন্টকে দেখা যাচ্ছে, মাউথপীস থেকে হাত সরিয়ে তার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলল রানা, তারপর বসকে জানাল, 'না, উনি ইউনিফর্ম পরেই ছিলেন।'

'কতক্ষণ হলো ওঁদেরকে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'সিআইএ তিন মিনিট আগে খবরটা দিয়েছে,' বলল রানা। 'মেডিলিন অলব্রাইটকে শেষবার দেখা গেছে সতেরো মিনিট আগে। স্যার, মেজর আফতাব কি...?'

রানা প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না, রাহাত খান মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন। ডেস্ক থেকে মোবাইল ফোনটা তুলে নিয়ে দ্রুত ডায়াল করলেন। 'মি. হোলজম্যান? আমি রাহাত খান। কি ব্যাপার বলুন তো?'

অপরপ্রান্তে জন সি হোলজম্যান কি বলছেন রানা শুনতে পাচ্ছে না। এক মিনিট পর রাহাত খান বললেন, 'ধন্যবাদ।' রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে তাকালেন। 'আতঙ্কিত হবার কিছু নেই,' বললেন তিনি। 'মেডিলিন তাঁর কামরায় একটা নোট রেখে গেছেন। এক মিনিট আগে পাওয়া গেছে সেটা। মেডিলিন তাতে লিখেছেন, মেজর জেনারেল আফতাবের সঙ্গে তিনি একটু বাইরে যাচ্ছেন, কাজেই কেউ যেন উদ্বিগ্ন না হয়। বলেছেন, এক ঘণ্টার মধ্যে দূতাবাসে ফিরে আসবেন।'

'প্রটোকল, সিকিউরিটি ছাড়াই তিনি বেরিয়ে পড়লেন?'

'হোলজম্যানের বিশেষ বন্ধু আফতাব, তাঁর মার্সিডিজ গাড়ির কাঁচ টিনটেড, ঘন ঘন আসা-যাওয়া করতে দেখে সিকিউরিটি গার্ডরা গাড়িটা সম্ভবত আর ভাল করে চেকও করছিল না, ঠিক এই সুযোগটাই নিয়েছে মেডিলিন। হয়তো প্রটোকল আর সিকিউরিটিকে ফাঁকি দিয়ে ঢাকা শহরটা ঘুরে দেখার শখ হয়েছে।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলালেন রাহাত খান। 'লাঞ্চের সময় বেরিয়েছেন—কে জানে, হয়তো সংসদ ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে চটপটি বা ফুচকা খাচ্ছেন এখন।'

এরকম একটা পরিস্থিতিতে রাহাত খান কৌতুক করছেন, ব্যাপারটা রানার কাছে অবিশ্বাস্য লাগল। কিন্তু কৌতুকটা হজম করার সময় পাওয়া গেল না।

নক না করে রাহাত খানের চেম্বারে ঢুকবে, এত সাহস কারও নেই; অথচ সেটাই ঘটতে যাচ্ছে। রাহাত খান ভুরু কোঁচকালেন। পরমুহূর্তে হকচকিয়ে না গিয়ে উপায় থাকল না। দীর্ঘদেহী মেজর জেনারেল আফতাব দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালেন, তাঁকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে সোজা এগিয়ে এলেন ভারী শরীর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডিলিন কোরবেল অলব্রাইট।

চোখে চকলেট রঙা চশমা, ডেস্কের দিকে এগোবার সময় সেটা মাথার ওপর তুলে চাঁদিতে আটকালেন ভদ্রমহিলা। মিডিয়ার বদৌলতে অতিপরিচিত মৃদু হাসিটি ঠোঁটে লেগে আছে, রাহাত খানকে দেখে এবার তাঁর চোখ দুটোও হেসে উঠল। চেম্বারের সাদা আলোয় সোনালি চুল ঝলমল করছে। গলায় তিন প্রস্থ প্ল্যাটিনাম নেকলেস। লাল কোটের সামনের দিকে লিচু আকৃতির সাতটা সোনালি বোতাম। কোটের নিচে রূপালি পপলিনের ব্লাউজ আর স্কার্ট। গলায় ওড়নার মত ঝুলছে নীল স্কার্ফ।

শশব্যস্ত হয়ে চেয়ার ছাড়লেন রাহাত খান, ডেস্ক ঘুরে কয়েক পা এগিয়ে এলেন। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করলেন, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে, বাইরে থেকে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিচ্ছেন মেজর জেনারেল আফতাব। চেয়ার ছেড়ে রানাও উঠে দাঁড়াল। 'সারপ্রাইজড?' জিজ্ঞেস করলেন অলব্রাইট।

কি আছে অলব্রাইটের হাসিতে? চেম্বার ছেড়ে পালিয়ে যাবার তাগাদা অনুভব করছে রানা। প্রৌঢ়ার এই হাসিতে খানিকটা অভিমান আর বিষণ্ণতার আভাস পাচ্ছে ও, যে হাসির অর্থ একমাত্র হয়তো শুধু রাহাত খানের কাছেই ধরা পড়া উচিত। ওঁরা পূর্ব-পরিচিত সন্দেহ নেই; কিন্তু সে পরিচয় কতটুকু গাঢ় ছিল? পালাতে হলেও সুযোগ দরকার, কিন্তু এই মুহূর্তে সে সুযোগ পাচ্ছে কোথায় রানা!

করমর্দনের জন্যে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন রাহাত খান। 'একটা খবর

দিয়ে আসতে পারতে,' বললেন তিনি। 'সিকিউরিটির কথা তুলে মি. ক্লিনটন যেখানে আমাদের জাতীয় স্মৃতিসৌধে গেলেন না...'

রাহাত খানের হাতটা দেখেও না দেখার ভান করলেন অলব্রাইট। তাঁর একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়লেন, তারপর কাঁচা-পাকা গোঁফ লক্ষ করে বাড়িয়ে দিলেন নিজের গাল। ভদ্রমহিলার গালে গাল ঠেকালেন রাহাত খান, প্রথম ডান গালে, তারপর বাম গালে। পিছিয়ে আসবেন, পারলেন না—নরম আলিঙ্গনে তাঁকে বন্দী করলেন অলব্রাইট। বললেন, 'আমেরিকায় গেলেও আজকাল তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো না। কি বললে? সিকিউরিটি? সিআইএ-র এটা বাড়াবাড়ি, রীতিমত অন্যায়। এই যে আমি একা চলে এলাম, সেই অন্যায়ের খানিকটা প্রতিকার করা হলো। এ-সব থাক, রাহাত—কেমন আছ তুমি তাই বলো।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটা চেয়ার দেখালেন রাহাত খান। 'বসো, মেডিলিন।' ভদ্রমহিলা বসার পর নিজের রিভলভিং চেয়ারে ফিরে এলেন তিনি, রানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইলোরার সঙ্গে তুমিও থাকো, রানা, দেখো আপ্যায়নের কি ব্যবস্থা করা যায়।'

'ইয়েস, স্যার,' বলে দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা।

হেড অফিসের ক্যান্টিন আর ফ্রিজ থেকে এটা-সেটা নিয়ে ট্রেটা সাজাতে দশ মিনিটের বেশি লাগল না ওদের। রানার প্রাইভেট সেক্রেটারি পারভিনকে আগেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, মেজর জেনারেল আফতাবকে রানার অফিসে বসিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করছে সে। রাহাত খানের চেম্বারের দরজাটা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল রানা, চাকা লাগানো ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকল পারভিন।

রানা ভেতরে ঢুকছে, শুনতে পেল রাহাত খান বলছেন, '...সবার কথাই বললে, তবে একজনের কথা ভুলে গেছ। পঞ্চান্ন সালে ওয়েলেসলি কলেজে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ত সে...'

অলব্রাইট তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'জানি কার কথা বলছ। কিন্তু তার প্রসঙ্গে কিছু বলার আগে তোমাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি। ঘালির পর কে, এই প্রশ্নটা যখন উঠল, তিনটে নাম বিবেচনা করি আমরা। তালিকায় তোমার নামটাই সবার ওপরে ছিল, সবুজ কালিতে আন্ডারলাইন করা। কিন্তু প্রস্তাবটা তুমি প্রত্যাখ্যান করলে, কোনও ব্যাখ্যা পর্যন্ত দাওনি। কেন, রাহাত?'

ট্রে থেকে নিয়ে প্লেটগুলো সোফার সামনে নিচু টেবিলে সাজাচ্ছে পারভিন, তাকে রানা সাহায্য করলেও কান রয়েছে ডেস্কের দিকে।

'জানি। বাকি দুটো নাম সাঈদ মুর্তজায়েভ ও কোফি আনান। আমি মুর্তজায়েভের কথাই জানতে চাইছিলাম।'

অলব্রাইট বললেন, 'তুমি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ!'

'মহাসচিব হতে চাইনি, কারণটা অবভিয়াস নয়?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান। 'ভেবে দেখো না, একটা শিশুর ক্ষতি করা সবচেয়ে সহজ নয়?'

'তুমি বাংলাদেশকে মীন করছ।'

'দেশটা কিভাবে স্বাধীন হলো স্মরণ করো,' বললেন রাহাত খান। 'মুখে

বন্ধুত্বের কথা বলে সবাই আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। স্বজাতিকে বিপদের মধ্যে ফেলে সর্বজাতির মঙ্গল করতে যাওয়াটা কি উচিত হত আমার?'

'দুঃখিত, আমারই বুঝতে ভুল হয়েছে,' অলব্রাইট রাহাত খানের যুক্তি মেনে নিলেন। 'আমি খবর রাখি, ইউ আর ডুইং আ ফাইন জব।'

'প্লীজ, ম্যাডাম,' টেবিল সাজানো শেষ হতে মেডিলিন অলব্রাইটকে বলল রানা, 'সোফায় এসে বসুন।'

ওঁরা দাঁড়ালেন, পারভিনের পিছু নিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রানা। পিছন থেকে শুনতে পেল রাহাত খানকে ভদ্রমহিলা বলছেন, 'ছেলেটা মাসুদ রানা না? ওর তো খুব নাম শুনি, আমাদেরও অনেক উপকার করেছে...'

'হ্যাঁ,' রাহাত খানের গলা একটু গম্ভীর। 'কিন্তু তা সত্ত্বেও সিআইএ ওকে সহ্য করতে পারে না।'

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা, আশা করছে মেডিলিন অলব্রাইট সিআইএ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করবেন। কিন্তু না, প্রসঙ্গটা এড়িয়ে তিনি বললেন, 'ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে না?'

ঘুরে এগিয়ে এল রানা। হ্যান্ডশেক করার সময় ভদ্রমহিলা বললেন, 'জিয়ায় তখনও ল্যান্ড করেনি প্লেন, মি. ক্লিনটন আমাকে বলছিলেন—এয়ারপোর্টে নিশ্চয়ই দেখা যাবে তোমাকে।'

'তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ এখান থেকে মনিটর করা হচ্ছে,' বলল রানা। 'বসকে আমি সাহায্য করছি, তাই যেতে পারিনি।'

একে একে সবগুলো মনিটর স্ক্রীনে চোখ বোলালেন অলব্রাইট। সেটা লক্ষ করে রাহাত খান বললেন, 'সিআইএ-র ছড়ানো গুজবটা মিথ্যে, মেডিলিন। তালেবান জঙ্গীরা বাংলাদেশে মি. ক্লিনটনের জন্যে কোন হুমকি নয়।'

এবারও সিআইএ প্রসঙ্গ কৌশলে এড়িয়ে গেলেন অলব্রাইট। হঠাৎ টেবিলে সাজানো খাবারের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন তিনি। 'বাহ্, লিচু! আমগুলোও নিশ্চয়ই রাজশাহীর—ল্যাংড়া?' বাংলাদেশী ফলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করলেন তিনি; স্যান্ডউইচ, পিৎসা, পেস্ট্রি বা জ্যাম-জেলির দিকে ফিরেও তাকালেন না। সোফায় বসে রানাকে বললেন, 'সিট ডাউন, মাই ডিয়ার বয়!'

সবাই খাচ্ছে, তবে রানার কান সজাগ হয়ে আছে কে কি বলেন শোনার জন্যে। পুরানো প্রসঙ্গটা আবার তুললেন রাহাত খান। 'ওয়েলেসলি কলেজে আমাদের দু'জনেরই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল মুর্তজায়েভ। মাথাটা এত ভাল ছিল, প্রফেসররা পর্যন্ত সমীহ করতেন। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি তার কথা সযত্নে এড়িয়ে গেলে। অনেক দিন তার কোন খবর পাই না। ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর ওকে শপথ নিতে দেয়া হয়নি, এটুকু জানি। কিন্তু তারপর মিডিয়া তার কথা একেবারে ভুলে গেছে। মুর্তজা এখন কোথায় বলো তো?'

শুধু ফলই খাচ্ছেন অলব্রাইট, প্রশ্ন শুনে তা-ও বন্ধ হয়ে গেল। 'বেলগ্রেডেই আছে সে, যুগোস্লাভিয়া সরকার তাঁকে হাউসঅ্যারেস্ট করে রেখেছে।'

'মাই গড! কেন?'

'কেন মানে? বলকানে কোন বিচার বা ন্যায়নীতি আছে নাকি? জাতিগত

বিদ্বেষ ওদের মজ্জাগত। মুর্তজা মুসলমান, এরচেয়ে বড় কোনও অপরাধের দরকার আছে?'

'ন্যাটোকে দিয়ে তোমরা তো ওদেরকে শায়েস্তা করার চেষ্টা করলে,' রাহাত খান বললেন, 'যুগোস্লাভিয়াকে বাধ্য করতে পারলে না মুর্তজাকে মুক্তি দিতে?'

'আমি চেয়েছিলাম তোমার সঙ্গে বসে পুরানো দিনের কিছু স্মৃতি রোমন্থন করব,' অলব্রাইট বিষণ্ন সুরে বললেন। 'ভাবিনি রাজনীতি নিয়ে কথা তুলে বসবে।'

'আমার অবাক লাগছে,' ধীরে ধীরে বললেন রাহাত খান। 'আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বছরের 'পর বছর ধরে গৃহবন্দি হয়ে আছে, অথচ আমরা তার জন্যে কিছুই করিনি। ওকে মুক্ত করা তোমার জন্যে তো কোন ব্যাপারই নয়, মেডিলিন!'

দু'সেকেন্ড চুপ করে থেকে প্রশ্নের জবাব দিলেন অলব্রাইট, 'বিরানব্বুই সালে মন্ট্রিনিগ্রো আর সার্বিয়াকে নিয়ে নতুন যে যুগোস্লাভিয়ার জন্ম হয়েছে আমরা সেটাকে স্বীকৃতি দিইনি, রাহাত। ওখানে আমাদের কোন প্রতিনিধি নেই। কাজেই...'

তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে রাহাত খান বললেন, 'তোমরা একমাত্র সুপারপাওয়ার, মেডিলিন।' কয়েক সেকেন্ড তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তারপর আবার বললেন, 'সিআইএ কোথায় কি না করছে...'

রাহাত খানের সেই দৃষ্টি অলব্রাইট যেন সহ্য করতে পারলেন না। মাথা নিচু করে বললেন, 'মুর্তজার জন্যে কিছু করা আমার পক্ষে সত্যি সম্ভব নয়, রাহাত। দুঃখিত।'

'তোমার জবাব আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না,' রাহাত খান নাছোড়বান্দা।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন অলব্রাইট। তারপর বললেন, 'বলকানে আমেরিকানদের নীতি মুর্তজা সমর্থন করে না। যদি বলি, যাদেরকে নিয়ে তার মুক্তির ব্যবস্থা করা সম্ভব তারা তাকে পছন্দ করে না?' একটু থেমে আবার বললেন, 'তারপরও ধরো তোমার অনুরোধে তাদের সাহায্য নিয়ে মুর্তজাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতে যদি হিতে বিপরীত হয়? বন্ধুকে আরও বড় বিপদে ফেলার ঝুঁকি কি আমার নেয়া উচিত? প্লীজ, আর কোন প্রশ্ন কোরো না।'

এরপর স্মৃতি রোমন্থন। বিদায় পর্বটা অবশ্য খুবই আনন্দঘন হলো। এলিভেটরে ওঠার আগে অলব্রাইট বললেন, 'আমাদের দূতাবাসে কিছু লিচু আর আম পাঠাতে ভুলো না, রাহাত!'

'তুমিও ভুলো না যে কথা দিয়েছ এরপর আমি ওয়াশিংটনে গেলে কিচেনে বসিয়ে ওমলেট খাওয়াবে।'

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, রাহাত খানের পিছু পিছু চেম্বারে ফিরে এল রানা। ও আশা করল, সাঈদ মুর্তজায়েভ সম্পর্কে বস্ ওকে কিছু অন্তত জানাবেন, এমন কি হয়তো তাঁকে সার্বিয়া থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার নির্দেশও দিতে পারেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সেরকম কিছু ঘটল না। এ প্রসঙ্গে

একটা কথাও বললেন না তিনি। তাঁকে অন্যমনস্ক দেখে রানাও কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেল না।

সেদিন রাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ত্যাগ করে চলে যাবার পর বসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসবে রানা, রাহাত খান ওকে দাঁড়াতে বলে দেরাজ খুলে একটা ফোল্ডার বের করলেন। 'এতে তোমার প্লেনের টিকিট আর ভিসা আছে, কাল সকালের ফ্লাইটে তুমি নিউ ইয়র্কে যাচ্ছ।'

'নিউ ইয়র্কে যাচ্ছি?' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'কেন, স্যার?'

'জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের জরুরী মীটিং ডাকা হয়েছে,' রাহাত খান বললেন। 'কমান্ডার হিসেবে ওই মীটিঙে তোমাকে থাকতে হবে। কি বিষয়ে আলোচনা হবে ওখানে গেলেই জানতে পারবে...'

'কিন্তু, স্যার...'

ওকে থামিয়ে দিয়ে রাহাত খান বললেন, 'ঠিক আছে, পরে, কেমন? এখন তুমি এসো।'

বসের আচরণে খানিকটা হতভম্ব হয়েই চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। তবে নিউ ইয়র্কে আসার পর দুইয়ে-দুইয়ে চার মেলাতে ওর কোন অসুবিধে হয়নি।

যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী। প্রেসিডেন্ট ভবনে গোপন মীটিং বসেছে।

লাঞ্চ শেষ করে স্টাডিরুমে বিশ্রাম নিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট স্লোবোডান মিলোসেভিচ। আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল, সেখানেই হাজির হলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর ডিরেক্টর। ডিরেক্টর একজন মেজর জেনারেল। তিনি হাতে একটা ফাইল নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। কয়েক মাস ধরে ফিল্ড ওঅর্ক ও গবেষণা চালিয়ে একটা প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে, প্রেসিডেন্টকে দিয়ে আজ সেটা সই করানো হবে। প্ল্যানটা সম্পর্কে বিস্তারিত প্রায় সবই আগে থেকে জানেন তিনি।

কোন কথা হলো না, এমন কি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও মেজর জেনারেল আসন পর্যন্ত গ্রহণ করলেন না। ফাইলটা খুলে কোথায় সই করতে হবে দেখিয়ে দেয়া হলো, প্রেসিডেন্ট খসখস করে সই করে দিলেন। মুখ তুলে তাকাতে বাকি দু'জন প্রশংসা ও তৃপ্তির হাসি হেসে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

মিলোসেভিচ জানতে চাইলেন, 'আমরা তিনজন ছাড়া আর কে ব্যাপারটা জানবে?'

'কার্চিক জোডা। সে তার বাহিনীকে কাজে লাগাবে, তবে এই প্ল্যান সম্পর্কে কিছুই তাদেরকে জানাবে না।'

'প্ল্যানের প্রথম পর্বে আমাদের সেনাবাহিনী, ইন্টেলিজেন্স, পুলিস বা সরকারী কর্মচারীদের যেন কোন ভূমিকা না থাকে,' মনে করিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'অন্তত তদন্ত হলে তাদেরকে যেন দায়ী করা না যায়।'

'যাবে না,' প্রতিরক্ষামন্ত্রী কথা দিলেন।

'ফাইলটা কি আমার কাছে থাকবে?'

'মূল কপিটা ইচ্ছে করলে আপনি রাখতে পারেন, স্যার,' বললেন মেজর জেনারেল। 'তবে একটা কপি আমাদের কাছেও থাকা দরকার।'

ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিলেন প্রেসিডেন্ট। দরজা খুলে তাঁর একজন এইড ঢুকল স্টাডিতে। ইঙ্গিতে ফাইলটা দেখালেন মিলোসেভিচ, বললেন, 'আমাদের ইলেকট্রনিক সেকশনে পাঠিয়ে দাও এটা, বলবে একটা ডুপ্লিকেট কপি দরকার।'

ফাইল নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এইড, প্রেসিডেন্ট পিছন থেকে বললেন, 'আর শোনো, এখানে তিন কাপ কফিও পাঠিয়ে দাও।'

প্রেসিডেন্টের স্টাডি থেকে বেরিয়ে অফিসে ঢুকল এইড, একজন সহকারীকে ফাইলটা ধরিয়ে দিয়ে কি করতে হবে বলল, তারপর ইন্টারকমে কিচেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কফি বানাবার নির্দেশ দিল। সহকারী ফাইল নিয়ে রওনা দিল, কয়েকটা করিডর পার হয়ে চলে এল ইলেকট্রনিক সেকশনে। ভেতরে ঢুকতে হলে পাস লাগে, এইড-এর তা আছে, কিন্তু সহকারীর নেই। দরজায় একজন মিলিটারি পুলিস দাঁড়িয়ে আছে, ফাইলটা তার হাতে না দিয়ে সেকশন চীফকে ডেকে দিতে বলল সহকারী। ওয়াল-ফোনের রিসিভার নামিয়ে যোগাযোগ করল মিলিটারি পুলিস, অপরপ্রান্তের কথা শুনে বলল, 'ঠিক আছে, আপনিই চলে আসুন।' ক্রেডলে রিসিভার রেখে এইড-এর সহকারীকে সে জানাল, 'সেকশন চীফ লাঞ্চের সময় ছুটি নিয়ে চলে গেছে, সন্ধের আগে ফিরবে না। একজন টেকনিশিয়ান আসছে।'

টেকনিশিয়ান আসলে ফটোস্ট্যাট মেশিনের অপারেটর। সে মন্ট্রিনিগ্রোর খ্রিস্টান, তবে বিয়ে করেছে একজন মুসলমান মেয়েকে। সে আসতে এইড-এর সহকারী তার হাতে ফাইলটা ধরিয়ে দিয়ে কপি করে আনতে বলল।

মেশিন অপারেটর ইলেকট্রনিক রুমে ফিরে এসে কাজ শুরু করল। ফটোস্ট্যাট মেশিন থেকে বেরিয়ে আসা প্রিন্টআউটে কালি কম-বেশি হয়ে যাচ্ছে কিনা দেখার জন্যে কপি করা প্রথম পাতাটার ওপর চোখ বোলাচ্ছে। হঠাৎ একটা শব্দ দেখে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল, হার্টবিটও বেড়ে গেল—কার্চিক জোডা! নামটা এতই ভীতিকর, কয়েক সেকেন্ড নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেল সে। তারপর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পাতা দ্রুত পড়ে ফেলল। পড়ার পর মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল তার। কী সর্বনাশ! এ তো ভয়ঙ্কর একটা ষড়যন্ত্র!

মেশিন অপারেটর উপলব্ধি করল, ফাইলটা পড়াই তার পাপ হয়ে গেছে। সে এতই ক্ষুদ্র, এতই অসহায়, এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। অথচ, কিছু করতে না পারায় সারাজীবন তাকে জর্জরিত করবে অপরাধবোধ।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। কাঁপা হাতে বাকি পাতাগুলো কপি করতে শুরু করল সে। পুরো ফাইলটা কপি করার পর তার মনে হলো, এতক্ষণ সে একটা ঘোরের মধ্যে ছিল; তা না হলে কোন বুদ্ধিতে বা কি উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাতার দুটো করে কপি করল?

কপি করা সাতটা পাতা একটা বড় এনভেলাপে ভরল অপারেটর। বাকি সাতটা পাতা ভাঁজ করে ঢুকাল বেল্টের নিচে, যদিও জানে না এগুলো নিয়ে কি

করবে।

ছুটির পর বাড়ি ফেরার সময় এক চাচাতো ভাইয়ের কথা মনে পড়ল তার। ভাইটির স্টুডিও আছে, অনুরোধ করলে ফটোস্ট্যাট করা ফাইলটার মাইক্রোফিল্ম তৈরি করে দেবে সে। বড় কাগজের চেয়ে মাইক্রোফিল্ম লুকিয়ে রাখা অনেক সহজ। লুকিয়ে রেখে কি লাভ, এই প্রশ্নও জাগল তার মনে, তবে আপাতত ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করল না।

বাড়ি ফিরে অপারেটর দেখল তার স্ত্রীর এক আত্মীয়া বেড়াতে এসেছেন। ইনি গৃহবন্দী সাঈদ মুর্তজায়েভের দ্বিতীয় স্ত্রী। চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়। স্ত্রীকে চায়ের জন্য পাঠিয়ে মিসেস মুর্তজায়েভকে সব কথা খুলে বলল সে। মাইক্রোফিল্মে কি আছে শুনে আঁতকে উঠলেন ভদ্রমহিলা। অপারেটরকে তিনি বললেন, 'ওটা আমাকে দাও। কাল জাতিসংঘের একজন প্রতিনিধি মুর্তজায়েভের সঙ্গে দেখা করতে আসছে, সে ওটা তাঁর হাতে তুলে দেবে।' ভদ্রমহিলা মাইক্রোফিল্ম নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, চা পর্যন্ত খেলেন না।

রাত ঠিক আটটায় অপারেটরের বাড়িতে হানা দিল সিক্রেট পুলিস।

সন্ধে ঠিক সাতটায় ইলেকট্রনিক সেকশনের চীফ ফিরে আসে প্রেসিডেন্ট ভবনে নাইট ডিউটির জন্যে। ফিরেই খবর পায় প্রেসিডেন্ট টপ সিক্রেট একটা ফাইল কপি করতে পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টারের নাম্বার চেক করল সেকশন-চীফ। নিজের নোটবইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখল সাতটা নয়, কপি করা হয়েছে মোট চোদ্দ পৃষ্ঠা। সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করল সে।

মেশিন অপারেটরের বাড়ি সার্চ করে কিছুই পাওয়া গেল না। স্ত্রী সহ তাকে ধরে আনা হলো সিক্রেট পুলিসের হেডকোয়ার্টারে। ইতিমধ্যে তারা খবর পেয়েছে সন্ধের খানিক আগে অপারেটরের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন মিসেস মুর্তজায়েভ। ফলে সেই রাতে তাঁদের বাড়িতেও তল্লাশী চালানো হলো, কিন্তু কোন লাভ হলো না।

অমানবিক টরচার করায় ভোররাতে মারা গেল মেশিন অপারেটর। তার স্ত্রীকে পুলিস হেডকোয়ার্টারে আটকে রেখে চলল অকথ্য নির্যাতন।

কি ঘটে গেছে শোনার পর বেলগ্রেডের পুলিস চীফ ড. দেবারভিল সিডাক সাঈদ মুর্তজায়েভের বাড়ির ওপর নজর রাখার জন্যে প্রহরী পুলিসের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকায় জাতিসংঘের একজন প্রতিনিধি মুর্তজায়েভের সঙ্গে পরদিন দেখা করতে এলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সতর্ক দু'জন পুলিস অফিসার থাকল। মাইক্রোফিল্মটা সাঈদ মুর্তজায়েভ লুকিয়ে রেখেছিলেন, অফিসারদের সামনে সেটা তিনি পাচার করতে পারলেন না। তবে কথা প্রসঙ্গে ভদ্রলোককে বললেন, 'আমি একটা পাণ্ডুলিপি প্রায় শেষ করে এনেছি, বিশেষ কারণে খুব তাড়াতাড়ি সেটা প্রকাশ করা দরকার—ভাল কোন প্রকাশক পাওয়া যায় কিনা একটু খোঁজ করে দেখবেন, প্লীজ?'

ঘটনাচক্রে জাতিসংঘের ওই প্রতিনিধি একজন বাংলাদেশী মেজর, ইউএন

পীসকীপিং মিশনের সদস্য হিসেবে কসোভোয় দায়িত্ব পালন করতে এসেছেন। তিনি বাঙালী, এটা জানতে পেরে সাঈদ মুর্তজায়েভ মনে মনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। পুলিস অফিসারদের সামনেই ভাঙা ভাঙা বাংলায় মেজরকে কয়েকটা কথা বললেন তিনি, 'আমার কাছে ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্রের গোপন দলিল আছে। আমি বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বাস করি না, শুধু বাংলাদেশ থেকে জেনারেল রাহাত খান যদি কাউকে পাঠান, তাঁর হাতে ওটা আমি তুলে দেব।'

বাংলাদেশী মেজর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ পাননি, সময় শেষ হয়ে গেছে বলে তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় পুলিস অফিসাররা।

কসোভোয় ফিরে গিয়ে জাতিসংঘের সদর দফতর নিউ ইয়র্ক আর বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায় রিপোর্ট করলেন মেজর।

সাঈদ মুর্তজায়েভের মেসেজ পাবার পর মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

তারপর সব কিছু খুব দ্রুত ঘটতে থাকে। রাহাত খানের প্রস্তাব মেনে নিয়ে জাতিসংঘ থেকে জানানো হয়, লন্ডনের একজন পাবলিশার হিসেবে রানার কাভার তৈরি করা সম্ভব। ফ্রাঙ্কফুর্টে একটা বইমেলা চলছে, সেই মেলা হয়ে বেলগ্রেডে ঢুকবে রানা। যুগোস্লাভিয়া থেকে গোপন দলিল বের করে আনার জন্যে প্রয়োজনে ব্রিটিশ দূতাবাসেরও সাহায্য পাবে ও, অর্থাৎ ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে। ব্রিটিশ দূতাবাসে ম্যাক বিলিয়ার্ড নামে একজন অফিসার আছেন, এক সময় জাতিসংঘে কাজ করতেন, বেলগ্রেডে পৌঁছে রানাকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে বেলগ্রেডে ঢুকতে রানার কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু হোটেলে ওঠার পর প্রথম রাতেই ওর স্যুইটে খুন হয়ে গেল আলভিক নুরানিক নামে এক কিশোর।

তিন

বেলগ্রেডের ব্রিটিশ দূতাবাস-প্রধান রানার ব্যক্তিগত বন্ধু, তাই পরদিন সকালে প্রথমে তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে চাইল ও। ওকে জানানো হলো, তিনি লন্ডনে গেছেন, ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে। রানা তখন ইকনমিক কাউন্সেলর ম্যাক বিলিয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

রিসেপশনে অপেক্ষা করছে রানা। 'হ্যালো, মি. রানা,' বলে তীক্ষ্ণ চেহারার এক লোক ঢুকল ভেতরে, বয়স হবে ত্রিশ-বত্রিশ। সোফা ছেড়ে তার বাড়ানো হাতটা ধরল রানা। 'আমি জেমস ফোলি, সেকেন্ড সেক্রেটারি, কালচারাল অ্যাফেয়ারসের চার্জে আছি। মি. বিলিয়ার্ড এই মুহূর্তে একটু ব্যস্ত। আপনি আমার অফিসে বসবেন আসুন, প্লীজ।'

রানা ইতস্তত করছে।

'আপনি যে এখানে আসছেন সে খবর আমরা আগেই পেয়েছি, মি. রানা,' বলল ফোলি। তার দৃষ্টি এতই প্রখর, যেন রানার ভেতর সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। 'কাল রাতে কি ঘটেছে তা-ও আমরা জানি।'

'কিভাবে?' রানা নড়ছে না।

'আমাদের কাজই তো কোথায় কি ঘটছে খবর রাখা,' বলল ফোলি। 'আসুন, নিরিবিলিতে বসে আলাপ করি। আপনি যে খুব সিরিয়াস একটা বিপদে পড়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

রানা কিছু বলার আগেই রিসেপশনিস্ট বলল, 'মি. বিলিয়ার্ড আপনাদের জন্যে তাঁর অফিসে অপেক্ষা করছেন, মি. ফোলি।'

'আসুন, ওঁর অফিসেই বসি তাহলে,' বলে হাঁটা ধরল ফোলি, অগত্যা বাধ্য হয়েই তার পিছু নিতে হলো রানাকে।

ম্যাক বিলিয়ার্ড শান্ত প্রকৃতির দীর্ঘদেহী মানুষ, বয়স পঁয়ষট্টির কাছাকাছি, চেহারায় মার্জিত ভাবটুকু স্পষ্ট। রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার পর বসতে অনুরোধ করলেন, তারপর বললেন, 'কাল রাতে ঠিক কি ঘটেছে বলুন তো আমাকে।'

সাঈদ মুর্তজায়েভের চিরকুটের কথাটা বাদ রেখে সব কথাই বলল রানা।

ও থামতে বিলিয়ার্ড জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ঠিক জানেন, ছেলেটার নাম আলভিক নুরানিক?'

রানা মাথা ঝাঁকাল। 'ড. সিডাক তো তাই বললেন।'

ফোলি বলল, 'পুলিস নিশ্চয়ই আপনার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল চার্জ আনবে। পাসপোর্টে আপনাকে যেহেতু ব্রিটিশ নাগরিক বলা হয়েছে, আপনার পক্ষ নিয়ে আমাদেরকেও লড়তে হবে। কিন্তু কতটুকু কি করতে পারব বলা মুশকিল। ওরা যদি চায় আপনাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাবে...' কথা শেষ না করে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'তুমি এতটা ঘাবড়ে না গেলেও পারো,' ফোলিকে নরম সুরে তিরস্কার করলেন বিলিয়ার্ড। 'কোন প্রমাণ ছাড়া মি. রানার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ ওরা আনবে না। খুনটা যেহেতু মি. রানা করেননি, তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ থাকারও প্রশ্ন ওঠে না।'

'আপনি কি জানেন না, পছন্দ না হলে নিরীহ লোককেও ফাঁসিয়ে দেয় ওরা?' বিলিয়ার্ডকে পাল্টা প্রশ্ন করল ফোলি। 'যুগোস্লাভিয়ায় আইন বা বিচার বলে কিছু আছে?'

'ওরা বাড়াবাড়ি করলে আমরাও আঙুল বাঁকা করতে জানি,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'তারপরও পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠলে মি. রানাকে আমরা নিরাপদে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দেব।'

'ভুলে গেলেন, গত মাসে গোপনে যুগোস্লাভিয়া ত্যাগ করতে গিয়ে সতেরোজন মারা পড়েছে,' মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বলল ফোলি। 'সীমান্তরক্ষীরা বলছে তাদেরকে থামতে বলা হয়েছিল, না থামায় গুলি করতে বাধ্য হয়েছে।

তারপরও আপনি কি করে আশা করেন মি. রানাকে সীমান্তের ওপারে পাচার করতে পারব আমরা?'

এরপর আর রানার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না। 'আপনারা অযথা তর্ক করছেন। আমি কি বলেছি ওদেরকে বলুন আমাকে যেন ইলেকট্রিক চেয়ারে না বসায়? কিংবা বলেছি, আমাকে কাঁধে তুলে সীমান্তের ওপারে রেখে আসুন?'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। ফোলি থতমত খেয়ে গেছে। সে-ই অবশ্য নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'তাহলে আপনি আমাদের কাছে কি জন্যে এসেছেন?'

'আমি এসেছি মি. বিলিয়ার্ডের সঙ্গে পরিচিত হতে,' বলল রানা। 'আমি একজন প্রকাশক। আমাকে বলা হয়েছে, এখানকার কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে উনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

'হ্যাঁ,' সমর্থন করার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন বিলিয়ার্ড। 'নিউ ইয়র্কের আমার বন্ধু মহল এ-ব্যাপারে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে আমাকে। তো, মি. রানা, বলুন দেখি মি. সাঈদ মুর্তজায়েভ সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

রানা সতর্ক হয়ে গেছে, জেমস ফোলির সামনে বিলিয়ার্ডের সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে রাজি নয়। 'লেখক-সাহিত্যিকদের একটা তালিকা আছে আমার কাছে, তাতে সাঈদ মুর্তজায়েভের নামও আছে। ভদ্রলোক সম্পর্কে তেমন কিছুই আমি জানি না।'

'পুলিস চীফ ড. সিডাক তাঁর সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেননি?'

'হ্যাঁ, বলেছেন। ভদ্রলোক ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে শপথ নিতে দেয়া হয়নি। বেশ কয়েক বছর ধরে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে তাঁকে।' একটু থেমে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ভদ্রলোক সম্পর্কে আপনারা কতটুকু কি জানেন বলবেন আমাকে?'

'তাঁর সম্পর্কে ধারণা দেয়া সহজ কাজ নয়,' ধীরে ধীরে বললেন বিলিয়ার্ড। 'যুগোস্লাভ বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে পর্বতের সঙ্গে তুলনা করেন। কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক হিসেবে বোদ্ধাদের নমস্য তিনি। কিন্তু শাসকশ্রেণীর চক্ষুশূল। তাঁর রাজনীতি...'

'তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে বেশি কিছু না বলাই ভাল,' বিলিয়ার্ডের কথা কেড়ে নিয়ে বলল ফোলি। 'সত্যি কথা বলতে কি, রাজনীতিক হিসেবে ভদ্রলোক পুরোপুরি ব্যর্থ।'

'সাঈদ মুর্তজায়েভের রাজনৈতিক দর্শনে কোনও ত্রুটি নেই,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'রাজনীতিক হিসেবে তাঁর ব্যর্থতার জন্যে দায়ী সরকার ও আন্তর্জাতিক মাতব্বররা। তিনি বিশ বছর ধরে বলে আসছেন, বলকানের প্রতিটি জাতিগোষ্ঠিকে স্বাধীন হতে না দিলে গত সাতশো বছর ধরে যে আগুন জ্বলছে তা কোনদিন নিভবে না। তাঁর এই বক্তব্য তিক্ত হলেও, বাস্তব সত্য।'

'ভদ্রলোক কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লিখিয়েছিলেন, এটা তাঁর এক মারাত্মক ভুল ছিল না?' বিলিয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করল ফোলি।

'তৎকালীন যুগোস্লাভিয়ায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির চর্চা করত একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই। তিনিও ধর্ম-নিরপেক্ষতার সমর্থক ছিলেন। পরে পার্টির মূল

স্রোত তাদের নীতি বদলায়, তিনিও পার্টি ভেঙে বেরিয়ে আসেন। এর মধ্যে তাঁর ভুলটা কোথায় ছিল?'

'পার্টিতে নাম লিখিয়েছিলেন বলেই তো পার্টি তাঁর সঙ্গে বেঈমানী করার সুযোগ পেল,' মন্তব্য করল ফোলি। তারপর বলল, 'ন্যাটো বোমাবর্ষণ করার পর আরও একটা ভুল করলেন তিনি। কসোভোয় রাজনৈতিক স্থিতি সমর্থন করার শর্তে যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে মুক্ত করে আনার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন, 'আমেরিকানরা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির ক্ষতি করছে, আমি সে-কাজে তাদেরকে সমর্থন করতে পারি না। তিনি কসোভো সহ সার্বিয়ার বড় একটা অংশ বসনিয়ার অন্তর্ভুক্ত দেখতে চান। এখন আবার শোনা যাচ্ছে, রাজনীতির ওপর একটা বই লিখেছেন। কোনও সন্দেহ নেই, বইটা আমেরিকা ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধেই লেখা হয়েছে।'

'বই যদি সত্যি তিনি একটা লিখে থাকেন,' বলল রানা। 'আমি ওটা অনুবাদ করে ছাপতে চাই।'

মুচকি হেসে ফোলি বলল, 'কিন্তু আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন কিভাবে? সিক্রেট পুলিস আপনাকে অনুমতি দেবে বলে মনে হয় না।'

'এ-ব্যাপারে আপনি আমাকে কোনরকম সাহায্য করতে পারেন?' বিলিয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করল রানা।

কথা না বলে ডেস্ক থেকে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন বিলিয়ার্ড। সার্ব-ক্রোট ভাষায় কয়েকটা কথা বলে চেয়ার ছাড়লেন, রানাকে বললেন, 'চলুন, ড. সিডাকের সঙ্গে কথা বলে আসি।'

'কিন্তু উনি আমাকে বেলা আড়াইটায় যেতে বলেছেন।'

বিলিয়ার্ডের গম্ভীর চেহারায় ক্ষীণ হাসি ফুটল। 'ড. সিডাক এখুনি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।'

'কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল ফোলি।

'মার্ডার কেসটা সম্পর্কে খোঁজ নেয়া দরকার না?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন বিলিয়ার্ড। 'তাছাড়া, মি. রানা যাতে সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে দেখা করতে পারেন তার ব্যবস্থাও তো করতে হবে।'

'আপনার বদলে আমি গেলে ভাল হয় না?' সুর আরও নরম করল ফোলি।

'না, জেমস, ধন্যবাদ। ড. সিডাকের সঙ্গে তোমার চেয়ে আমারই খাতির বেশি।'

সাদা একটা ক্যাডিলাকে চড়ে রওনা হলো ওরা। ঘড়ির কাঁটায় সকাল দশটা, কিন্তু ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে সূর্য। ডিপ্লোম্যাটিক জোনটা বিশাল। শিশির ভেজা রাস্তা, ফুটপাথ আর পাতাবিহীন সারি সারি গাছ চকচক করছে। বিদেশী দূতাবাস ও সরকারী দফতর, প্রতিটি ভবনের গায়ে চকচকে তামার নামফলক দেখা যাচ্ছে, পাশেই লাল কিংবা সবুজ রঙ করা কাঠের সেন্ট্রি-বক্স, ভেতরে সশস্ত্র গার্ডরা সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে চারদিকে। পিস্তল, রাইফেল, সাবমেশিন গান—সব রকম অস্ত্রই দেখতে পেল রানা। এমন কি গার্ডদের বেল্টে গ্রেনেডও আছে। এলাকাটা পার

হবার আগে আরও একটা জিনিস লক্ষ করল ও—দূতাবাস বা সরকারী দফতর, কোথাও কেউ সরাসরি গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকছে না বা বেরুচ্ছে না। চারদিকে মার্সিডিজ বেঞ্জ-এর ছড়াছড়ি, দু'চারটে রোলসরয়েসও আছে, সবই রাস্তার ধারে পার্ক করা।

মার্শাল টিটো অ্যাভিনিউয়ে ঢুকল ক্যাডিলাক। সিক্রেট পুলিসের হেডকোয়ার্টার চৌরাস্তার কাছাকাছি। বিশাল ইমারত, এক সময় সম্ভবত কোন রাজার প্রাসাদ ছিল। লোহার প্রকাণ্ড গেট, কিন্তু সেটা বন্ধ। গেটের পাশে ছোট একটা দরজা, ওটা দিয়েই লোকজন আসা-যাওয়া করছে। প্রাসাদের সামনে ও দু'পাশে বেশ কিছু গাড়ি রয়েছে, তবে রাস্তায় জনমনুষ্যি নেই, একদম ফাঁকা। রাস্তার উল্টোদিকে গাড়ি থামালেন বিলিয়ার্ড।

'গুরুত্বপূর্ণ কোন বিল্ডিঙেই আজকাল গাড়ি নিয়ে ঢোকা যায় না, সরকারী নিষেধ,' গাড়ি থেকে নেমে রানাকে বললেন তিনি। 'তার কারণও আছে। কয়েকটা পুলিস স্টেশন আর সরকারী ভবন আত্মঘাতী বোমায় উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

রবিবার, সরকারী ছুটির দিন, তবু কাজ হচ্ছে আশপাশের অফিসে। ভাল করে দু'দিক দেখে নিয়ে রাস্তা পেরুচ্ছে ওরা। পুলিস হেডকোয়ার্টারের মূল গেট বন্ধ থাকলেও ভেতরের পাকা উঠান আর উঠানের দুই প্রান্তে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো দু'সারি লোককে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। ফাঁকা উঠানে একজন সেন্ট্রিকে দেখা যাচ্ছে, ইউনিফর্ম পরা, হাতে সাবমেশিন গান। সেন্ট্রির পাশে কালো ওভারকোট পরা এক লোক, রানার মনে হলো সে যেন সরাসরি ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। গেটের পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে এই মুহূর্তে কেউ ঢুকছে না, তবে হাতকড়া পরানো কয়েকজন বন্দীকে দেখা গেল, একদল পুলিস তাদেরকে লাইন দিয়ে বের করে আনছে। বন্দীদের মধ্যে জিনসের নোংরা প্যান্ট-শার্ট পরা এক তরুণীও রয়েছে।

বিলিয়ার্ড কথা বলছিলেন, তাই আওয়াজটা শুনতে পাননি। বাঁক নিয়ে মার্শাল টিটো অ্যাভিনিউয়ে ঢুকছে একটা দ্রুতগামী গাড়ি, কংক্রিটের সঙ্গে চাকা ঘষা খাওয়ায় কর্কশ শব্দ উঠল। ওরা তখন মাঝরাস্তায়। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। পরমুহূর্তে চিৎকার করে বলল, 'বিপদ! ফিরে আসুন এপারে!'

রানার দেখাদেখি বিলিয়ার্ডও ঘাড় ফিরিয়েছেন। রানা ছুটতে শুরু করলেও, বজ্রাহতের মত রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি। প্রকাণ্ড এক দৈত্যের মত কালো মার্সিডিজটা আর মাত্র বিশ গজ দূরে, তীরবেগে ছুটে আসছে। ঘন কুয়াশার ভেতর হেডলাইট জ্বেলে রেখেছে ড্রাইভার। ড্রাইভারের মাথায় হ্যাট, চোখে গগলস, চেহারা দেখা যাচ্ছে না। প্যাসেঞ্জার সীটে বসা লোকটা নিজেকে লুকাবার চেষ্টায় নিচু করে রেখেছে মাথা। বিলিয়ার্ড অবশ হয়ে গেছেন, অবিশ্বাস ও আতঙ্কে চোখজোড়া বিস্ফারিত। চোখের কোণ দিয়ে দেখলেন, অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে আসছে রানা, হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে ডাইভ দিল তাঁকে লক্ষ্য করে। পরমুহূর্তে দু'জনেই ছিটকে পড়ল রাস্তার ওপারে।

গা রি-রি করা আওয়াজ তুলে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল মার্সিডিজ। সেদিকে

ঘাড় ফেরাবার আগে পুলিস হেডকোয়ার্টারের ছোট দরজার ওপর চোখ আটকে গেল রানার। বন্দীদের নিয়ে হেডকোয়ার্টারের ভেতরে হুড়মুড় করে ঢুকে যাচ্ছে পুলিস। রানার তাকিয়ে থাকার কারণ হলো, পুলিসরা তরুণী বন্দিনীকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে বারবার, ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না, অথচ ফিরতি লাইনে সে-ই সবার আগে ছিল।

মার্সিডিজের দিকে ঘাড় ফেরাতে ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা স্টেনগানের ব্যারেল। এক মুহূর্ত পর বিলিয়ার্ডও দেখতে পেলেন সেটা। কোটের পকেটে হাত ভরছেন, সেই সঙ্গে একটা গড়ান দিয়ে রানার শরীরে উঠে পড়লেন, কাভার দিচ্ছেন। তারপর গুলি করার জন্যে হাতটা লম্বা করলেন।

স্টেনগান ঝাঁকি খেতে শুরু করল, সেই সঙ্গে নাচতে লাগল হেডকোয়ার্টারের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা নিঃসঙ্গ তরুণী। গুলির ঝাঁকটা রানা ও বিলিয়ার্ডের মাথার ওপর দিয়ে ছুটছে, একটাও ওদের কাছাকাছি কোথাও লাগল না।

ঝাঁঝরা শরীর নিয়ে বন্ধ দরজার পাশে পড়ে গেল হ্যান্ডকাফ পরা বন্দিনী। মার্সিডিজ আবার ছুটল। লাফ দিয়ে সিধে হয়ে পর পর কয়েকটা গুলি করলেন বিলিয়ার্ড, কিন্তু বৃথাই: বাঁক ঘুরে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা।

বিলিয়ার্ড সিধে হতেই লাফ দিয়ে ছুটল রানা, তরুণীর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। পালস পাবে না জানে, কারণ দেখতে পাচ্ছে, শুধু যে বুকটা চুরমার হয়ে গেছে তা নয়, কপালেও একটা বুলেট লেগেছে। যে মারা গেছে তাকে আর কি সাহায্য করবে ও, তরুণীর বিস্ফারিত চোখ দুটো শুধু বন্ধ করে দিল। সিধে হয়ে দাঁড়াবার পর ব্যাপারটা খেয়াল করল—প্রকাশ্য দিবালোকে, পুলিস হেডকোয়ার্টারের গেটে একজন বন্দিনী খুন হলো অথচ আশপাশ থেকে কেউ এগিয়ে আসছে না। চারদিকে চোখ বুলিয়ে আরও বিস্মিত হলো রানা। রাস্তার এপাশে সারি সারি অনেক বিল্ডিং, ভেতরে ও বাইরে মানুষের ভিড়; রাস্তার ওপারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাইভেট কার, প্রচুর লোকজন আসা-যাওয়া করছে, দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু ভুলেও কেউ এদিকে তাকাচ্ছে না।

লোহার গেট দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল রানা। হেডকোয়ার্টারের উঠানে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, একজন ইউনিফর্ম পরা সেন্ট্রি, অপরজন কালো কোট পরা সিভিলিয়ান; তাদের একজনকেও এখন দেখা যাচ্ছে না। উঠানের দুই প্রান্তে দু'সারি লোককে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল, তারা এখনও আছে, কিন্তু সবাই নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে, গেটের দিকে পিছন ফিরে। গেটের গ্রিলে নাক ঠেকিয়ে ভেতরের সেন্ট্রি-বক্সটা দেখার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু সেটার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন পুলিস আর বন্দীদের দেখতে পেল ও, সেন্ট্রি-বক্সের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে।

ছোট দরজার গায়ে ঘুসি মারছেন বিলিয়ার্ড। সার্ব-ক্রোট ভাষায় ডাকাডাকি করছেন। প্রায় এক মিনিট পর সেন্ট্রি-বক্সের দরজা খুলে গেল। হাতের স্টেনগান আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বাগিয়ে ধরে গেটের দিকে এগিয়ে এল একজন সেন্ট্রি, রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই?'

রানার পাশে চলে এলেন বিলিয়ার্ড। 'আমি ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে আসছি, ইকনমিক কাউন্সেলর।' পকেট থেকে আইডি বের করে দেখালেন সেন্ট্রিকে। 'পুলিস চীফের সঙ্গে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলে সেন্ট্রি-বক্সে ফিরে গেল লোকটা। উঁকি দিয়ে তাকে টেলিফোনে কথা বলতে দেখল রানা। একটু পর বেরিয়ে এসে গেটের পাশের দরজা খুলে দিল। বিলিয়ার্ড ও রানা ভেতরে ঢুকল। সেন্ট্রি আবার দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে, রানা জিজ্ঞেস করল, 'লাশটার কি হবে?'

লোকটা তাকিয়ে থাকল, কথা বলছে না। সে ইংরেজি জানে না, বুঝতে পেরে ওই একই প্রশ্ন সার্ব-ক্রোট ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন বিলিয়ার্ড। লোকটার জবাব ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনালেন রানাকে, 'অ্যামবুলেন্সকে খবর দেয়া হয়েছে, লাশটা মর্গে নিয়ে যাওয়া হবে।'

লোকটাকে আবার প্রশ্ন করল রানা, 'আত্মরক্ষার জন্যে বন্দী আর পুলিস ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। মেয়েটি ছিল সবার আগে। কিন্তু তাকে তুমি বার বার সরিয়ে দিচ্ছিলে, সে যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে। কেন?'

প্রশ্নটা ভাষান্তর করছেন বিলিয়ার্ড। লোকটা শুনছে ঠিকই, কিন্তু তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

বিলিয়ার্ডের মুখে তার জবাবটা শুনল রানা। 'মেয়েলোকটার গা থেকে উৎকট দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল, তাই তাকে দূরে সরে থাকতে বলা হচ্ছিল। পুলিস প্রহরীরা চাইছিল, সবার শেষে ভেতরে ঢুকবে সে।'

জবাব শুনে রানা সন্তুষ্ট হতে পারল না। রাগ চেপে রেখে মেয়েটার পরিচয় জানতে চাইল ও।

সেন্ট্রি মাথা নাড়াল, অর্থাৎ তরুণীর পরিচয় সে জানে না। এই সময় বন্দীদের নিয়ে সেন্ট্রি-বক্সের পিছন থেকে বেরিয়ে এল পুলিসের ছোট্ট দলটা। প্রশ্ন শুনে তারাও মাথা নাড়ল। রানা বুঝতে পারল, পরিচয় জানলেও বলবে না ওরা।

রানার হাত ধরে টান দিলেন বিলিয়ার্ড। 'এদের সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই। আসুন, লাইনে দাঁড়াই।'

'কি ঘটল বলতে পারবেন? আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে?' লাইনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমরা হেডকোয়ার্টারে আসছি, তা শুধু পুলিস চীফ আর মি. ফোলি জানেন, তাই না?'

'মি. ফোলি আমাদের লোক,' বিলিয়ার্ডের বলার সুরে কেমন যেন একটা ইতস্তত ভাব। 'সে বরং চাইবে সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে আপনার দেখা হোক। আমরা আসছি, এ-খবর ড. সিডাকের অফিস থেকেই ফাঁস হয়েছে, সে তাঁর জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারে।'

'আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন, বেলগ্রেড পুলিস চীফের ফোন ট্যাপ করা হয়?'

'সিক্রেট পুলিস বিভাগে দুটো সেকশন আছে,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'একটা ল অ্যান্ড অর্ডার সেকশন, আরেকটা পলিটিক্যাল ক্রাইম সেকশন। দ্বিতীয় সেকশনটা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। এমন কি মন্ত্রী-মিনিস্টারদের ফোনও ট্যাপ করে

তারা। প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচ ছাড়া আর কারও কাছে তারা জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।'

'তাহলে কি পুলিসের পলিটিক্যাল ক্রাইম সেকশন থেকে পাঠানো হয়েছিল গাড়িটা আপনাকে চাপা দেয়ার জন্যে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'গুলিও করেছে আপনাকে লক্ষ্য করেই?'

মাথা নাড়লেন বিলিয়ার্ড। 'গাড়ি চাপা? না। শুধু ভয় দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল ওদের।' একটা সিগারেট ধরালেন। 'নিউ ইয়র্ক থেকে আমার বন্ধুমহল অনুরোধ করেছে, আমি যেন সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিই। ওদের ধারণা, চেষ্টা করলে আমি পারব। আমার নিজেরও সে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বোধহয় সম্ভব নয়। মিলোসেভিচ সরকার চায় না আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন।'

'ভয় দেখানোর জন্যে একজন বন্দিনীকে মেরে ফেলবে?'

'ওটা সম্ভবত অ্যাক্সিডেন্টালি…'

'না,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'গোটা ব্যাপারটা প্ল্যান করে ঘটানো হয়েছে। প্ল্যানটা যে-ই করে থাকুক, বলতেই হবে, তার টাইমিংটা নিখুঁত। আমার ধারণা, আমি যে উদ্দেশ্যে বেলগ্রেডে এসেছি তার সঙ্গে ওই মেয়েটার কোন না কোন সম্পর্ক ছিল। ওর পরিচয় জানতে পারলে…'

'তবে ওরা যে আপনাকে সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে দেখা করতে দিতে চায় না, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'কাল রাতে আপনার হোটেল রূমে যে ছেলেটা খুন হলো, আলভিক নুরানিক, সে কে জানেন?'

'কে?'

'মি. মুর্তজায়েভের ভাগ্নে, তাঁর আপন বোনের ছেলে। সে নিশ্চয়ই আপনাকে কোন মেসেজ দিতে এসেছিল।'

'ওহ্, গড!'

আওয়াজ শুনে গেটের দিকে তাকালেন বিলিয়ার্ড, দেখাদেখি রানাও। গেটের বাইরে একটা অ্যামবুলেন্স এসে দাঁড়িয়েছে। হসপিটাল কর্মীরা তরুণীর লাশ তুলছে স্ট্রেচারে। একটু পর অ্যামবুলেন্সের পিছনে থামল একটা প্রিজন ভ্যান।

'মেসেজ একটা সত্যিই পেয়েছি আমি,' বিড় বিড় করল রানা।

'হোয়াট!'

খুন হবার আগে নুরানিক ওকে কি বলেছে, খুন হবার পর স্লিপারের ভেতর চেম্বারমেইডের রাখা চিরকুটটা কিভাবে পেল, তাতে কি লেখা ছিল, সংক্ষেপে সবই বলল রানা।

শুনে বিলিয়ার্ড বললেন, 'কথাটা দূতাবাসেই আমাদেরকে বলা উচিত ছিল, মি. রানা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'দুঃখিত, আমাকে শুধু আপনাকেই বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে, আর কাউকে নয়।'

লাইনটা খুব ধীরে এগোচ্ছে।

'সেক্ষেত্রে,' গলা খাদে নামিয়ে বিলিয়ার্ড বললেন, 'খুলে বলুন তো কি

উদ্দেশ্য নিয়ে বেলগ্রেডে এসেছেন আপনি।'

'সাঈদ মুর্তজা জাতিসংঘে খবর পাঠিয়েছেন, টপ সিক্রেট একটা ডকুমেন্ট আছে তাঁর কাছে, সেটা বিশ্বস্ত কারও মাধ্যমে পাচার করতে চান।'

'টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট? পাণ্ডুলিপি নয়?'

'হয়তো পাণ্ডুলিপিও?'

'ডকুমেন্টে কি আছে?'

'তা তিনি জানাননি।'

'ওটা যে তাঁর কাছে আছে, কর্তৃপক্ষ কি তা জানে?'

'অন্য এক সূত্র থেকে জানা গেছে, হপ্তাদুয়েক আগে হঠাৎ গভীর রাতে সাঈদ মুর্তজার বাড়িতে তল্লাশী চালিয়েছে সিক্রেট পুলিস। তবে কিছু পায়নি।'

'তারমানে কর্তৃপক্ষ কিছু সন্দেহ করেছে,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা মিলছে না।'

'কি মিলছে না?'

'আপনার জন্যে একটা মেসেজ নিয়ে নুরানিক যখন মি. মুর্তজায়েভের বাড়ি থেকে বেরুল, পুলিস তাকে সার্চ করল না কেন? কিংবা যখন সে সিটি শেরাটনে ঢুকছিল?'

প্রশ্নটা রানাকেও চিন্তিত করে তুলেছিল। অনেক ভেবে মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে সে নিজের মনে। ওর ধারণা, মুর্তজায়েভ জানেন ছেলেটি বাড়ি থেকে বেরোলেই তাকে সার্চ করা হবে, তাই তাকে শুধু কয়েকটা কথা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আর চেম্বারমেইডের কাছে দিয়েছিলেন চিরকুট। সার্চ করে কিছু না পেয়ে পিছু নেয়া হয়েছিল ছেলেটির, মেসেজ দেয়ার মুহূর্তে খুন করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাখ্যা এড়িয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল। 'এরমানে কি বেলগ্রেড পুলিস মরিয়া হয়ে উঠেছে? ওরা কি সাঈদ মুর্তজাকেও খুন করতে পারে?'

'মি. মুর্তজায়েভ গোটা বলকানে অসম্ভব জনপ্রিয়,' মাথা নেড়ে বললেন বিলিয়ার্ড। 'সরকার এত বড় ঝুঁকি নেবে না। খুন করা সম্ভব নয় বলেই তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। আমার ধারণা, নুরানিককেও সিক্রেট পুলিস খুন করেনি।'

'পুলিস ছাড়া আরও সংস্থা আছে, বিনা বিচারে মানুষ মারে?'

'অসংখ্য।'

লাইনটা ইতিমধ্যে ছোট হয়ে এসেছে। ওদের সামনে আর মাত্র তিন-চারজনকে দেখা যাচ্ছে। লাইনের শেষ মাথায় একটা কাঁচ ঘেরা সেন্ট্রি-বক্সে বসে আছে একজন লোক। সিভিল ড্রেসে রয়েছে সে, চেহারায় কর্তৃত্বের ছাপ। তার পাশে নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেন্ট্রি। ওদের পিছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা একটা স্টেনগান। স্টেনগানের পাশে চৌকো একটা বোর্ড, বোর্ডের গায়ে অনেকগুলো তামার চাকতি ঝুলছে। প্রতিটি লোকের আইডি কার্ড পরীক্ষা করে দেখছে চেয়ারে বসা লোকটা। সে অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেই শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফর্ম দিচ্ছে সেন্ট্রি। তাতে উল্লেখ করতে হবে কি কাজে হেডকোয়ার্টারে এসেছে সে। সবশেষে তামার একটা চাকতি পাবে সে। কাজ

সেরে হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে যাবার সময় এই সেন্ট্রি-বক্সেই ফেরত দিতে হবে সেটা।

'খুব কড়াকড়ি দেখা যাচ্ছে,' বিড়বিড় করল রানা।

'হ্যাঁ,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'প্রায় প্রতি মাসেই আত্মঘাতী বোমা নিয়ে ভেতরে ঢুকছে গোপন রাজনৈতিক দলের ক্যাডাররা। সেজন্যেই গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢোকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

ওদের পালা এসে গেল। কাঁচ মোড়া খাঁচার ভেতর; ডেস্কের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা সেন্ট্রির সঙ্গে কথা বলছেন বিলিয়ার্ড, হাতে আইডি কার্ড। লোকটার পিছনে, স্টেনগানের পাশে, চেয়ারে বসা তালগাছের মত অস্বাভাবিক লম্বা লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। লোকটা অসম্ভব রোগাও বটে। ঠোঁটের উপর খুব ঘন ও চওড়া গোঁফ। সরু মুখটাকে ওপর-নিচে দু'ভাগ করে রেখেছে যেন গোঁফটা। মুখটা যেন ওপর-নিচে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল, মাঝখানে চওড়া গোঁফ সেঁটে কোন রকমে এক করে রাখা হয়েছে। শুকনো একটা ক্ষতচিহ্ন রয়েছে মুখে—ডান চোখের নিচ থেকে শুরু, নাকের পাশ ও গোঁফের নিচ দিয়ে চলে এসেছে চিবুক পর্যন্ত। লোকটার বাম হাত নার্ভাস ভঙ্গিতে স্টেনগানের ব্যারেলে আঙুল বোলাচ্ছে। রানা দ্বিতীয়বার তাকাতে চোখাচোখি হলো। বোঝা যায় কি যায় না, অতি সামান্য নড়ে উঠল চোখের পাতা, সে যেন চিনতে পেরেছে রানাকে। রানা তাকিয়ে আছে দেখে দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে নিল। তবে গোঁফের ফাঁকে ক্ষীণ বিদ্রূপাত্মক এক চিলতে হাসি দেখতে পেল রানা। আঙুলগুলো এখনও স্টেনগানের গায়ে, তবে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

'কি আশ্চর্য! এতক্ষণ লাইনে থাকার পর শুনতে হচ্ছে আরেক লাইনে দাঁড়াতে হবে!'

খাঁচার ভেতর বসে থাকা লোকটার দিকে এখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে রানা। রাগ যেন একের পর এক ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ছে ওর শরীরে। অনুভব করল টান পড়ছে পেশিতে, ও যেন একটা হিংস্র প্রাণী, শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যে ওর দিকে আবার তাকিয়েছে লোকটা, তারপর আর দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না। সে-ও সতর্ক চোখে পরীক্ষা করছে ওকে। তার পেশীতেও টান পড়ছে দেখে সন্তুষ্টি বোধ করল রানা। স্টেনগানের ব্যারেল থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে, আঙুলগুলো এখন টাইয়ের নট ঢিল করতে ব্যস্ত।

লাইন থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটছে ওরা, বিলিয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'ডিপ্লোম্যাটদেরও এরা লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য করে? তার ওপর ইচ্ছেমত এক লাইন থেকে আরেক লাইনে পাঠায়? আপনারা প্রতিবাদ করেন না?'

খানিকটা বিব্রত দেখাল বিলিয়ার্ডকে। 'ভিড় বেশি হয় বলেই লাইনের ব্যবস্থা। গেস্টদের জন্যে আলাদা লাইন, সেটা বিনা নোটিসে জায়গা বদল করেছে।' রানার দিকে তাকাতে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল তাঁর। 'কি ব্যাপার বলুন তো, আপনার চোখ লাল কেন?'

রানা বলল, 'একটু পরে তাকান। সেন্ট্রিবক্সে একটা লোক বসে আছে।'

দাঁড়িয়ে পড়লেন বিলিয়ার্ড, সিগারেট ধরাবার ছলে বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। 'হ্যাঁ, দেখলাম,' বিড়বিড় করলেন তিনি।

'ওই লম্বা লোকটাই নুরানিককে খুন করেছে বলে আমার বিশ্বাস।'

অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা গলায় বিলিয়ার্ড জানতে চাইলেন, 'আপনি শিওর?'

'না। আমার বেডরুমে আলো খুব কম ছিল। তবে খুনীর সঙ্গে এই লোকটার আকার-আকৃতির আশ্চর্য মিল রয়েছে।'

'লোকটা কার্চিক জোড়ার যমজ ভাই জর্জিক জোড়া, এবং ওর সমস্ত দুষ্কর্মের সহকারী,' বলেই পিছন ফিরলেন বিলিয়ার্ড। 'আসুন, ড. সিডাক কি বলেন শোনা যাক।'

উঠানের দ্বিতীয় লাইনটা ইতোমধ্যে অদৃশ্য হয়েছে, সেন্ট্রিবক্সের সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তামার চাকতি নিয়ে এলিভেটরে চড়ল ওরা, চারতলার করিডরে বেরিয়ে এসে দেখল দু'জন সশস্ত্র প্রহরী অপেক্ষা করছে। তারাই ওদেরকে পুলিস চীফের চেম্বারে পৌঁছে দিল।

বড় একটা কামরা; ফার্নিচার থেকে শুরু করে ওয়ালপেপার, দরজা-জানালার পর্দা, এমন কি ফ্লাওয়ার ভাস পর্যন্ত ধবধবে সাদা—শুধু রিভলভিং চেয়ারে ড. সিডাক নীল সুট পরে আছেন। কুশল বিনিময়ের পর গেটে কি ঘটে গেছে তার একটা বর্ণনা দিলেন বিলিয়ার্ড। তিনি থামতে তরুণীর পরিচয় জানতে চাইল রানা।

ড. সিডাককে গম্ভীর ও চিন্তিত দেখাচ্ছে। ধীরেসুস্থে একটা চুরুট ধরালেন। 'সেন্ট্রিবক্স থেকে রিপোর্ট পাবার পর একজন ইন্সপেক্টরকে ঘটনাটা তদন্ত করে দেখতে বলেছি আমি,' বললেন তিনি। 'আমাদের পলিটিক্যাল সেকশন বলছে, এ-ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না।' একটু থেমে রানার দিকে তাকালেন। 'কেউ বোধহয় আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে, আপনি যাতে সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে দেখা না করেই যুগোস্লাভিয়া ছেড়ে চলে যান।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে মেয়েটাকে কেন খুন করা হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি মনে করি তার পরিচয় জানাটা খুবই জরুরী।'

চুরুটে ঘন ঘন টান দিয়ে মুখের সামনে ধোঁয়ার একটা মেঘ তৈরি করলেন ড. সিডাক। 'তাহলে সব কথা খুলেই বলতে হয়। কদিন আগে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে টপ সিক্রেট একটা ডকুমেন্ট চুরি গেছে। চুরিটা করেছে ফটোস্ট্যাট মেশিনের একজন অপারেটর। সব মিলিয়ে সাতটা ফটোস্ট্যাট করা কাগজ। কিন্তু মেশিন অপারেটরের বাড়িতে তল্লাশী চালিয়েও কপিগুলো পাওয়া যায়নি। তাকে ইন্টারোগেট করে কোন লাভ হয়নি—মারা গেল, তবু মুখ খুলল না। আমরা আরও জানতে পারি, ডকুমেন্টটা যেদিন চুরি যায় সেদিন সন্ধের দিকে মিসেস মুর্তজায়েভ ওই লোকের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাই ওঁদের বাড়িটাও সার্চ করা হয়। কিন্তু কপিগুলো পাওয়া যায়নি।'

ঘরের ভেতর নীরব উত্তেজনা।

'লোকটার সঙ্গে তার স্ত্রীকেও পলিটিক্যাল সেকশনে ধরে আনা হয়,' নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ড. সিডাক। 'গত দু'হপ্তা ধরে ইন্টারোগেট করা হয়েছে তাকে, কিন্তু

কোন লাভ হয়নি। আজ তাকে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে জেল-হাজতে পাঠানো হচ্ছিল।'

রানা ও বিলিয়ার্ড নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

'আপনাকে আমি সরাসরি একটা প্রশ্ন করি, মি. রানা,' ড. সিডাক বললেন। 'আপনি কি ওই ডকুমেন্টটা নিতেই যুগোস্লাভিয়ায় এসেছেন?'

পুলিস চীফের চোখে চোখ রেখে রানা বলল, 'পাল্টা একটা প্রশ্ন করে জবাবটা দিতে চাই আমি, মি. সিডাক। ধরুন, সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে আমার দেখা করার সুযোগ হলো। এ-ও ধরুন, ফটোস্ট্যাট করা কপিগুলো তাঁর কাছে আছে, আমাকে তিনি সেগুলো দিলেনও। তারপর আমি কি ওগুলো নিয়ে যুগোস্লাভিয়া থেকে বেরিয়ে যেতে পারব? আপনাদের পুলিস বিভাগ কি সে সুযোগ আমাকে দেবে?'

'না। বেলগ্রেড সীল করে দেয়া হয়েছে, একটা পিঁপড়েও গলতে পারবে না।'

'কাজেই,' মৃদু হেসে বলল রানা, 'আমাকে এ-ধরনের প্রশ্ন করা স্রেফ সময়ের অপচয়।'

ও থামতেই বিলিয়ার্ড অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। 'আলভিক নুরানিক নামটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। কে সে, চেনেন নাকি?'

ক্ষীণ একটু হাসলেন ড. সিডাক, সেই সঙ্গে তাঁর চশমার কাঁচ ঝিক করে উঠল। 'হয়তো সাধারণ কোন ছিঁচকে চোর, বিদেশী ট্যুরিস্টের কামরায় ঢুকে কিছু চুরি করতে চেয়েছিল। ছিঁচকে চোর বলেই পুলিসের তালিকায় তার নাম পাওয়া যায়নি। সিটি শেরাটনে এ-ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে।'

'চুরি করতে এসে খুন হয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, আমি শুধু চুরি হওয়ার কথা বলছি। খুন হয়ে যাওয়াটা সত্যি বিস্ময়কর। এমনও হতে পারে চোরের সঙ্গে তার বন্ধু ছিল। সেই বন্ধুই তাকে খুন করেছে।'

বিলিয়ার্ড জানতে চাইলেন, 'আপনারা কি মি. রানার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনছেন, ড. সিডাক?'

'তদন্ত চলছে, কাজেই এখুনি কিছু বলতে পারছি না,' আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন পুলিস চীফ। 'তবে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ওঁকে আমরা নিরপরাধ বলেই গণ্য করব।'

'ধন্যবাদ,' এতক্ষণে স্বস্তিবোধ করলেন বিলিয়ার্ড, প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালেন। 'এবার অন্য প্রসঙ্গ। যে জন্যে মি. রানা যুগোস্লাভিয়ায় এসেছেন। ওঁর কাছে লেখক-সাহিত্যিকদের একটা তালিকা আছে। আমি জানি, লেখক সংঘই তাঁদের সঙ্গে ওঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তার আগে লেখক সংঘকে পুলিসের অনুমতি পেতে হবে, তাই না?'

'লেখক সংঘের দফতর সম্পাদিকা লিলিয়ান তো প্রায়ই ব্রিটিশ দূতাবাসে যায়, আপনার সঙ্গে তার সম্পর্কও খুব ভাল,' বললেন ড. সিডাক। 'তাকে ধরুন না, সেই সবার সঙ্গে মি. রানার পরিচয় করিয়ে দেবে।'

কথা না বলে চুপ করে আছে রানা, বিস্মিত হলেও বুঝতে দিচ্ছে না।

'তার সঙ্গে কোথায় দেখা করব? আপনার বাড়িতে?' জিজ্ঞেস করলেন

বিলিয়ার্ড।

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন পুলিস চীফ, তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনারা বরং কাল ওকে ওর অফিসে ধরুন। কিংবা, আজ যেহেতু রোববার, ওকে ওদের ফ্ল্যাটেই পাবেন।'

মীটিং আছে, তাই সম্মানীয় অতিথিদের আপ্যায়ন করা গেল না, এ-কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন ড. সিডাক। বিদায় নিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল ওরা। নিচের উঠানে নেমে প্রথম সেন্ট্রিবক্সে উঁকি দিল রানা, কিন্তু কালো কোট পরা তালগাছকে সেখানে দেখা গেল না।

'ড. সিডাক রাতে বললেন, মি. মুর্তজায়েভের সঙ্গে দেখা হবে না, অথচ এখন তিনি নিজেই বলে দিলেন কিভাবে দেখা করতে হবে, ব্যাপারটা কেমন হলো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কারণটা আপনিও জানেন,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'ড. সিডাক চাইছেন টপ সিক্রেট ডকুমেন্টটা আপনিই সাঈদ মুর্তজার বাড়ি থেকে বের করে আনুন।'

'এ বি সি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমাকে তাঁর বাড়িতে ঢোকার অনুমতি দেয়া হবে। তিনি আমাকে ডকুমেন্টটা দেবেন। তারপর পুলিস ওটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে?'

'হ্যাঁ। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। পুলিস এমন কি ডকুমেন্ট নিয়ে আপনাকে সীমান্ত পর্যন্ত যেতেও দিতে পারে, ধরবে একেবারে শেষ মুহূর্তে। রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য পাচার করার অভিযোগে সাঈদ মুর্তজায়েভ ও আপনাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করতে কোন অসুবিধেই হবে না।'

'হুম।' দু'জন একই ধারায় চিন্তা করছে, বুঝতে পেরে গম্ভীর হয়ে গেল রানা।

বিলিয়ার্ড বিড়বিড় করে বললেন, 'ব্যাপারটা নিয়ে মি. ফোলির সঙ্গে আলাপ করতে হবে।'

'মি. ফোলির সঙ্গে আলাপ করতে হবে? কেন? তিনি কি আপনার বস্?'

'না, ঠিক তা নয়, তবে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে জানানো দরকার।'

'নুরানিক আমাকে মেসেজ দিতে এসেছিল, এটাও তাঁকে বলবেন নাকি?'

'বলতে আমি বাধ্য, মি. রানা। এটা আমার ডিউটি।'

'তিনি আপনার বস্ নন, অথচ সব কথা তাঁকে আপনি বলতে বাধ্য, ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝলাম না, মি. বিলিয়ার্ড।'

চেহারায় অস্বস্তি, বিলিয়ার্ড বললেন, 'আমাদের দূতাবাসে এ-ধরনের পরিস্থিতি তিনিই সামলান। এরবেশি আপনাকে কিছু বলতে পারছি না।'

'বেলগ্রেডে মার্কিন দূতাবাস নেই, তবে শুনেছি সিআইএ এজেন্ট আছে,' বলল রানা। 'ইনিই কি তিনি?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বিলিয়ার্ড বললেন, 'সত্যি দুঃখিত। তবে সব কথাই তাঁকে আমার জানাতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে যদি কিছু বলেন, তা-ও। এখানে আপনি কাউকেই বিশ্বাস করতে পারেন না, মি. রানা। এমন কি আমাকেও না,' শেষ দিকে কর্কশ হয়ে উঠল তাঁর গলার স্বর।

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রানা। 'লেখক সংঘের দফতর সম্পাদিকা লিলিয়ানের সঙ্গে ড. সিডাকের কি সম্পর্ক? আপনি ড. সিডাকের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন কেন?'

'ড. সিডাকের মেয়ে আর লিলিয়ান নোভা সমবয়েসী, পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'নিরাপত্তাজনিত কি একটা সমস্যা আছে, তাই ড. সিডাকের বাড়িতেই থাকে নোভা। শুধু ছুটির দিনগুলো নিজের ফ্ল্যাটে যায়।'

'আজ কি তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার দু'দিক ভাল করে দেখে নিলেন বিলিয়ার্ড। 'আপনি কি চান নোভার সঙ্গে কথা বলার সময় আমিও উপস্থিত থাকি?'

'কি কথাবার্তা হয় আপনি যাতে মি. ফোলিকে রিপোর্ট করতে পারেন?'

খোঁচাটা নীরবে হজম করলেন বিলিয়ার্ড।

'না, আমি একাই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই.' বলল রানা।

'ঠিক আছে,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'তবে খুব সাবধানে থাকবেন, মি. রানা। ভুলে যাবেন না, আপনি আসলে ক্ষুরের ওপর দিয়ে হাঁটছেন।'

চার

রোলেক্স রিস্টওয়াচে বিকেল চারটে, স্যুইট থেকে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। সরাসরি উল্টোদিকে ছোট্ট একটা অ্যালকোভ স্যালন, লাল লাউঞ্জ চেয়ারে দু'জন লোক মুখোমুখি বসে আছে, পায়ের কাছে একজোড়া ব্রিফকেস। কপাল ঢাকা হ্যাট দুটো সামান্য একটু নড়ল কি নড়ল না, দেখেও না দেখার ভান করে স্যুইটে তালা লাগাল রানা, করিডর ধরে সিঁড়ির দিকে এগোল। দু'জোড়া চোখ অনুসরণ করছে ওকে, পিঠে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো। তবে কিছু ঘটল না, নিরাপদেই নিচের লাউঞ্জে নেমে এল ও।

লাউঞ্জে ইউনিফর্মের ছড়াছড়ি। হোটেলের নতুন ও পুরানো বোর্ডার, তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসা লোকজন আর স্টাফের পরিচয়-পত্র চেক করছে পুলিস অফিসাররা। গায়ে ইউনিফর্ম নেই, অথচ সঙ্গে অস্ত্র আছে, এমন কিছু লোককেও ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। এরাও সম্ভবত সিক্রেট পুলিসের সদস্য, পলিটিক্যাল ক্রাইম সেকশনে কাজ করে। রানাকে দেখে লোকগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। তবে কেউই সরাসরি ওর দিকে তাকাচ্ছে না। একজনকে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে নিচু গলায় কথা বলতে দেখল রানা।

চাবিটা ডেস্কে জমা রেখে লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল ও। সামনেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, ওর সম্মতি নিয়ে পোর্টার হাত তুলতেই লাইনের প্রথম গাড়িটা এগিয়ে এল। ধাপ ক'টা দ্রুত টপকে ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরল সে, দ্বিতীয়বার স্যালুট করল রানাকে। তার হাতে একশো দিনারের একটা নোট গুঁজে দিয়ে গাড়িতে

উঠল রানা। ট্যাক্সি চলতে শুরু করেছে, রাস্তার আরেক পাশের পার্কিং এরিয়া থেকে স্টার্ট নিল কালো একটা মার্সিডিজ।

হোটেল থেকে লিলিয়ান নোভার ফ্ল্যাট গাড়িতে বারো মিনিটের পথ। ফেউটাকে খসাবার জন্যে ছ'মিনিটের মাথায় জেনারেল সুদভিক এভিনিউয়ে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল রানা। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে যেতে রাস্তা পেরুল, পিছু নেয়া মার্সিডিজ এখনও বাঁক ঘোরেনি। একটা দোকানের কাঁচে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে ও।

মার্সিডিজ নয়, বাঁক ঘুরল একটা লোক। গায়ে কালো লেদার জ্যাকেট, হাতে চকলেট রঙের ব্রিফকেস। রাস্তা পেরোয়নি, সে-ও একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শো-কেসের কাঁচে চোখ রেখে ওকে লক্ষ করছে।

ফুটপাথ ধরে হাঁটা ধরল রানা, মাথায় প্রাসঙ্গিক দুশ্চিন্তা। ঝুঁকি নিতে হবে জানত, কিন্তু ভাবেনি বেলগ্রেডে পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি এরকম জটিল হয়ে উঠবে। সিক্রেট পুলিস প্রায় নিশ্চিতভাবে জেনে ফেলেছে যুগোস্লাভিয়ায় কেন এসেছে ও। তারাই এখন চাইছে রানা সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে দেখা করে টপ সিক্রেট ডকুমেন্টটা বের করে আনুক। বেলগ্রেড যখন সীল করে দেয়া হয়েছে, ডকুমেন্ট নিয়ে এখান থেকে কিভাবে পালাবে ও? তার ওপর, ওকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে, সম্ভব হলে সাঈদ মুর্তজায়েভকেও যুগোস্লাভিয়া থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে। এই উত্তপ্ত ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে কিভাবে তা সম্ভব!

মাথা ঘামাও, উপায় একটা বেরুবেই। তবে তার আগে ফেউটাকে খসাও।

এ-গলি ও-গলি ধরে দশ মিনিট হাঁটল রানা। কালো লেদার জ্যাকেট পিছু লেগে আছে জোঁকের মত। এই মুহূর্তে চওড়া একটা রাস্তায় রয়েছে ও, রাস্তার বাম পাশে উঁচু পাথুরে পাঁচিল, ডান পাশে বাড়ি-ঘর। আরও খানিক এগোতে ডান পাশে একটা গলির মুখ। রানা জানে, এই গলির ভেতরই লিলিয়ান নোভার ফ্ল্যাট। গলিটায় না ঢুকে পঞ্চাশ গজ সোজা এগোল রানা, আরেক গলির মুখে পৌঁছে ইতস্তত করতে লাগল, যেন পথ হারিয়ে দিশেহারা বোধ করছে। তারপর ঘুরে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দু'তিন পা এগোল। লোকটা এখন ওর মুখোমুখি, বিশ গজ সামনে—রানাকে ফিরে আসতে দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে। পাশেই একটা একতলা বাড়ির বন্ধ দরজা ও কলিংবেল। হাত তুলে বোতামে চাপ দিল সে। জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ফোল্ডার বের করছে, দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল এক মহিলা। হাতের ফোল্ডারটা দেখিয়ে তাকে কিছু বলল লোকটা। মহিলা সরে দাঁড়াতে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল সে। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

সুযোগটা সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগাল রানা। নির্জন রাস্তা ধরে ছুটল, পঞ্চাশ গজ পেরিয়ে এসে ঢুকে পড়ল প্রথম গলিটায়। লোকটা সম্ভবত ভুয়া বীমা কোম্পানির দালাল সেজেছে, এখনও বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসেনি।

ঠিকানা মিলিয়ে লিলিয়ান নোভার ফ্ল্যাট বাড়িটা খুঁজে বের করতে রানার কোন অসুবিধে হলো না, তবে লোহার গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর পথ আগলে দাঁড়াল যমদূতের মত প্রকাণ্ডদেহী দু'জন সশস্ত্র পুলিস গার্ড। দু'জনের হাতেই বাগিয়ে ধরা স্টেন গান।

'আমি মাসুদ রানা, ব্রিটিশ সাবজেক্ট,' ওদেরকে বলল রানা। 'লিলিয়ান নোভার সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

প্রথম গার্ড তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল, 'মাসুদ রানা?'

দ্বিতীয় গার্ড মাথা ঝাঁকিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'আইডি, প্লীজ।'

পরিচয়-পত্রটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল সে, ফিরিয়ে দিয়ে ছোট করে মাথা ঝাঁকিয়ে আবার বলল, 'সোজা তিনতলায় চলে যান।'

তিনতলায় উঠে এসে কলিংবেল বাজাল রানা। দরজা খুলল পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছরের এক তরুণী, কোমরে আঁটসাঁট জিনস আর গায়ে টি-শার্ট। 'মি. রানা?' হাসিমুখে জানতে চাইল। রানা মাথা ঝাঁকাতে একপাশে সরে দাঁড়াল। 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

দরজা টপকে ভেতরে ঢুকল রানা। মেয়েটির পিছু নিয়ে ছোট্ট একটা করিডর পেরুল, তারপর কারুকাজ করা দরজা দিয়ে মাঝারি আকারের একটা কামরায় ঢুকল। খোলা জানালা দিয়ে পাহাড়, বনভূমি আর নদী দেখা যাচ্ছে। একটা সোফা দেখিয়ে ওকে বসতে অনুরোধ করল মেয়েটি, বলল, 'আমি ওর বান্ধবী, সিলভিয়া। আপনি আরাম করে বসুন, লিলিয়ান হাতের কাজটা শেষ করেই আপনার সঙ্গে দেখা করবে। আপনাকে চা দিতে বলব, নাকি কফি?'

'কফি চলতে পারে, ধন্যবাদ।' মেয়েটি চলে যেতে চোখ ঘুরিয়ে কামরাটা দেখছে রানা। একদিকে দেয়াল জুড়ে বুকশেলফ, বইপত্রে ঠাসা। সারা ঘরে পেইন্টিং আর স্কাল্পচার ছড়িয়ে আছে। ফ্রেমে আটকানো কিছু ক্যানভাস দেয়ালে ঝুলছে, কিছু বুকশেলফে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। এক কোণে একটা ইজেল দেখা গেল, ক্যানভাসের রঙ এখনও শুকায়নি। বেশিরভাগ ছবিতেই প্রকৃতির সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস।

স্কাল্পচারগুলো ধাতব মূর্তি। ছোট-বড় সব আকৃতিরই আছে। খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিরূপ—কারখানার শ্রমিক, কৃষক, মাঝি, সশস্ত্র সৈনিক। মার্শাল টিটোর আবক্ষ মূর্তিটা রাখা হয়েছে নিচু টেবিলে। বিশেষ করে একটা স্কাল্পচার রানার দৃষ্টি কেড়ে নিল। প্রায় দু'ফুট উঁচু সেটা, রাখা হয়েছে ফায়ারপ্লেসের মাথায়। ব্রোঞ্জের কাজ, হাঁটুর ভাঁজ খুলে সিধে হতে যাচ্ছে এক স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন পুরুষ। তার মাথা দৃঢ় ঘাড়ের উপর পিছন দিকে হেলানো, তাকিয়ে আছে আকাশ বা স্বর্গপানে।

সোফা ছেড়ে উঠে এল রানা, মূর্তিটা ভাল করে দেখছে। নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে বুঝতে পারল, অসম্ভব ভারী।

'উনি আমার বাবা।'

মিষ্টি কণ্ঠ, বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ। শুনে এমন চমকে উঠল রানা, আরেকটু হলে হাত থেকে মূর্তিটা ফেলে দিত। কিছু বলার আগে মূর্তিটা সাবধানে রেখে দিল ও, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। সাদা জিনসের ট্রাউজার পরেছে মেয়েটি, গায়ে ঢোলা ম্যাগাজিন শার্ট। মুখ তাজা একটা ফুল বললেই হয়, কোন রকম প্রসাধন ব্যবহার করেনি। দীর্ঘ কালো চুলকে বিশাল একটা বেণী করে কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে আনা হয়েছে, শেষ প্রান্ত হাঁটু ছুঁতে চায়। 'মিস লিলিয়ান নোভা?' জিজ্ঞেস

করল মন্ত্রমুগ্ধ বানা।

ছোট করে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। একপাশে সরে গেল সে, মধ্যবয়স্কা এক মহিলাকে পথ করে দিল। হাতের ট্রেটা নিচু একটা টেবিলে রেখে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

'একজন ফলো করছিল, তাই পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গেল।' মেয়েটি এত সুন্দরী, রানা চোখ ফেরাতে পারছে না।

'ফলো করছিল?' নোভার চোখে কৌতুক ঝিক্ করে উঠল। 'নিশ্চয়ই কোন মেয়ে?' রানার মুগ্ধদৃষ্টি চোখ এড়ায়নি ওর।

'আরে না!' রানা অনুভব করল গরম হয়ে উঠছে ওর মুখ। 'ইউনিফর্ম না থাকলেও, লোকটা সম্ভবত সিক্রেট পুলিসই হবে। হাতে একটা ব্রিফকেস ছিল।'

পট থেকে কাপে কফি ঢালার সময় ঘাড় ফিরিয়ে বারবার রানাকে দেখছে নোভা। কি একটা আকর্ষণ সে-ও যেন এড়াতে পারছে না। 'হ্যাঁ, পুলিসই হবে। এটা একটা পুলিসী রাষ্ট্র, মি. রানা।' হঠাৎ করেই চোখের হাসি নিভে গেল, সেখানে ফুটে উঠল সন্ত্রস্ত একটা ভাব।

'আপনি কি কোনও কারণে ভয় পাচ্ছেন, মিস নোভা? কোন রকম বিপদের মধ্যে আছেন?'

'শুধু নাম ধরলেই হবে, মি. রানা,' বলল নোভা। 'কেন, আপনি জানেন না? যুগোস্লাভিয়ায় সবাই আমরা বিপদের মধ্যে আছি। এমন কি বিদেশীরাও, আপনিও বিপদ মুক্ত নন।' রানার হাতে একটা কাপ ধরিয়ে দিল। 'আপনার পৌঁছাতে দেরি হয়েছে, এদিকে আমিও আপনাকে বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি। আসলে হপ্তায় এই একটা দিনই শুধু স্কাল্পচার আর পেইন্টিং নিয়ে কাজ করার সুযোগ পাই তো!'

'ছুটির দিনে আজ তাহলে আপনাকে বিরক্তই...'

'না-না, আমি একটুও বিরক্ত হচ্ছি না!' তাড়াতাড়ি বলল নোভা। 'বরং আপনি আসায় একটু বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পেলাম।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে, মায়াভরা চোখে বিষাদের ছায়া। 'বলুন তো, আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি।'

'যুগোস্লাভিয়ার নামকরা লেখক-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই আমি,' বলল রানা। 'তাঁরা যদি নিজেদের কোন লেখা লন্ডন থেকে ছাপতে চান, আমি তার ব্যবস্থা করব। ব্রিটিশ দূতাবাসের মি. বিলিয়ার্ড ও বেলগ্রেড পুলিস চীফ ড. সিডাকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ওঁরাই বললেন, ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করেছেন আপনি, আপনার অনুবাদের হাতও খুব ভাল, প্রয়োজনে আপনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারবেন।'

'বাবা মারা যাবার পর, বাবার ওই দুই বন্ধুই আমার ভাল-মন্দ সব কিছু দেখাশোনা করছেন,' বলল নোভা। 'স্বভাবতই ওঁরা আমার একটু বেশি প্রশংসা করেন। তবে অনুবাদের কাজ পেলে সত্যি আমি খুশি হব। তা আপনি ঠিক কার কার সঙ্গে দেখা করতে চান, মি. রানা? আপনার কাছে কোন তালিকা আছে?'

'মিস্টারটা বাদ দিতে পারেন,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, তালিকা একটা আছে বটে।

কিন্তু ভাবছি আমি কি আমার পছন্দ মত যে-কোন লেখকের সঙ্গে দেখা করতে পারব?'

'আপনি আসলে জানতে চাইছেন, দেখা করার পুলিসী অনুমতি পাবেন কিনা, এই তো?' ক্ষীণ হাসি ফুটল নোভার ঠোঁটে। 'আপনি আসলে ভাগ্যবান, রানা। সিডাক আঙ্কেলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আনঅফিশিয়াল হলেও, তিনি অনুমতি দিয়েছেন। আপনি প্রথমে কার সঙ্গে দেখা করতে চান বলুন, আমি ব্যবস্থা করছি।'

'যতটুকু বুঝতে পারছি, সাঈদ মুর্তজায়েভ সম্পর্কে সবাই কমবেশি স্পর্শকাতর,' বলল রানা। 'প্রথমে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়?'

রানার মুখোমুখি একটা সোফার হাতলে বসেছিল নোভা, কথাটা শুনে উঠে দাঁড়াল সে, নিঃশব্দে ঘুরে খোলা জানালার দিকে এগোল। কামরার ভেতর অস্বস্তিকর নীরবতা জমাট বাঁধছে। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে নোভা, তা সত্ত্বেও তার আড়ষ্ট ভাবটা রানার দৃষ্টি এড়ায়নি। ওর মনে হলো, কি একটা আবেগ চেপে রাখার জন্যে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে মেয়েটা।

ও কিছু বলতে যাবে, জানালার দিকে পিছন ফিরল নোভা, বলল, 'সারাটা দিন ঘরে বসে কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি। আপনার আপত্তি না থাকলে চলুন না বাইরে থেকে একটু হেঁটে আসি?'

রানা ইতস্তত করছে। 'বাইরে...'

এগিয়ে এল নোভা। জোর করে হলেও, আবার হাসছে। 'আপনি কি আমাদের ক্যালেমেগডান দেখেছেন? দেখে না থাকলে সুযোগটা হাতছাড়া করবেন না, কারণ আমার মত ভাল গাইড আর জীবনে আপনি না-ও পেতে পারেন।'

অগত্যা রাজি হলো রানা। এখুনি আসছি বলে কামরা থেকে এক রকম ছুটেই বেরিয়ে গেল নোভা। পাঁচ মিনিট পর আবার যখন ফিরল, বেলী ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে উঠল কামরার বাতাস। 'চলুন,' ফিসফিস করে তাগাদা দিল সে।

সেন্টের নামটা আর জিজ্ঞেস করা হলো না, তার আগেই নোভার পিছু নিয়ে ঘরে ঢুকল তার সমবয়েসী সেই মেয়েটি, সিলভিয়া। 'আমি কি তোদের সঙ্গে থাকব?' নোভাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'তোর ছবির কাজ তো এখনও শেষ হয়নি,' উত্তরে বলল নোভা। 'তাছাড়া, ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার অফিশিয়াল আলাপও আছে।' রানার হাত ধরে টান দিল সে, দরজার দিকে এগোচ্ছে।

করিডর হয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সিঁড়ি বেয়ে নামছে, দরজা থেকে সিলভিয়া বলল 'বেশি দূরে কোথাও যাবি না, নোভা। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরবি, কেমন? আর, হ্যাঁ, গার্ডদেরও সঙ্গে নে।'

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়ল নোভা, ঘুরে বলল, 'এত ভয় নিয়ে কি বাঁচা যায়, তুইই বল? নিজের ইচ্ছামত একা কোথাও হাঁটতেও পারব না?'

ম্লান মুখে চুপ করে থাকল সিলভিয়া।

'ভয় নেই, আমার কিছু হবে না,' গলা নরম করে আবার বলল নোভা। 'দশ্চিন্তায় না ভুগে, যা, নিজের কাজটা শেষ কর।'

'না, বলছিলাম কি, সাবধানের মার নেই...' শুরু করল সিলভিয়া।

তাকে থামিয়ে দিয়ে নোভা বলল, 'আমি সাবধানেই থাকব, সিলভিয়া। তাছাড়া, একাও তো যাচ্ছি না।' হঠাৎ হেসে উঠল সে। 'প্রয়োজনে উনি আমাকে অবশ্যই রক্ষা করবেন। কি, করবেন না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!' কিছু একটা বলতে হয় তাই বলা। 'নিরস্ত্র অবস্থায় যতটুকু সম্ভব আর কি।' রানা হাসছে না।

সিলভিয়াকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রানাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গেল নোভা। তবে বাড়ির গেটে আবার তাকে বাধা দেয়া হলো। সশস্ত্র গার্ডরা একা তাকে বেরুতে দিতে রাজি নয়। তাদেরকে রীতিমত চোখ রাঙিয়ে নোভা বলল, 'পুলিস চীফের মেয়ে সিলভিয়ার নির্দেশও তোমরা অমান্য করবে? অবশ্য চাকরির মায়া না থাকলে আমার কিছু বলার নেই।'

রানাকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল নোভা। গার্ড দু'জন অসহায় ভঙ্গিতে ভেতরেই দাঁড়িয়ে থাকল।

রাস্তায় পা দিয়েই প্রথমে রানা কালো লেদার জ্যাকেটের খোঁজে তাকাল এদিক ওদিক। ফাঁকা রাস্তা, কেউ কোথাও নেই। তবু স্বস্তিবোধ করছে না। গলিটা পার হয়ে খোলা মাঠে পৌঁছাল ওরা, আড়াআড়িভাবে পার হচ্ছে সেটা। রানা শুনছে কিনা খেয়াল নেই নোভার, আপনমনে কথা বলে যাচ্ছে। বেলগ্রেড শহরে থাকছে বটে, কিন্তু এটা তার পছন্দের শহর নয়। প্রাচীন শহর বেলগ্রেড, ওল্ড টাউনের প্রতিটি ভবন কমপক্ষে দেড়শো বছরের পুরানো। তারই পাশে নিউ টাউনকে কংক্রিট আর কাঁচের জঙ্গল বললেই ভাল মানায়। এখানে প্রাণ নেই, শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই। নোভার আদর্শ শহর কোটর। মন্ট্রিনিগ্রোর ওই শহরেই তার জন্ম। পাথুরে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নিরাপদ আশ্রয়। মা-বাবা মারা যাবার পরও পৈত্রিক বাড়িটা বিক্রি করেনি সে, মাঝে মধ্যে লম্বা ছুটি পেলে বেড়িয়ে আসে।

নোভা একটু থামতেই রানা জানতে চাইল, সে তো ড. সিডাকের বাড়িতেই থাকে, তাই না? কেন?

প্রশ্ন শুনে আবার শুরু করল নোভা। আজ যেন তাকে কথা বলার নেশায় পেয়েছে। নোভার মা-বাবা ও ড. সিডাক, সবাই ওঁরা মন্ট্রিনিগ্রোর পডগোরিকায় পরস্পরের প্রতিবেশী ছিলেন। নোভার বয়স যখন মাত্র ছয়, ওর বাবা খুন হন। সিলভিয়া, ড. সিডাকের মেয়ে, সেই ছোটবেলা থেকেই নোভার বান্ধবী। দু'জনে একই স্কুলে লেখাপড়া করত। বাবা মারা যাবার দু'বছর পর মাকেও হারাল নোভা। তিনি ক্যান্সারে মারা যান। নোভা তখন বেলগ্রেডে নিজেদের ফ্ল্যাটেই ছিল, চাচা-চাচীর সঙ্গে। সে-সময় ড. সিডাক পুলিস ইন্সপেক্টর ছিলেন। বাবা ও মা মারা যাবার পর নোভার নিরাপত্তা নিয়ে সঙ্কট সৃষ্টি হয়। কি ধরনের সঙ্কট, নোভা তা ব্যাখ্যা করল না। শুধু জানাল, ড. সিডাক তাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যান। সেই থেকে সিলভিয়ার সঙ্গেই আছে সে। সিলভিয়ার লেখাপড়া মাঝপথে থেমে গেলেও, একটা ফ্যাশন হাউস দাঁড় করিয়ে ভালই রোজগার করছে সে। আর নোভা কলেজে দু'বছর পড়ার পর লন্ডনে চলে যায়, অক্সফোর্ড থেকে

মাস্টার্স করে দেশে ফিরে চাকরি নিয়েছে। সিডাক আংকেল তার থাকা-খাওয়া আর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন, সেজন্যে নোভা তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। অজ্ঞাতপরিচয় আরও এক ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ সে। তিনিই নোভার লেখাপড়ার সমস্ত খরচ বহন করেছেন। এ তথ্য সিডাক আঙ্কেলই দিয়েছে তাকে। ভদ্রলোক বাবার বন্ধু, নোভা শুধু এটুকুই জানে। তাঁর আসল পরিচয় সিডাক আংকেলও নাকি জানেন না।

তারপর এক সময় খুব লজ্জা পেল নোভা, বলল, 'ছি-ছি, আমি শুধু নিজের কথাই বলে যাচ্ছি! এবার আপনি বলুন, রানা। কে আপনি? আমার···কোত্থেকে এলেন?'

আমার···কোত্থেকে এলেন? নোভার প্রশ্নটা নিয়ে চিন্তা করছে রানা। 'আমার' বলার পর মেয়েটা বিরতি নিল কেন? ও কি বলতে চেয়েছে, 'আমার জীবনে কোত্থেকে এলেন?' আশ্চর্য এক বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল রানার মন। আকর্ষণটা যে একতরফা নয়, এটা মানতেই হবে। প্রথম দর্শনেই দু'জনের রক্ত-মাংসের মেকানিজম কোথাও ক্লিক করেছে। একেই হয়তো বলে অনুকূল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু পরস্পরের প্রতি আরও দুর্বল হয়ে পড়ার আগে, এখনই লাগাম টেনে ধরা দরকার, তা না হলে দু'জনকেই পস্তাতে হতে পারে। বেলগ্রেড সম্ভবত দু'জনের জন্যেই বিপজ্জনক কারাগার। এখানে বিপদ হলো নগ্ন বাস্তবতা। কঠিন সত্য হলো আকস্মিক মৃত্যু। স্থান-কাল-পাত্র, সবই ভুল। 'আমি ক্ষুদ্র একজন মানুষ,' দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল রানা। 'নিজের সম্পর্কে বলার তেমন কিছুই নেই।'

'আপনি কি সবার কাছেই নিজেকে গোপন রাখেন? নাকি শুধু আমার কাছে লুকিয়ে রাখছেন?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল নোভা। 'আপনার চোখ বলছে আপনি ডসটোয়েভস্কি আর টলস্টয় পড়েছেন। ঠোঁট বলছে, শেক্সপীয়ার মুখস্থ। আপনার গলার আওয়াজ শুনে মনে হয় সমুদ্রকে শাসন করার ক্ষমতা রাখেন। তারপরও বলবেন আপনি ক্ষুদ্র? আর আমি তা বিশ্বাস করব?' রানাকে কেমন যেন থতমত খেয়ে যেতে দেখল সে। ফলে হেসে উঠল। 'কি জানি আজ আমার কি হয়েছে! কারও সঙ্গেই কথা বলি না, এত কথা তো নয়ই। জানি না কি ভাবছেন আপনি। ভুলে যান, প্লীজ। আসুন, কাজের কথা বলি।'

'নোভা, আমি জানতে চেয়েছি সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব কিনা,' বলল রানা। 'কিন্তু প্রশ্নটা শুনে আপনি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন।'

'ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা ভুলে থাকাই ভাল,' বিড়বিড় করল নোভা। 'হ্যাঁ, তার সঙ্গে আপনার দেখা হবে। লিখিত সরকারী অনুমতি কাল সকালে আপনার হোটেলে পাঠিয়ে দেব আমি। সঙ্গে বাড়ির ঠিকানাও থাকবে।'

'আমি একা যাব, আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন না?' জানতে চাইল রানা।

'সম্ভব হলে থাকতাম, কিন্তু সম্ভব নয়,' বলল নোভা, গলার স্বর কেমন যেন কঠিন শোনাল। 'না, সম্ভব নয়। প্লীজ, এ-ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করবেন না।'

এরপর দু'জনেই চুপ করে গেল। তালটা যেন কেটে গেছে।

ক্যালেমেগডান পাহাড়শ্রেণীর ঢালে চড়লে দানিয়ুব আর সাভা নদীর সঙ্গমস্থলটা

পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। বেলগ্রেডকে ধ্বংস করার জন্যে কয়েকশো বছর ধরে বারবার এই উঁচু এলাকাটি দখল করার চেষ্টা হয়েছে: হামলা করেছে গথ, কেল্ট, রোমান, তুর্কী, হ্যাঙ্গেরিয়ান, অস্ট্রিয়ান ও নাৎসীরা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বেলগ্রেডকে কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ বার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সার্বদের গোঁয়ার্তুমিই এই সব আক্রমণের প্রধান কারণ ছিল। বেলগ্রেড চিরকালই ক্ষুদ্র জাতি সত্তাকে দাবিয়ে রেখে শোষণ করতে চেয়েছে। এ-সব কথা রানাকে বলার সময় নোভার গলায় ক্ষোভ আর জেদ প্রকাশ পেল। প্রাসঙ্গিকভাবেই নোভার হাতে গড়া ব্রোঞ্জ মূর্তিটার কথা মনে পড়ে গেল রানার—সিধে হয়ে দাঁড়াবার সংগ্রাম করছে।

পার্কে প্রচুর গাছ, কিন্তু প্রায় সবগুলোই ন্যাড়া। কুয়াশা কেটে যাওয়ায় অনেক লোকই বেড়াতে এসেছে। আশপাশে পুলিস না থাকলেও, তরুণ সৈনিকদের দলবেঁধে ঘুরে বেড়াতে দেখল রানা। ওদের সঙ্গে তরুণীরাও আছে। পিকনিক পার্টির সঙ্গে এসেছে গৃহবধূ আর শিশুরা। একটা বেঞ্চও খালি নেই, সব দখল করে নিয়েছে বুড়ো-বুড়িরা।

মন্ট্রিনিগ্রো চিরকালই স্বাধীন একটা দেশ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে, কিন্তু সার্বিয়া সব সময় চেষ্টা করেছে দেশটাকে কিভাবে গ্রাস করা যায়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে ঘুষ দিয়ে সার্ব ব্যবসায়ী আর রাজনীতিকরা মন্ট্রিনিগ্রোর খাস জমি, বনভূমি, লেক, পাহাড় ইত্যাদি লীজ নিয়েছে। নব্বুই সালে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট নিজে কিনে নিয়েছেন কোটর ও বাডভা এলাকার বিশাল জঙ্গল, সেখানে তিনি প্রতি বছর বন্যপ্রাণী শিকার করতে যান। এমন কি মাছ ধরার অধিকার থেকেও ইদানীং বঞ্চিত করা হচ্ছে স্থানীয় জেলেদের, সার্ব ব্যবসায়ীরা ইজারার নামে সাগরকে ভাগ করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে।

ঢাল বেয়ে ক্যালেমেগডান রিজ-এ উঠে এল ওরা। চারপাশে তাকিয়ে খানিকটা হকচকিয়ে গেল রানা, সেটা লক্ষ করে খিলখিল করে হেসে উঠল নোভা। 'জানতাম আপনি অবাক হবেন,' হাসতে হাসতেই বলল সে। 'সত্যি কথা বলতে কি, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখাবার জন্যেই এখানে আপনাকে নিয়ে এসেছি।'

ওদের আগেই চূড়ায় উঠে এসেছে অনেকে। জোড়ায় জোড়ায় আরও উঠছে। সবাই তারা তরুণ-তরুণী, পরস্পরের হাত ধরে ছুটোছুটি করছে। ব্যস্ততার কারণটা একটু পরেই বুঝতে পারল রানা। ক্যালেমেগডানের চূড়ায় অসংখ্য গুহা দেখা যাচ্ছে, সেই গুহা কে কার আগে দখল করবে তারই প্রতিযোগিতা চলছে। প্রতিটি গুহার ভেতর পাথরের তৈরি বেঞ্চ আছে, সেই বেঞ্চে বসে গল্প করছে তরুণ-তরুণীরা। গুহার চেয়ে সংখ্যায় বেশি যুগল প্রেমিক-প্রেমিকারা, ফলে যারা দেরি করে এসেছে তাদেরকে প্রাইভেসি পাওয়ার জন্যে বোল্ডারের আড়ালে সরে যেতে হলো। ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বোলাচ্ছে নোভা আর রানা। 'বলতে পারবেন, কি ঘটছে এখানে?'

কি বলবে বুঝতে পারছে না রানা। পার্কে পরস্পরের হাত ধরে হাঁটতে দেখা গেলেও, কেউ কাউকে জড়িয়ে ধরেনি বা চুমোও খায়নি। কিন্তু চূড়ায় ওঠার পর গুহায় ঢুকে তরুণীদের আদরে আদরে অস্থির করে তুলছে তরুণরা।

'ক্যালেমেগডান প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলনমেলা,' বলল নোভা। 'আমি তোমাকে ভালবাসি, এই কথাটা বলার জন্যেই এখানে আসে ওরা। দূরে তাকান, দেখুন হালকা কুয়াশার ভেতরও দানিয়ুব আর সাভাকে দেখা যাচ্ছে—পরস্পরের সঙ্গে যেখানে মিশেছে সেখানে কি আলোড়ন আর উচ্ছ্বাস!'

চারপাশে, আড়ালে-আবডালে, অসংখ্য যুগলবন্দী মানুষ, কিন্তু পরিবেশটা শান্ত ও নিস্তব্ধ—বলা যায় পবিত্র।

'এখানে সাধারণত কেউ একা আসে না,' আবার বলল নোভা। 'প্রায় সবার সঙ্গেই থাকে তার মনের মানুষ।'

'আপনি তো আগেও এসেছেন, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই কেউ ছিল···কে সে?'

'বেলগ্রেডে আমি বন্দিনী, রানা,' বলল নোভা। 'দেহরক্ষীদের উপস্থিতিতে প্রেম করার সুযোগ কোথায়? যতবার এসেছি, আমার সঙ্গে সিলভিয়া ছিল। আজ আপনাকে দেখে কি যে হলো আমার, কোথেকে যেন বিদ্রোহ করার সাহস আর শক্তি পেয়ে গেলাম। একা এই প্রথম আমাকে ছাড়ল ওরা···'

'কেন, আপনাকে এভাবে পাহারা দিয়ে রাখার কারণ কি?'

'ওরা চায় না আমার কোন বিপদ হোক,' বলল নোভা। 'সিডাক আঙ্কেল আর সিলভিয়ার কথা বলছি।'

'যদি অনধিকার চর্চা না হয়, জানতে পারি, ঠিক কি ধরনের বিপদ আশঙ্কা করা হচ্ছে?'

'আমাদের পারিবারিক এক শত্রু আছে,' ম্লান সুরে বলল নোভা। 'সুযোগ পেলে সে আমাকে কিডন্যাপ করতে পারে। অন্তত সবাই তাই বলে আর কি। তবে থাক, এ-প্রসঙ্গ থাক। আপনি নিজের সম্পর্কে বলুন। জানেন, আমার সত্যি খুব কৌতূহল হচ্ছে।'

'এভাবে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কোথাও বসা যায় না?'

হাত নেড়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল নোভা। 'এখন আর কিছু করার নেই, রানা, আমরা দেরি করে ফেলায় সব গুহাই দখল হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, এমন কি বোল্ডারের আড়ালগুলোও।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দু'জনেই ওরা হেসে উঠল। তারপর, আবার রানার হাত ধরে টান দিল নোভা, বলল, 'আসুন, ওদিকে একটা রেস্তোরাঁ আছে।'

ঢাল বেয়ে খানিকটা নেমে এল ওরা, তারপর একটা গুহাতেই ঢুকল। পাথুরে দেয়াল ঘষে মসৃণ করা হয়েছে, নিচু ছাদ ফলস সিলিঙে ঢাকা। পাঁচ-ছ'টা টেবিল, বিশ-পঁচিশটা চেয়ার। এক কোণে ছোট্ট একটা বার। গুহাটা বেশ বড়, ফাঁকা জায়গায় জোড়ায় জোড়ায় নাচছে ছেলেমেয়েরা। কাউন্টারের পাশে একটা অটোমেটিক গ্রামোফোন বা জুকবক্স, আমেরিকান জ্যায বাজছে।

এক ধারের একটা টেবিল দখল করল ওরা, জানালা দিয়ে সাভা নদীর ওপর নৌকা দেখা যাচ্ছে। ওয়েটারের সঙ্গে নোভাই কথা বলল। একটা প্লেটে খোসা ছাড়ানো বাদাম আর দু'কাপ কফি দিয়ে গেল সে।

সঙ্গীত বা নাচ, কোনটাই সহ্য করার মত নয়। পুরনো, ঘষা রেকর্ড থেকে

জ্যায নয়, যেন আহত পশুর মরণ আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে। আর নাচের বদলে চলছে পরস্পরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। ওয়েটারকে ডেকে জুকবক্সটা বন্ধ করতে বলল নোভা।

জুকবক্স থামতে রেস্তোরাঁ প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। মুখোমুখি বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল ওরা। বিকেল শেষ হতে চলল, গোধূলির ম্লানিমা বিশ্বচরাচরে গভীর বিষাদের ছায়া ফেলছে। রানা ভাবছে, দুনিয়ার বুকে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটে। পরস্পরকে ওরা চেনে না, মাত্র পরিচয় হয়েছে, অথচ দু'জনেই ব্যাকুল হয়ে চাইছে নিজেকে মেলে ধরতে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। অলঙ্ঘনীয় কোন নিষেধ চুপ করে থাকতে বাধ্য করছে নোভাকে। আর কর্তব্যের খাতিরে মুখ খুলতে পারছে না রানা।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে ওরা দেখল ভারী মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে চাঁদ। ঢাল বেয়ে নামার সময় খেয়াল করল রানা, গোটা এলাকা ইতিমধ্যে প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। এঁকেবেঁকে নেমে গেছে পাহাড়ী পথ, খুব বেশি খাড়া অংশে ধাপ তৈরি করা আছে। এরকম এক প্রস্থ সিঁড়ির মাথা থেকে নিচে নামতেই কালো লেদার জ্যাকেটকে দেখতে পেল ও। সরাসরি বা স্পষ্ট নয়, আবছা ছায়ার মত। এক সেকেন্ড পর আরও একটা ছায়া দেখতে পেল—সেই লম্বা তালগাছ, জর্জিক জোড়া। এখনও দূরে ওরা, তবে এদিকেই আসছে।

প্রথমেই নোভার কথা ভাবল রানা।

সিঁড়ির নিচে দু'ভাগ হয়ে গেছে পথ। ডান দিকে মসজিদের উঁচু মিনার দেখা যাচ্ছে, বাম দিকে চার্চের আকাশ ছোঁয়া টাওয়ার। তালগাছ আর লেদার জ্যাকেট ডান দিক থেকে আসছে। বাম দিকের পথটা খাদ আর ড্রব্রিজ-এর দিকে চলে গেছে, দূরে দেখা যাচ্ছে দুর্গ-প্রাকার। নোভার কনুই খামচে ধরে ড্রব্রিজ-এর দিকে ছুটল রানা, হিসহিস করে বলল, 'দৌড়ান! ভাব দেখান আমাকে আপনি চেনেন না! যান, পালান!'

দৌড়াবে কি, নোভার পায়ে যেন শিকড় গজাল। 'কেন পালাব?' জোড়া ছায়ামূর্তি সে-ও দেখতে পেয়েছে। 'ওরা কি আমাকে ধরার জন্যে আসছে?'

'না। আমাকে।'

'কিভাবে বুঝলেন?'

'এটা তর্ক করার সময় নয়। দৌড়ান!' নোভার পিঠে ধাক্কা দিল রানা। কিন্তু নড়ল না সে।

ইতিমধ্যে অবশ্য দেরি হয়ে গেছে। পিছু হটে সিঁড়ির মাথায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ পঁচিশটা ধাপ টপকাবার আগেই ওদেরকে ধরে ফেলবে লোক দুজন। ওদিকে ডানদিকের পথ ছেড়ে ঢাল বেয়ে বাম দিকের পথে উঠে এসেছে তালগাছ। নোভাকে নিয়ে কয়েক পা এগোল রানা, চার্চের পাশে এসে ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ফেলে আসা রেস্তোরাঁ থেকে আবার সেই আহত পশুর আর্তনাদ ভেসে আসছে। এবার তার সঙ্গে যোগ হয়েছে গিটার আর ছন্দবদ্ধ হাততালির আওয়াজ। ছায়া দুটো অলস ভঙ্গিতে দু'দিকের পথ ধরে এগিয়ে আসছে। মুহূর্তের জন্যে মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ, সাদাটে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে

উঠল অনুসরণকারীদের মুখ। লেদার জ্যাকেট গোলগাল আকৃতির, মুখটা ভরাট। তালগাছের সরু মুখটা দু'ভাগ করে রেখেছে পুরু গোঁফ। আজ সকালে এই লোককেই পুলিস হেডকোয়ার্টারের কাঁচমোড়া সেন্ট্রিবক্সে দেখেছিল রানা, কোন সন্দেহ নেই।

ছায়া দুটো ওদের কাছ থেকে বারো ফুট দূরে এখন, অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। প্রফেশনাল, তাই তাড়াহুড়ো করছে না। চাঁদটা আবার মেঘের আড়ালে লুকিয়েছে, রানা জানে গাঢ় ছায়ার ভেতর ওকে তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই, তবে সেটা বুঝতে দিতে চায় না ও। জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরার সময় একটু বেশি নড়াচড়া করল, শত্রুরা যাতে দেখতে পায় ওকে। বড়সড় ওয়ালেটটা বের করে আনল পকেট থেকে, সেই সঙ্গে জুতোর গোড়ালি দিয়ে বাড়ি মারল চার্চের পাথুরে দেয়ালে। দূর থেকে কালো লেদার কেসটাকে আগ্নেয়াস্ত্র বলে মনে হতে পারে, আর পাথরে লাথির আওয়াজটাকে মনে হতে পারে সেফটি ক্যাচ অফ করার শব্দ। ডান হাতের তালুতে ওয়ালেটটা এমনভাবে ধরল রানা, যেন ওটা একটা পিস্তল।

থমকে দাঁড়াল দুই শত্রু, তবে মুহূর্তের জন্যে মাত্র। রিভলভারটা যেন জর্জিক জোড়ার বাহুর বর্ধিত অংশ, এইমাত্র গজিয়েছে। লেদার জ্যাকেট চকলেট রঙের ব্রিফকেস খুলতে ব্যস্ত। ঠিক এই সময় রানার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। লেদার জ্যাকেটের মুখে ভারী ওয়ালেটটা ধাঁ করে বসিয়ে দিল, খসে পড়তে দেখে ছোঁ দিয়ে ধরে ফেলল ব্রিফকেস, কোন বিরতি ছাড়াই দেহভঙ্গি বদলে ছুঁড়ে দিল সেটা তালগাছের মুখ লক্ষ্য করে। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করল জর্জিক, ব্রিফকেসটা তার নাকে লেগেছে। তাল হারিয়ে ফেলল সে, এই সুযোগে তার অরক্ষিত গর্দানে হাতের কিনারা দিয়ে প্রচণ্ড এক কোপ মারল রানা।

খক্-খক্ করে কাশছে জর্জিক, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে, তারপরও চেষ্টা করছে হাতের অস্ত্র রানার দিকে তুলতে। লাথি চালাল রানা, জুতোটা লাগল লোকটার কব্জিতে। পাথুরে জমিতে পড়ে খটাখট আওয়াজ তুলল রিভলভার। রানা ঘুরে দাঁড়াবে, কিন্তু তার আগেই ওর পিঠে চড়াও হলো লেদার জ্যাকেট, হাতের ভাঁজে ওর গলাটা আটকে ফেলেছে, অপর হাতে চুল টানছে। রানার মনে হলো, চুল সহ খুলিটা মাথা থেকে খসিয়ে আনতে চেষ্টা করছে ব্যাটা। বিস্ফারিত চোখে দেখল রিভলবারটার খোঁজে অন্ধকার পথটা হাতড়াচ্ছে জর্জিক।

রিভলবার পেয়ে গেল সে। সিধে হতে যাচ্ছে, তীক্ষ্ণকণ্ঠে 'ইউ বাস্টার্ড' বলে রানাকে পাশ কাটাল নোভা। লাথি মারল সে, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল জর্জিক। রানা পিছন দিকে কনুই চালাতে প্রায় একই সঙ্গে লেদার জ্যাকেটও 'কোঁক' করে উঠল, তার পাঁজরের একটা হাড় নির্ঘাত ভেঙে গেছে।

হাড় ভাঙলেও, রানার গলাটা সে ছাড়ল না। লোকটার পায়ে ডান পায়ের জুতোটা ঠুকল রানা, যেন হাতুড়ি মারছে। গলা থেকে হাতটা সরে গেল এবার। ঘুরেই লোকটার তলপেটে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল ও। ছিটকে পড়ে গেল লেদার জ্যাকেট।

রিভলবারটা ধরার জন্যে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে তালগাছ, তাকে পাশ

কাটিয়ে সেটায় লাথি মারল নোভা, সাহায্যের আশায় চিৎকার করছে। পথের কিনারা থেকে খাদে নেমে গেল অস্ত্রটা। একলাফে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে নোভার চিবুকে ঘুসি মারল লোকটা। হোঁচট খেতে খেতে পিছিয়ে এল নোভা, তাকে ধরার জন্যে সামনে হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে সে। ধাক্কা দিয়ে নোভার পতনটা দ্রুত করল রানা, তারপর একলাফে তালগাছের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রাণপণ শক্তিতে ডানহাতের কিনারা দিয়ে ব্যাকস্ট্রোকের প্রচণ্ড এক কোপ মারল ও লোকটার কানের নিচে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, দু'হাত দিয়ে গলার পাশটা চেপে ধরেছে জর্জিক। লম্বা চুল এক হাতের মুঠোয় ধরল রানা, অপর হাতের উভয় পিঠ দিয়ে ঠাস ঠাস করে চড় মারছে—শব্দগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছে আলভিক নুরানিক আর মধ্যবয়স্কা চেম্বারমেইডের কথা।

চিৎকারটা শুনে চমকে উঠল রানা। নোভা বিপদে পড়েছে মনে করে তালগাছকে ছেড়ে ঘুরল ও। ভেবেছিল লেদার জ্যাকেট আবার হামলা করেছে বুঝি, কিন্তু লেজ তুলে তাকে পালাতে দেখল ও। ধাপ বেয়ে তরতর করে নেমে আসছে কয়েকজন তরুণ, তাদের সঙ্গে একজন সৈনিকও আছে। নোভাকে তারা চেনে, তার চিৎকার শুনে রেস্তোরাঁ থেকে ছুটে আসছে। ইতিমধ্যে ঢাল বেয়ে নিচে নেমে গেছে লেদার জ্যাকেট, শহরের আলো-আঁধারির ভেতর হারিয়ে গেল সে। নোভাকে ঘিরে দাঁড়াল তরুণরা। রানা তাদের দিকে পিছন ফিরল।

ইতিমধ্যে সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছে জর্জিক জোড়া। এক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। 'পরের বার তোমাকে আমি খুন করব, মাসুদ রানা! পারলে ঠেকিয়ো!' হিসহিস করে বলল লোকটা। দ্রুতপায়ে নামছে সিঁড়ি বেয়ে।

'সে সুযোগ তুমি পাবে না!' বলেই তাকে ধরার জন্যে এগোল রানা। কিন্তু উত্তর শোনার জন্যে অপেক্ষা করেনি লোকটা, অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে এরইমধ্যে। কয়েক পা এগিয়ে কোথাও তাকে দেখতে পেল না ও। পিছন থেকে কাতর কণ্ঠে ওকে ডাকছে নোভা। 'রানা! রানা!' ওয়ালেটটা দেখতে পেয়ে তুলে নিল রানা, তারপর ঘুরে নোভার দিকে এগোল।

তরুণরা ওদেরকে খানিকটা এগিয়ে দিচ্ছে। একজন বলল, 'নিশ্চয়ই ওরা গুণ্ডা! আপনার বান্ধবীকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিল।'

ড্রব্রিজে পৌঁছে তরুণদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় করে দিল নোভা। ব্রিজের ওপর এই মুহূর্তে ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। 'এভাবে আমার সঙ্গে বেরুনো আপনার উচিত হয়নি,' নোভাকে বলল রানা। 'অন্তত সঙ্গে একটা অস্ত্র থাকা উচিত ছিল।'

'ওটা কি দেখুন তো, ওতে সম্ভবত অস্ত্র আছে,' বলে হাত তুলে কিছু একটা দেখাল নোভা।

ব্রিজের ওপর হাঁটু গাড়ল রানা। ব্রিফকেসটা দেখেই চিনতে পারল। লেদার জ্যাকেটের হাতে ছিল। কিন্তু খুলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, কোথাও আটকাচ্ছে। আছাড় দিতে গিয়েও মত পাল্টাল। ফলে প্রাণ বাঁচল ওর কিংবা ওদের। ব্রিফকেসের ওপর আদর করে হাত চাপড়াল রানা, ওটা যেন একটা কুকুর। নোভাকে পাশে নিয়ে আবার হাঁটছে ও, হাতে ব্রিফকেস।

বারজাকলি মসজিদের কাছে এসে ট্যাক্সি পেল ওরা। মোয়াজ্জিনের ঝুল-বারান্দায় আলো নেই। মিনারের চূড়ার পাশে আধখানা চাঁদ। পথে কোন কথা হলো না।

সিটি শেরাটনের সামনে ড্রাইভারকে থামতে বলল রানা। ভাড়া মিটিয়ে নামতে যাবে, ওর হাত ধরে নোভা ফিসফিস করে বলল, 'না, প্লীজ, আপনি যাবেন না!'

ফ্ল্যাটবাড়ির গেটেই খবর পেল ওরা; নোভার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে সিলভিয়া চলে গেছে। রানাকে নিয়ে সরাসরি নিজের বেডরূমে চলে এল নোভা। তার তাগাদায় সংলগ্ন বাথরূমে ঢুকে গরম পানি দিয়ে মুখ-হাত ধুলো রানা। ফিরে এসে দেখল, ইতিমধ্যে কাপড় পাল্টেছে নোভা, ওর জন্যে ধূমায়িত কফি নিয়ে অপেক্ষা করছে।

বিছানায় পাশাপাশি বসল ওরা। একটু নাটকীয় ও আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতেই নোভা বলল, 'আপনি সত্যি আমাকে মস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, রানা; সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না,' বিনয়ের অবতার সাজল রানা। 'বিপদে পড়া অপূর্ব সুন্দরী মেয়েদের সাহায্য করা আমার একটা বদভ্যাস।'

'তাই?' নোভা হাসছে না। 'ওরা কারা বলুন তো? ঠিক কি চাইছিল?'

'জানি না। সম্ভবত ড. সিডাকের লোক। অন্তত সিক্রেট পুলিস তো বটেই।'

মাথা নাড়ল নোভা। 'না। ওরা সিডাক আঙ্কেলের লোক নয়।'

'কি করে বুঝলেন? ওরা আপনাকেও খুন করতে চাইছিল, তাই দেখে?'

'আপনার এ-কথার মানে?' ভুরু কোঁচকাল নোভা।

'অস্বীকার করে লাভ নেই, নোভা–আপনি নিজেও ড. সিডাকের হয়ে কাজ করছেন। তিনি বিশ্বাস করে আমাকে আপনার হাতে তুলেও দিয়েছেন। আপনার কাজ আমাকে নজরে রাখা, তাই না?'

'আপনি আমাকে অপমান করছেন, রানা। তবে আমি গায়ে মাখছি না। আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। ওরা দু'জন আর আমি যদি সিডাক আঙ্কেলের লোক হই, ওরা তাহলে আমার গায়ে হাত তুলবে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ব্যাপারটা অভিনয়ও হতে পারে। ধাপ্পা। আপনার ওপর আমার বিশ্বাস জাগাবার কৌশল। কিংবা ওরা হয়তো এমন কি এ-ও চেয়েছিল...' থেমে গেল ও।

'কিংবা ওরা হয়তো আমার সর্বনাশ করতে চেয়েছিল...?'

'শুনুন, ওরা আমাদের কাউকে খুন করতে চেয়েছে, এ আমি বিশ্বাস করি না,' বলল রানা। 'অন্তত আজ সন্ধ্যায় সে ইচ্ছা নিয়ে ওরা আসেনি। তবে এক পর্যায়ে পরিস্থিতি ওদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছিল। আজ সকালেও ওরা আমার সামনে একটা মেয়েকে খুন করেছে। তখনও ইচ্ছে করলে আমাকে ওরা মেরে ফেলতে পারত, কিন্তু মারেনি। ক্যালেমেগডানেও ঠিক তাই ঘটেছে। ওরা লুকিয়ে থেকে গুলি করলে আমাদের কিছু করার ছিল? কিন্তু তা ওরা করেনি।'

'তাহলে কি চাইছে ওরা?'

'ভয় দেখাতে।'

'কেন?'

'কেন আপনি তা ভাল করেই জানেন,' বলল রানা। 'পুলিশের ধারণা, সাঈদ মুর্তজায়েভের কাছে টপ সিক্রেট একটা ডকুমেন্ট আছে, আমি এসেছি যুগোস্লাভিয়া থেকে সেটা পাচার করে নিয়ে যেতে। ওরা ভয় দেখাচ্ছে, আমি যাতে পালাবার চেষ্টা না করে ডকুমেন্টটা পেয়ে ওদের হাতে তুলে দিই।'

বিছানা ছেড়ে বেডরুমের আরেক প্রান্তে চলে গেল নোভা, ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে ডায়াল করল দ্রুত। 'আঙ্কেল' শব্দটা রানার কানে ঢুকল। তিন-চার মিনিট কথা বলল নোভা, তারপর ফোন রেখে দিয়ে ফিরে এল রানার কাছে। 'ক্যালেমেগডানে কি ঘটেছে বললাম সিডাক আঙ্কেলকে। উনি বলছেন, ওরা তাঁর লোক নয়।'

রানা কিছু বলল না।

'কাল দুপুর দুটোয় সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট,' আবার বলল নোভা। 'সিডাক আঙ্কেল বলছেন, কোন লিখিত অনুমতির দরকার নেই। গার্ডদের বলা থাকবে, আপনাকে তারা ভেতরে ঢুকতে বাধা দেবে না। আপনি যে যাচ্ছেন, সাঈদ মুর্তজায়েভকে আগেই তা জানিয়ে দেয়া হবে।' থেমে দম নিল সে। 'উনি হয়তো আপনাকে একটা পাণ্ডুলিপি দেবেন, রানা।'

কথা না বলে অপেক্ষা করছে রানা। আশা করছে নোভা আরও কিছু বলবে।

'কি লেখা হয়েছে তা না জেনে আমরা চাই না তাঁর ওই পাণ্ডুলিপি ছাপা হোক।'

'আমরা মানে আপনি আর ড. সিডাক?'

'আমরা মানে যুগোস্লাভিয়া সরকার।'

'উনি কি শুধুই একটা পাণ্ডুলিপি দেবেন আমাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'টপ সিক্রেট কোন ডকুমেন্ট নয়?'

'উনি যা-ই দিন, আমাকে আপনি তা দেখতে দেবেন,' বলল নোভা।

'এতক্ষণে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন,' বলল রানা, ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপ।

আহত দেখাল নোভাকে। 'এটা আমার কর্তব্য, রানা,' ম্লান সুরে বলল সে। 'আমি চাই না কেউ আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাবুক।'

'ডকুমেন্টটায় কি আছে তুমি জানো?' অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞেস করল রানা। একটা হাত রাখল নোভার পিঠে।

'না।'

'ধরো, ওটা মারাত্মক এক ষড়যন্ত্রের নীল-নক্সা, গুরুতর কোন অপরাধের পরিকল্পনা। দেখার পর কি করবে তুমি?'

'আমাকে তুমি পরীক্ষা করছ,' নোভার কণ্ঠে অভিমান।

'কি করবে, নোভা? চেপে যাবে? একটা ভয়ঙ্কর ক্রাইম হতে যাচ্ছে জেনেও ওটা ফিরিয়ে দেবে সরকারকে?'

'জিজ্ঞেস করছ আমি কি করব। তার আগে বলো, তুমি কি করবে?'

'আমি দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেব,' বলল রানা। 'তোমার কাছে স্বীকার করতে আপত্তি নেই, ঠিক সেজন্যেই যুগোস্লাভিয়ায় এসেছি আমি।'

'এখানেই আমার আপত্তি, রানা,' বলল নোভা। ঝুঁকে হাত বাড়াল সে, রানার গালে আঙুল বোলাল। আঙুলগুলো কাঁপছে। 'আমি জানি ওটা নিয়ে যুগোস্লাভিয়া ত্যাগ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। ওরা তোমাকে খুন করে ফেলবে।'

'ভুলে যেয়ো না, ঝুঁকি আছে জেনেও এসেছি আমি। পারব কিনা জানি না, তবে আমাকে চেষ্টা করতে হবে। তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো, আমার সফল হবার সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে যাবে, নোভা।'

চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, নোভা আরও কাছে সরে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানাকে। 'বাবাকে ওরা খুন করেছে, রানা। আমি চাই না তুমিও…'

নোভার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'আমার ওপর আস্থা রাখো, লক্ষ্মী মেয়ে। আমি জানি, আমাকে অনেক কথা বলার আছে তোমার। কারা তোমার বাবাকে খুন করেছে, কারা তোমাকে কিডন্যাপ করতে চায়, আমার ব্যাপারে ঠিক কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে তোমাকে। কিন্তু আজ অনেক রাত হয়ে গেছে, আমাকে হোটেলে ফিরতে হবে। পরে এক সময় সব শুনব। ইতিমধ্যে মনস্থির করো, তোমার সাহায্য সত্যি আমার দরকার।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল নোভা। ফিরে এল একহাতে তোয়ালে, অপরহাতে একটা পিস্তল নিয়ে। পিস্তলটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এটা রাখো। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে আমি তোমাকে দিয়েছি।'

'আমার ধারণা এই ব্রিফকেসে অস্ত্র আছে,' ইঙ্গিতে পায়ের কাছে পড়ে থাকা ব্রিফকেসটা দেখাল রানা। 'একটা হাতুড়ি পাও কিনা দেখো, খুলে দেখি।'

হাতুড়ির কয়েকটা বাড়ি মারতেই ব্রিফকেসের তালা খুলে গেল। ঢাকনি তুলে ভেতরে তাকিয়েই আঁতকে উঠল নোভা। 'ওহ্, গড!'

ভেতরে তিনটে পিস্তল দেখা যাচ্ছে—একটা বেরেটা, একটা ল্যুগার আর একটা ওয়েবলি-ভিকারস্। প্রতিটি অস্ত্রের জন্যে দুই বাক্স করে অতিরিক্ত অ্যামিউনিশন। ফোমের ওপর শুয়ে রয়েছে একজোড়া আমেরিকান পাইনঅ্যাপল-টাইপ হ্যান্ড গ্রেনেড। এক পাশে পাওয়া গেল ছ'টা ফ্লেয়ার। আরেক পাশে ডিটোনেটর ও টাইমার সহ আধ কেজি জেলিগনাইট, বড় আকারের দু'তিনটে বিল্ডিং উড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

'এগুলো কাজে লাগতে পারে,' বলে কামরার চারদিকে তাকাল রানা। 'ব্রিফকেসটা যদি তোমার ওয়ার্ড্রোবের পিছনের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিই, অ্যাক্সিডেন্টালি কারও দেখে ফেলার ভয় আছে?'

রানার দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল নোভা, তারপর মাথা নাড়ল। 'আমার এই ঘরে কেউ ঢোকে না। কিন্তু এত সব মারাত্মক গোলাবারুদ কি কাজে লাগবে তোমার?'

'এখুনি বলতে পারছি না। শুধু কথা দিতে পারি ব্যক্তিস্বার্থে বা অসৎ কোনও কাজে ব্যবহার করা হবে না। ধরো, তুমি এখানে নেই, আমি ব্রিফকেসটা নিতে

এলাম–আমাকে দেবে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নোভা বলল, 'দেবে, চাচিকে আমি বলে রাখব।'

'ধন্যবাদ। এবার আমার জন্যে টেলিফোনে একটা ট্যাক্সি ডাকো।' ব্রিফকেস থেকে ল্যুগারটা বের করে নিজের বেল্টে গুঁজছে রানা।

'ওরা সার্চ করলে কি জবাব দেবে?' জিজ্ঞেস করল নোভা। 'তারচেয়ে আমার ওয়ালথারটা রাখো তুমি। ল্যুগারটা ব্রিফকেসেই থাক।'

নোভার কথায় যুক্তি আছে। ল্যুগারটা ব্রিফকেসে রেখে দিয়ে তার হাত থেকে ওয়ালথার নিল রানা। নোভা ওকে কিছু অতিরিক্ত অ্যামিউনিশনও এনে দিল।

ওকে ট্যাক্সিতে তুলে দেয়ার জন্যে নিচে নামল নোভা। ট্যাক্সি ছাড়ার আগে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে তুমি আমার সঙ্গে ডিনার খাবে?'

ইতস্তত করছে নোভা। তারপর ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল।

পাঁচ

রাত দশটায় হোটেলে ফিরল রানা। লাউঞ্জে থেমে ডেস্ক থেকে চাবি নেয়ার সময় অর্ডার দিল ওর ডিনার যেন স্যুইটে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে করিডর ধরে নিজের স্যুইটের দিকে এগোচ্ছে, উল্টোদিকের অ্যালকোভ স্যালনে এক লোককে দেখতে পেল। লাল লাউঞ্জ চেয়ারে বসে আছে, শার্টের কলার দিয়ে ঘাড় আর হ্যাট দিয়ে মুখ ঢাকা, সম্ভবত ঘুমাচ্ছে। ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে ওয়ালথারের সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা, অপর হাতে স্যুইটের তালা খুলছে।

'মি. রানা!' ভোঁতা একটা গলা ভেসে এল।

ঘুরে দাঁড়াল রানা, পকেটের ভেতর পিস্তলটা শক্ত করে ধরে আছে। লাল লাউঞ্জ চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো লোকটা। চিনতে পারায় ঢিল পড়ল রানার পেশিতে। দরজা খুলল ও, বিলিয়ার্ডকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

সিটিংরূমের আলো জ্বালতেই ধাক্কা খেলো ওরা। দম আটকে ফিসফিস করলেন বিলিয়ার্ড, 'মাই গড!'

কামরার ভেতর যেন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। সোফা সেট উল্টে ফেলা হয়েছে, মেঝের অর্ধেক কার্পেট গুটানো, ক্লজিট খুলে সমস্ত জিনিস-পত্র ছড়ানো হয়েছে মেঝেতে। ঠিক একই অবস্থা বেডরূমেরও। ওয়ার্ড্রোবের দরজা হাঁ-হাঁ করছে, হ্যাঙ্গার সহ সমস্ত কাপড়চোপড় বিছানায় পড়ে আছে, প্রতিটি বালিশ ছুরি দিয়ে চেরা। এমন কি বাথরূমের মেডিসিন কেবিনেটও তছনছ করা হয়েছে। শেভিং ক্রীম দিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকা হয়েছে আয়নায়। ফ্রেঞ্চ উইন্ডো খুলে বেডরূম থেকে ঝুল-বারান্দায় বেরুলেন বিলিয়ার্ড, একটু পরই হাতে একটা ভারি লোহার বার নিয়ে ফিরে এলেন। বার-এর মাথাটা বাঁকা, বর্শার মত ছুঁচালো। জিনিসটা দেখতে ঠিক যেন একটা লংশোরম্যান-এর লোডিং হুক। 'কোন সন্দেহ নেই, আপনাকে ওরা খুন করতেই এসেছিল,' বলে হাতের বারটা রানাকে দেখালেন

বিলিয়ার্ড।

'ওরা যে কারণেই এসে থাকুক, আপনি কেন এসেছেন তাই বলুন,' বিলিয়ার্ডের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। 'এত রাতে নিশ্চয়ই গল্প করতে নয়?'

বিলিয়ার্ডকে আহত দেখাল। 'আমার সঙ্গে আসুন, হুকটা কোথায় পেয়েছি দেখাই।' তার পিছু নিয়ে অন্ধকার ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। 'শুনুন, ঘরের ভেতর কথা বলা নিরাপদ নয়, ওরা হয়তো আড়িপাতা যন্ত্র রেখে গেছে। আমি এসেছি অফিশিয়াল একটা সিদ্ধান্তের কথা আপনাকে জানাতে। আজ বিকেলে দূতাবাসে একটা মীটিং হয়েছে। স্টাফকে জেমস ফোলি নির্দেশ দিয়েছে, সাঈদ মুর্তজায়েভের লেখা কোন পাণ্ডুলিপি আপনার কাছ থেকে বা অন্য কারও কাছ থেকে যে-ই পাক, পাওয়া মাত্র তার হাতে তুলে দিতে হবে। সে প্রকাশ্যেই বলছে, যুগোস্লাভিয়ায় যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রতিনিধি নেই, তাদের স্বার্থ তাকেই দেখতে হবে। তার ধারণা, সাঈদ মুর্তজায়েভ যে বইটা লিখেছেন তাতে আমেরিকার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হয়েছে, কাজেই তাকে চেষ্টা করতে হবে সেটা যাতে ছাপার মুখ না দেখে।'

'তার স্পর্ধা আমাকে অবাক করছে।'

'আমাকে সে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়ে দিয়েছে, পাণ্ডুলিপিটা পাচার করার জন্যে আমি যেন আপনাকে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ ব্যবহারের সুযোগ না দিই। আপনাকে বলতে বলেছে, পাণ্ডুলিপিটা পেলে আমার মাধ্যমে তার হাতে তুলে দিতে হবে।'

'সে একা নয়, এই একই প্রস্তাব আরও একজন দিয়েছে আমাকে।'

'লিলিয়ান নোভা?'

'হ্যাঁ।'

'আমি অবাক হচ্ছি না,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'আপনি যে কাল সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে দেখা করছেন, ফোলি তা জানে। সে চায়, ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে বেরিয়েই পাণ্ডুলিপিটা আপনি তার হাতে তুলে দেবেন।'

'আবদার, না?'

'মি. রানা, ভাল করে ভেবে দেখুন। পাণ্ডুলিপি বা ডকুমেন্ট, ডিপ্লোম্যাটিক পাউচ ছাড়া কিভাবে ওগুলো আপনি পাচার করবেন?'

রানা উত্তর দেয়ার আগেই নক হলো দরজায়। পরিচয় জেনে নিয়ে দরজা খুলল রানা। ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকে হতভম্ব হয়ে গেল ওয়েটার। একটা টেবিল ও দুটো চেয়ার খাড়া করল সে, টেবিলে দক্ষ হাতে ডিনার সাজাল। বিলিয়ার্ডকে সাধল রানা, তিনি মাথা নাড়তে একাই খেতে বসল। খিদে নষ্ট হয়ে গেছে, সামান্য কিছু মুখে দিয়ে দুটো কাপে কফি ঢালল ও। ইতিমধ্যে ক্যালেমেগডানে কি ঘটেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিল বিলিয়ার্ডকে। ফ্ল্যাটে ফিরে নোভা ড. সিডাককে ফোন করেছিল, এ-কথাও জানাল। তারপর ব্রোঞ্জ মূর্তিটার কথা বলল, তারপর জানতে চাইল, নোভার বাবাকে কারা খুন করেছিল।

'হ্যাঁ, ওটা নিকোলাই সুনজাকের মূর্তি,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'সুনজাককে খুন করেছে কার্চিক জোড়া, ওই লম্বা লোকটার যমজ ভাই।'

'কার সঙ্গে কার কি সম্পর্ক, আমাকে বলবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে জটিল একটা ধাঁধার মত লাগছে।'

খালি চেয়ারটায় বসলেন বিলিয়ার্ড। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে শুরু করলেন তিনি।

সাঈদ মুর্তজায়েভ, ড. দেবারভিল সিডাক, নিকোলাই সুনজাক আর ম্যাক বিলিয়ার্ড কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মুর্তজায়েভ, সিডাক ও সুনজাকের জন্ম মন্ট্রিনিগ্রোয়, পরস্পরের প্রতিবেশী ছিলেন ওঁরা। ম্যাক বিলিয়ার্ডের বাবা ইংরেজ, মা ক্রোট; জন্ম বেলগ্রেডেই।

সাঈদ মুর্তজায়েভ ধনী মুসলমান, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তিনিই তাঁর বাল্যবন্ধু নিকোলাই সুনজাককে পার্টিতে নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন খ্রিস্টান। সুনজাকের দেখাদেখি কার্চিক জোডাও পার্টিতে নাম লেখায়। ও আমাদের চেয়ে বয়সে বেশ অনেক ছোট, বসনিয়া থেকে বেলগ্রেডে আসে।

পার্টিতে নাম লেখাবার আগেই কবি ও দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন মুর্তজায়েভ। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার জন্যে তাঁর একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার ছিল, কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়ার সেটাই কারণ। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর মোহভঙ্গ ঘটে। পার্টিতে রাশিয়ার প্রভাব খুব বেশি, এবং রাশিয়া সার্ব ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিকে দাবিয়ে রাখার জন্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব গ্রহণে ক্যাডারদের উৎসাহ যোগাচ্ছে। এই নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। মূল পার্টি থেকে আলাদা হয়ে গেলেন মুর্তজায়েভ, সরে গেলেন দুর্বল একটা অংশে। তাঁর প্রিয় ও ঘনিষ্ঠতম বন্ধু নিকোলাই সুনজাক মনে-প্রাণে অসাম্প্রদায়িক হলেও, মূল পার্টিতেই থেকে গেলেন।

কার্চিক জোডার ভূমিকা খুব রহস্যময় ছিল। বিচ্ছিন্ন পার্টিকে এক করার কাজে উঠেপড়ে লাগে সে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল জন্মভূমি বসনিয়ায় গিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, অর্থাৎ মুসলমান নিধনে, অংশগ্রহণ করে সে। ব্যাপারটা একরকম ওপেন সিক্রেটই ছিল, রাশিয়া তাকে কিলিং মেশিনে পরিণত করেছিল, এখনও সে তাই আছে।

লেখালেখির জন্যে রাজনীতি থেকে কিছু দিন দূরে সরে থাকেন মুর্তজায়েভ। রাজনীতি, কবিতা ও দর্শনের কয়েকটা বই প্রকাশ করেন তিনি, সেগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ হলে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান। এই সময় খবর আসে, তাঁর দলের কর্মীরা গুপ্তহত্যার শিকার হচ্ছে। কর্মীদের নিয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যান তিনি। ওই পাহাড়েই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন নিকোলাই সুনজাক, সাথে কার্চিক জোডা। এখানে তাঁর প্রিয় বাল্যবন্ধু নিকোলাই সুনজাক খুন হন। মূল পার্টি ও কার্চিক জোডা রটিয়ে দেয়, সুনজাককে মুর্তজায়েভই খুন করেছেন। সবাই তা বিশ্বাসও করে। গ্রেফতার হবার পর তাঁর বিচার শুরু হয়। বহু বছর চলে সে বিচার। জেলে বসে আরও অনেক বই লেখেন তিনি, আরও বৃদ্ধি পায় জনপ্রিয়তা।

বেলগ্রেডের কিছু বুদ্ধিজীবী মুর্তজায়েভের অজ্ঞাতে সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসেন—মুর্তজায়েভ পার্টি ত্যাগ করবেন, সরকার তাঁর বিরুদ্ধে খুনের

অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেবে। জেলখানা থেকে জামিনে বেরিয়ে এলে বুদ্ধিজীবী বন্ধুরা তাঁকে পার্টি ত্যাগ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াতে বলেন। ইতিমধ্যে পার্টি ও কমিউনিজম, দুটোর প্রতিই বিতৃষ্ণা জন্মেছে মুর্তজায়েভের, বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ মেনে নিয়ে ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হন, এবং খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা থাকায় নির্বাচনে জিতেও যান। বিজয়ী হওয়ায় তাঁকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়, সেই অনুষ্ঠানে নিকোলাই সুনজাকের কন্যা লিলিয়ান নোভা স্টেজে উঠে প্রকাশ্যে তাঁকে চড় মারে। সবার মত নোভারও ধারণা, তার বাবা সুনজাককে মুর্তজায়েভই খুন করেছেন। কিন্তু নোভা জানে না ওর বাবার বাল্যবন্ধু এই মুর্তজায়েভই ওর বেলগ্রেড ইউনির্ভাসিটিতে পড়ার সমস্ত খরচ বহন করেছেন, এমন কি ইংল্যান্ডে গিয়ে লেখাপড়া করার খরচও তিনিই নিজের পকেট থেকে দিয়েছেন। গৃহবন্দী থাকা অবস্থায়ও লেখক সংঘের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করে অনুবাদক ও দফতর সম্পাদকের চাকরিটা নোভাকে পাইয়ে দিয়েছেন তিনিই।

ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও, সরকার মুর্তজায়েভকে দায়িত্ব নিতে দিল না। কসোভোয় তখন সার্বরা পাইকারীভাবে মুসলমানদের হত্যা করছে। মুর্তজায়েভ প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন। দীর্ঘ সময় ধরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলল, পুরোটা সময় তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হলো।

তাঁর অন্যতম বন্ধু ম্যাক বিলিয়ার্ড দীর্ঘ কয়েক বছর লন্ডনে ছিলেন, তারপর বেলগ্রেডে ফিরে এসে ব্রিটিশ দূতাবাসে চাকরি নিয়েছেন।

বাকি থাকল ড. সিডাক ও কার্চিক জোডা।

দেবারভিল সিডাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে পুলিস বিভাগে যোগ দেন। তিনি কোনদিনই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হননি। রাজনৈতিক প্রভাবে নয়, নিজ দক্ষতার গুণেই চাকরিতে ধীরে ধীরে পদোন্নতি হয়েছে তাঁর। কিন্তু বেলগ্রেড সিক্রেট পুলিসের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হওয়ার কারণে, কৌশলে তাঁর ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। পার্টির প্রভাবশালী নেতারা, এমন কি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচও, তাঁকে ভাল চোখে দেখেন না। তিনিও পার্টি বা প্রেসিডেন্ট ভবনের অনেক অন্যায় নির্দেশ বিবেক সায় না দিলে অমান্য করেন। বেলগ্রেড সিক্রেট পুলিস বিভাগে ইন্সপেক্টরের সংখ্যা বাহাত্তরজন, তার মধ্যে বাহান্নজনকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। বাকি বিশজনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে। এই বিশজনের 'বস্' স্বয়ং প্রেসিডেন্ট। তবে মিলোসেভিচ সরাসরি তাদেরকে নির্দেশ দেন না বা তারাও সরাসরি তাঁকে রিপোর্ট করে না। উগ্র জাতীয়তাবাদী যুবদলের এক নেতাকে প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে আনঅফিশিয়ালি মনোনয়ন দেয়া হয়েছে, এই ইন্সপেক্টররা তার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ভবনের নির্দেশ পায়, রিপোর্টও করে। যুবদলের এই নেতার নাম কার্চিক জোডা।

কার্চিক জোডার অতীত রোমহর্ষক, বর্তমান বিভীষিকাময়। তিরানব্বুই সালে বসনিয়া ও কসোভোয় মুসলমানদের ওপর সার্ব হামলা শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টির চরমপন্থীরা তাকে কাজে লাগায়। যুবদলের ডাকসাইটে নেতা সে, সন্ত্রাসী

হামলা ও খুন-খারাবিতে অংশগ্রহণ করা তাকে মানায় না, অথচ প্রতিটি কুকর্মে সক্রিয়ভাবে থাকা তার চাই, নিজ হাতে করা চাই কাজগুলো। এ তার বিকৃত মানসিকতারই প্রতিফলন। যুবদলের বিরাট একটা বাহিনী নিয়ে বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোয় অভিযান চালায় সে। বসনিয়াতেই জন্ম তার, সারায়েভোর প্রতিটি মুসলিম পরিবারকে চিনত। এই পরিবারগুলোর তরুণ-তরুণীদের একটা তালিকা তৈরি করে সে, তারপর লোক পাঠিয়ে ধরে আনে সদ্য তৈরি বিভিন্ন কারাগারে। প্রতি রাতে বন্দী মুসলমান তরুণদের টরচার করত সে, ভোর রাতে মেরে ফেলত। এমনও শোনা গেছে, খুন করার পর লাশ কেটে রান্না করা হয়েছে, সেই রান্না করা মাংস খাওয়ানো হয়েছে আত্মীয়স্বজনদের। সে আর তার যুবদল প্রতি রাতে মুসলমান তরুণীদের ধর্ষণ করত। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যপন্থী একদল নেতা প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচের কাছে একবার লিখিত অভিযোগ করেন এই বলে যে কার্চিক জোডা ও তার ভাই শিশুদেরও ধর্ষণ করছে। মিলোসেভিচ ব্যাপারটাকে ভিত্তিহীন অভিযোগ বলে পাশ কাটিয়ে যান।

কসোভোয় ন্যাটো বোমাবর্ষণ করার পর বসনিয়া ও কসোভোয় জাতিসংঘ শান্তি বাহিনী পাঠায়। ওই দুই জায়গায় অভিযান চালানো বন্ধ হয়ে যায় কার্চিক জোডার। সে এরপর তার রক্তপিপাসা মেটাবার জন্যে বেছে নেয় বেলগ্রেডকে। বেলগ্রেডেও অনেক মুসলমান বসবাস করে, তাদের মধ্যে যারাই একটু নাম করে বা মাথাচাড়া দেয়, একের পর এক তাদেরকে হত্যা করছে সে। এ-ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টি ও মিলোসেভিচ সরকারের মৌন সমর্থন আছে। তার কোন সরকারী পদ নেই, কিন্তু আমলারা, এমন কি মন্ত্রীরাও তাকে সাংঘাতিক ভয় পায়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই যখন তখন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে পারে সে।

আরও অনেকের মত ম্যাক বিলিয়ার্ডও জানেন যে নিকোলাই সুনজাককে সাঈদ মুর্তজায়েভ নয়, খুন করেছে কার্চিক জোডা। এই খুনের একটা মোটিভ অন্তত পরিষ্কার। একাধিক মোটিভের একটা হলো, সুনজাকের স্ত্রী লিলিকে কার্চিক জোডা শয্যাসঙ্গিনী করতে চেয়েছিল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও এই অপকর্মটি সে করতে পারেনি। লিলি বসনিয়ার মেয়ে, জোডার সঙ্গে একই মহল্লায় বড় হয়েছেন, কিন্তু জোডাকে কখনোই তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি ক্যান্সারে মারা যাবার পর তার নজর পড়ে তার মেয়ে নোভার ওপর। যুবদলের অনেক নেতাকেই সে চ্যালেঞ্জের সুরে বলেছে, আজ হোক কাল হোক নোভাকে সে বিছানায় নেবেই।

জোডা নোভার কোন ক্ষতি করতে পারছে না শুধু বেলগ্রেড পুলিসের চীফ ড. সিডাকের জন্যে। নিকোলাই সুনজাক ও ড. সিডাক, দু'জনেই লিলিকে ভালবাসতেন, কিন্তু লিলি বিয়ে করেন সুনজাককে। সুনজাক খুন হবার পর লিলি ও তাঁর মেয়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নেন ড. সিডাক। তারপর লিলি মারা গেলে নোভাকে তিনি নিজের কাছে নিয়ে এসে রাখেন।

বিলিয়ার্ডের কথা শেষ হলো। পট থেকে আরও এক কাপ কফি ঢেলে নতুন একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। হাত তুলে কামরার চারদিকটা দেখালেন রানাকে। 'পুলিসকে আপনি রিপোর্ট করতে চান, মি. রানা?'

'কোন লাভ হবে কি? এখন এটা পরিষ্কার যে আমার পিছনে কার্চিক জোডার

দলকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার ওপর ড. সিডাকের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।'

বিলিয়ার্ড কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানতে চাইলেন, 'ফোলিকে আমি কি বলব?'

'সে কি শুধু পাণ্ডুলিপিটাই চাইছে, ডকুমেন্ট নয়?'

'মি. মুর্তজায়েভ আপনাকে যা-ই দিন, ফোলি সেটা দেখতে চায়।'

'তাকে বলুন, আগে হাতে পাই, তারপর ভেবে দেখব।'

আরেকবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছাড়লেন বিলিয়ার্ড। এই সময় আবার নক হলো দরজায়। এবার ওয়েটারের সঙ্গে একজন পোর্টার ও সেই মধ্যবয়স্কা চেম্বারমেইড ঢুকল স্যুইটে। মহিলা খোঁড়াচ্ছে, পায়ের পাতায় ব্যান্ডেজ। ওয়েটার টেবিল পরিষ্কার করছে, পোর্টার আর চেম্বারমেইড গুছাচ্ছে ঘর। বিলিয়ার্ড বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর হোটেলের ম্যানেজার রানার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কিছু চুরি গেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে রানা মাথা নাড়ল। ম্যানেজার জানালেন, পুলিসকে তিনি লিখিত অভিযোগ জানাবেন।

ঘরগুলো নতুন করে সাজাতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল। গরম পানিতে শাওয়ার সেরে শোয়ার প্রস্তুতি নিল রানা। ওয়ালথারটা চেক করল, তারপর গুঁজে রাখল বালিশের তলায়। হাতটা বের করে আনবে, আঙুলে খসখসে কি যেন ঠেকল। 'আবার!' বিড়বিড় করল ও। আঙুলে ধরে বের করে আনল জিনিসটা। ভাঁজ করা একটা কাগজ। সাঈদ মুর্তজায়েভ আরও একটা বার্তা পাঠিয়েছেন। এটাতেও কোন সম্বোধন নেই।

'গোপন সূত্রে খবর পেয়েছি, আমাকে পাগল সাব্যস্ত করার ষড়যন্ত্র চলছে। খুব তাড়াতাড়ি ওরা আমাকে পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দেবে। আমাকে যদি যুগোস্লাভিয়া থেকে বের করে নিয়ে যাবার কোন প্ল্যান থাকে, দয়া করে দেরি করবেন না। কাগজটা অবশ্যই পুড়িয়ে ফেলবেন। সাঈদ মুর্তজায়েভ।'

রানা প্রায় নিশ্চিত, এই চিরকুটটাও মধ্যবয়স্কা চেম্বারমেইড রেখে গেছে। বাথরূমে ঢুকে কাগজটা পুড়িয়ে ফেলল ও।

ছয়

সাঈদ মুর্তজায়েভের বাড়িটা শহরের একবারে শেষপ্রান্তে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তা ঢাল বেয়ে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে, ঢালগুলো ঝোপ আর গাছপালায় নিশ্ছিদ্রভাবে ঢাকা। জঙ্গল ঘেরা এরকম একটা ঢালের মাথায় একতলা বাড়িটা। বাড়ির তেকোনা ছাদ লাল টালি দিয়ে তৈরি, সরু চিমনিটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। আশপাশে আর কোন বাড়ি নেই। চৌহদ্দি বিশাল হলেও, বাড়িটা বেশি বড় নয়। উঁচু পাথুরে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়াও আছে। ট্যাক্সি থেকে বাড়ির গেটে নামল রানা, ওকে নামতে দেখে গার্ডরূম থেকে দু'জন সেন্ট্রি বেরিয়ে এল, দু'জনের হাতেই স্টেন গান।

পাঁচিল ঘেঁষে খানিক পরপর একজন করে সশস্ত্র সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে, আক্ষরিক অর্থেই বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে ওরা। 'মি. মাসুদ রানা?' ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিস জানতে চাইল।

কথা না বলে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দেখাল রানা। লোকটা স্যালুট করল ওকে, তারপর গেট খুলে দিয়ে ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতে বলল। 'আপনাকে, স্যার, ত্রিশ মিনিট সময় বরাদ্দ করা হয়েছে।' ভেতরে ঢোকার সময় ঘাড় ফিরিয়ে একবার পিছন দিকে তাকাল রানা। ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে যাচ্ছে ড্রাইভার। ভাবল, ওকে কি রেখে দেয়া উচিত ছিল?

কমপ্লিট সুট পরে এসেছে রানা, সঙ্গে হোলস্টার না থাকায় ওয়ালথারটা গুঁজে রেখেছে কোমরের কাছে বেল্টে। নোভার আশ্বাস সত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে ছিল ও। গার্ড সার্চ না করায় ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে ওর।

হোটেল থেকে রওনা হবার আগে টেলিফোনে নোভার সঙ্গে কথা বলেছে রানা। নোভাই তাকে অস্ত্রটা সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেয়। পরিষ্কার করে কিছু না বললেও, আভাসে বলেছে কথাটা—ওকে সার্চ করা হবে না। ব্যাপারটা যে মোটেও স্বস্তিকর নয়, রানার বুঝতে অসুবিধে হয়নি। সার্চ করা হবে না, এই আভাস নোভা ওকে কি করে দেয়? নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারে ড. সিডাকের সঙ্গে কথা হয়েছে তার। বেলগ্রেড সিক্রেট পুলিসের চীফ যদি চান রানার সঙ্গে অস্ত্র থাকুক, তাহলে অবশ্যই ধরে নিতে হবে বিপদ ওকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে।

গেট পেরিয়ে একটা বাগানে ঢুকল রানা। বাগানটা বাড়ির একপাশে, ভেতর দিয়ে চওড়া পথ চলে গেছে উঁচু একটা বারান্দা পর্যন্ত। বাগান ওই বারান্দার সামনে শেষ হয়নি, পাশ কাটিয়ে বাড়ির পিছন দিকে পৌঁছে আরও চওড়া হয়েছে। বারান্দায় ব্যাঙের ছাতা আকৃতির একজোড়া কংক্রিটের টেবিল রয়েছে। চেয়ারগুলো কাঠের। বারান্দার তিন দিকে প্রচুর গাছপালা। ওখান থেকে বাড়ির পিছনটা পরিষ্কার দেখা যায়—অনেক নিচে গোটা বেলগ্রেড শহর শরীর বিছিয়ে রেখেছে। পিছনের ঢালে প্রচুর ঘাস, তবে কোন গাছ নেই, সব কেটে ফেলা হয়েছে। শেষ বিকেলের রোদ লেগে চশমার কাঁচ ঝিক করে উঠল, বারান্দায় কেউ একজন বসে আছে। রানা এগোচ্ছে, বারান্দার সিঁড়িতে নেমে এল সে। বিশ হাত দূর থেকে দৃষ্টিভ্রমের শিকার হলো রানা। আকৃতি, বয়স, গায়ের রঙ, চশমা ইত্যাদি অন্য এক লোকের সঙ্গে এত মেলে যে বিস্ময়ের ধাক্কাটা বেশ জোরেই লাগল ওকে।

ধাপ ক'টা বেয়ে নিচে নামল লোকটা। হাসিমুখে রানার দিকে ডান হাত বাড়িয়ে বলল, 'মাসুদ রানা? আমি সাঈদ মুর্তজায়েভ।'

গলার আওয়াজ শুনে রানার ভুল ভাঙল। তবে এ-প্রসঙ্গে কিছু বলল না ও। লক্ষ করল, পেশাদার রাজনীতিকের মত অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হ্যান্ডশেক করছেন সাঈদ মুর্তজায়েভ; জোরাল ও আন্তরিক, কিন্তু তাসত্ত্বেও নৈর্ব্যক্তিক, কোন ভাব বা অন্য কিছু ফাঁস করে না।

পথ দেখিয়ে একটা টেবিলে এনে রানাকে বসালেন মুর্তজায়েভ। সবুজ পালিশ করা আরেকটা চেয়ারে রানার মুখোমুখি বসলেন নিজে। 'প্রথমেই আমার

বন্ধু রাহাত খানের খবর বলো, রানা। কেমন আছে সে? মেডিলিন ঢাকায় গেল, তার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে?'

'বস্ ভাল আছেন,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, অলব্রাইট ওনার সঙ্গে দেখা করেছেন।'

'আমার সম্পর্কে আলাপ করল ওরা?' সাগ্রহে রানার দিকে ঝুঁকে পড়লেন মুর্তজায়েভ।

'আপনার দুই বন্ধুর একজন বললেন, সিআই এ-র ওপর তাঁর খুব একটা নিয়ন্ত্রণ নেই, তাই আপনার জন্যে কিছু করা তাঁর জন্যে অত্যন্ত কঠিন। আমরা বরং এ-প্রসঙ্গে বেশি কথা না বলে সময় বাঁচাতে পারি, তাই না?'

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে প্রফেশন্যাল হয়ে উঠলেন মুর্তজায়েভ। 'তুমিই যে মাসুদ রানা, রাহাত খানের প্রতিনিধিত্ব করছ, বুঝব কিভাবে?'

'বস্ আমাকে দিয়ে একটা বাক্য মুখস্থ করিয়েছেন,' বলল রানা। 'বাক্যটা শুনলে আপনি নাকি বুঝতে পারবেন, আমি তাঁরই প্রতিনিধিত্ব করছি। বাক্যটা হলো–"তেলাপোকার চেয়ে অনেক বেশি ভয় পাই আমি ফিরোজাকে। ওকে বোলো, বাংলাদেশেও প্রচুর তেলাপোকা আছে, খবরদার যেন না আসে!"'

রানার কথা শেষ হওয়া মাত্র গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন মুর্তজায়েভ। হাসতে হাসতে আপন মনেই বললেন, 'ও, আচ্ছা! ঘটনাটা তাহলে আজও মনে রেখেছে ও!' তারপর মলিন হয়ে গেল চেহারাটা। রানার দিকে তাকালেন, 'ফিরোজা ছিল আমার প্রথম স্ত্রী। তখনও আমাদের বিয়ে হয়নি, রাহাতের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় কোত্থেকে একটা তেলেপোকা এসে গায়ে পড়ে, অমনি আর্তনাদ করে উঠে রাহাতকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরেছিল ও। সেই থেকে ওকে দেখলেই লাফিয়ে পিছু হটত রাহাত, বলত–তুমি আমাকে পিষেই মেরে ফেলবে!' আবার একবার মৃদু হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। তারপর বললেন, 'রাহাত জানে না, বিয়ের দুবছরের মধ্যেই মারা গেছে ফিরোজা।'

রানা বলল, 'মাত্র আধ ঘণ্টা সময় দেয়া হয়েছে আমাকে। কাজ শেষ করে সন্ধের আগেই হোটেলে ফিরতে চাই। এখানে কথা বলা নিরাপদ তো?'

'প্রতিটি ঘরে আড়িপাতা যন্ত্র আছে,' বললেন মুর্তজায়েভ। 'সেজন্যেই বারান্দায় বসেছি আমরা।'

'তাহলে ডকুমেন্টটা সম্পর্কে আমাকে একটা ধারণা দিন।'

'তিরানব্বুই সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে সারায়েভোয় সার্বরা একটা দাঙ্গা বাধিয়েছিল,' বললেন মুর্তজায়েভ। 'সেই দাঙ্গায় জ্যান্ত কবর দেয়া হয় আড়াইশো থেকে তিনশো বসনিয়ান মুসলমানকে। সেই থেকে সারায়েভোর মুসলমানরা প্রতি বছর এপ্রিল মাসের নয় তারিখে শোক দিবস পালন করে আসছে। শোক দিবস উপলক্ষ্যে মীটিং-মিছিল হয়। প্রতি বছরের মত এবারও হবে।

'যুগোশ্লাভিয়া সীমান্ত থেকে বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো খুব বেশি দূরে নয়। সীমান্ত থেকে বিশ মাইল চওড়া, দেড়শো মাইল লম্বা একটা জায়গা আছে। জায়গাটা যুগোশ্লাভিয়ার পশ্চিমে, সারায়েভোর পুবে। সাতশো বছর আগে এই জায়গা সার্বিয়ার ছিল, এটা সার্বদের একটা পুরানো দাবি। অনেক চেষ্টা করেও জায়গাটার দখল নিতে পারেনি তারা। ন্যাটো কসোভোয় বোমাবর্ষণ করার পর

এলাকায় এখন খানিকটা স্থিতি এসেছে, সবার মধ্যেই গা ছাড়া একটা ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। আর এই সুযোগে ওই জায়গাটা দখল করবে বলে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে মিলোসেভিচ সরকার।

'শোকদিবস মিছিল-মীটিং হবে সারায়েভোয়। সেই মীটিঙে, স্বভাবতই, বসনিয়ান সার্বরা অংশ গ্রহণ করবে না। অংশ গ্রহণ করা তো দূরের কথা, সেদিন তারা কেউ ঘর থেকেই বেরুবে না। কিন্তু ঘর থেকে না বেরুলে কি হবে, মিছিলের লোকজন বেছে বেছে সার্বদের বাড়িতে ঢুকে দেড় থেকে দুশো সার্বকে গুলি করে মারবে।'

'মানে?' রানা হতভম্ব।

হাত তুলে রানাকে শান্ত হতে বললেন মুর্তজায়েভ। 'প্ল্যানটা সেভাবেই করেছে মিলোসেভিচ। দুনিয়ার লোক জানবে মুসলমানদের মিছিল থেকে সার্বদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। ডকুমেন্টে স্পষ্ট লেখা আছে, হামলাটা আসলে করবে কার্চিক জোডার নেতৃত্বে উগ্র সার্ব জাতীয়তাবাদী যুবদল। পাইকারী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে সারায়েভোর পুবদিকে সৈন্য পাঠাবার অজুহাত তৈরি করতে চায় ওরা। ঘরের ভেতর দেড়শো থেকে দুশো সার্ব খুন হলে যুগোস্লাভিয়া যদি সৈন্য পাঠায়, দুনিয়ার মানুষ সেটাকে অযৌক্তিক বলবে না। মোট কথা, সারায়েভোর একটা অংশ মিলোসেভিচ দখল করবেই, তার বিনিময়ে স্বজাতির দেড়-দুশো লোককে বলি দিতে তার আপত্তি নেই।'

রানার হাতের তালু ঘামছে। 'ডকুমেন্টটা আপনি পড়েছেন?'

'না, আমি পড়িনি,' মুর্তজায়েভ বললেন। 'তবে যে লোক ফাইলটা প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে চুরি করে আনে সে পড়েছে। তার মুখ থেকেই সব জেনেছেন আমার স্ত্রী, তাঁর থেকে আমি। চুরি করার পর সেই রাতেই সিক্রেট পুলিস তাকে গ্রেফতার করে, পরদিন সকালে সে মারা যায়। শুনেছি তার স্ত্রীকেও ওরা খুন করেছে।'

'ফাইলের ফটোস্ট্যাট করা কপিটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে, তাই না? তাহলে আপনি সেটা পড়েননি কেন?'

'প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে ফাইলের ফটোস্ট্যাট করা কপিই চুরি যায়,' বললেন মুর্তজায়েভ। 'কিন্তু ফটোস্ট্যাট মেশিনের অপারেটর চুরি করার পর বাড়ি ফেরার আগে গোপন এক ফটো-স্টুডিও থেকে কপি করা ফাইলটার মাইক্রোফিল্ম তৈরি করায়। তার বাড়ি থেকে আমার স্ত্রী সেই মাইক্রোফিল্ম নিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দেন। ফাইলের ফটোস্ট্যাট করা কপি স্টুডিওতেই নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। মাইক্রোফিল্মটা এত ছোট যে একটা বোতামের ভেতরও লুকিয়ে রাখা সম্ভব। মাইক্রোফিল্ম বলেই আমার পক্ষে ওটা পড়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, সময়ও ছিল না।'

'কিন্তু এখান থেকে আমি এখন বেরুলেই ওরা আমাকে সার্চ করবে,' বলল রানা। 'যত ছোটই হোক, যেখানেই লুকিয়ে রাখি, বডি সার্চ করলে ওরা সেটা ঠিকই পেয়ে যাবে। এ-ব্যাপারে আপনার কোন পরামর্শ আছে?'

মুর্তজায়েভ হাসছেন। 'মাইক্রোফিল্মটা আমি নিজের কাছে রাখিনি, রানা। ওটা যখন পাই, কাজ সেরে বাড়ির ঝি–সে আমার আত্মীয়াও হয়–ফিরে যাচ্ছিল।

জানতাম আমার বাড়ি সার্চ করবে পুলিস, তাই তার মাধ্যমে আরেক আত্মীয়র কাছে পাঠিয়ে দিই।'

'এবার পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গ,' বলল রানা। 'আপনি যাই লিখে থাকুন, সিআইএ ওটা দেখতে চায়। আর মিলোসেভিচ সরকার চাইছে আপনার কোন পাণ্ডুলিপি যেন যুগোস্লাভিয়া থেকে বাইরে কোথাও পাচার করা না যায়। কারণটা কি?'

'সিআইএ-র উদ্বিগ্ন হবার কারণ আছে,' বললেন মুর্তজায়েভ। 'আমি বলকানের রাজনীতির ওপর যে বইটা লিখেছি তাতে প্রমাণ সহ বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র যতই দরদী সাজার ভান করুক, আসলে এই এলাকায় প্রতিটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির বিরুদ্ধে কাজ করছে তারা। রাশিয়াকে খুশি করার জন্যে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সার্বদের পক্ষে গেছে। এটা প্রকাশ হলে বিশ্ব সমাজে যুক্তরাষ্ট্রের মুখোশ খসে পড়বে, সেজন্যেই সিআইএ পাণ্ডুলিপিটা নষ্ট করে ফেলতে চায়। আমার ওই বইয়ে মিলোসেভিচ সরকারেরও নানা কুকীর্তির কথা ফাঁস করা হয়েছে, ফলে তারাও চায় না বইটা ছাপা হোক।' টেবিলে রাখা একটা বাক্স থেকে চুরুট নিয়ে ধরালেন তিনি। রানা লক্ষ করল, তাঁর এই চুরুট খাওয়ার অভ্যাসটাও আরেক লোকের সঙ্গে মিলে যায়। 'ওই বইটা বাদেও আরও দুটো বই লিখেছি আমি,' আবার শুরু করলেন মুর্তজায়েভ। 'দ্বিতীয় বইটা আমার আত্মজীবনী। এছাড়া একটা কবিতার বই...'

'আত্মজীবনীতে নিশ্চয়ই আপনার বাল্য বন্ধু নিকোলাই সুনজাক প্রসঙ্গও থাকবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন মুর্তজায়েভ। 'সুনজাক সহ আমার সব ক'জন বন্ধুর কথাই লিখেছি আমি। পাহাড়ে আমি পালিয়ে যাবার পর সুনজাক কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, কিভাবে সে খুন হলো, ম্যাট বিলিয়ার্ড এই বেলগ্রেডে কিভাবে একবার নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে বাঁচায়, পরে কিভাবে তার মাধ্যমে সুনজাকের মেয়ে নোভাকে আমি সাহায্য করেছি ইত্যাদি সব প্রসঙ্গই থাকবে তাতে।'

'সুনজাকের মৃত্যু সম্পর্কে কিছু যদি বলেন।'

'সুনজাক আর জোড়া পাহাড়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।' অতীতে ফিরে গেলেন সাঈদ মুর্তজায়েভ। 'ওদের ইচ্ছা ছিল আমাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মূল দলে ফিরে যেতে রাজি করাবে। এই নিয়ে সুনজাকের সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক হয়। তর্কে হেরে গিয়ে আমার ক্যাম্প থেকে রাগ করে বেরিয়ে যায় সে, আমি তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে পিছু নিই। সে-সময় জোড়া আমাদের সঙ্গে ছিল না। জঙ্গলের ভেতর আমি সুনজাককে হারিয়ে ফেলি। কিছুক্ষণ পর অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ হয়। সেই আওয়াজ অনুসরণ করে ছুটে যাই আমি, দেখি পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সুনজাক। একটু পরই সেখানে হাজির হয় কার্চিক জোড়া। আমার দলের ক্যাডাররাও গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে আসে। সবার সামনে জোড়া আমাকে বলল, "কাজটা তুমি ভাল করলে না, সাঈদ।" আমি এমন হতভম্ব হয়ে পড়ি যে প্রতিবাদও করতে পারিনি। যাই হোক, নিজের দল নিয়ে বেলগ্রেডে ফিরে যায় জোড়া, খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে জানায়

সুনজাককে আমি খুন করেছি।

'জোডার সঙ্গে দু'মাস পর আবার আমার দেখা হয়। সিক্রেট পুলিস আমাকে গ্রেফতার করতে আসে, তাদের সঙ্গে জোডাও ছিল। আমি ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়েছি, জোডাই সুনজাককে খুন করেছে, কিন্তু আমার হাতে কোন প্রমাণ ছিল না। পুলিসের সামনেই বোকার মত আমি তাকে দোষারোপ করি। আমার মুখের ওপর হাসতে শুরু করে সে। খুনের কথা স্বীকার বা অস্বীকার, কোনটাই করেনি সে, শুধু হাসছিল। তার ওই হাসি দেখে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। পুলিস বাধা দেয়ার আগেই আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। মাটিতে ফেলে গলা টিপে ধরেছিলাম। সে একটা ছুরি বের করে আমার বুকে গাঁথার চেষ্টা করে। তার ওই ছুরি কেড়ে নিয়ে পোচ দিই গলায়। ঘা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জোডার গলায় ওই দাগটা থাকবে।'

'এবার কিন্তু জোডা মরিয়া হয়ে উঠেছে,' মুর্তজায়েভ থামতে বলল রানা। 'ডকুমেন্টটা না পেলে আপনাকে সে ছাড়বে না।'

'আমি জানি।' চুরুটটা মুখের সামনে তুলেও হাতটা নামিয়ে আনলেন মুর্তজায়েভ। 'নোভি সাদ-এর সরকারী মেন্টাল হসপিটালে আমার এক আত্মীয় আছে, সে আমাকে জানিয়ে গেছে জোডা ওই হসপিটালে গিয়েছিল। পাগলা-গারদের ডিরেক্টরকে জোডা নির্দেশ দিয়েছে আমার জন্যে একটা সেল খালি করে রাখতে। সেজন্যেই আমি অস্থির হয়ে উঠেছি, রানা। একবার যদি পাগলা-গারদে নিয়ে যায় আমাকে, ওখান থেকে কোনদিনই আর বেরুতে পারব না। রাহাত তোমাকে পাঠিয়েছে, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমার প্ল্যানটা কি?'

বাড়ির অন্দরমহল থেকে একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'সাঈদ, তোমার টেলিফোন।'

'এক্সকিউজ মি,' বলে চেয়ার ছাড়লেন মুর্তজায়েভ, বারান্দা থেকে ঘরে চলে গেলেন।

হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে ইংরেজি দৈনিকটা টেনে নিল রানা। প্রথম পাতা জুড়ে রাজনৈতিক হত্যার খবর ছাপা হয়েছে। শুধু এক কোণে ছোট্ট একটা খবর দেখল রানা, রাজনীতির সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। গরমের দিনেও কোন কোন এলাকায় প্রচণ্ড কুয়াশা দেখা যাচ্ছে, আকস্মিক শীতে জনজীবন বিপর্যস্ত, কসোভোর জঙ্গলে দাবাগ্নি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

'দাবাগ্নি,' আপনমনে বিড়বিড় করল রানা।

'গেট থেকে গার্ডরা ফোন করেছিল,' বারান্দায় ফিরে এসে মুর্তজায়েভ বললেন। 'তোমাকে আরও দশ মিনিট সময় দেয়া হয়েছে।' পকেট থেকে বের করে রানার সামনে টেবিলে একটা চাবি রাখলেন তিনি। 'এটা তুমি খুব যত্ন করে রাখবে, রানা। ওটা কিসের চাবি একটু পর তোমাকে বলছি।'

'আমার একটা প্ল্যান আছে, কিন্তু সেটা বলার আগে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই,' চাবিটা রিঙে আটকে পকেটে রাখল রানা। 'আমার প্রথম প্রশ্নটা ব্যক্তিগত, তবে অপ্রাসঙ্গিক নয়। আপনি আমাকে মেসেজ পাঠাবার ঝুঁকি কেন নিতে গেলেন? এই ঝুঁকি না নিলে আপনার ভাগ্নে আলভিক নুরানিক খুন হত না।'

'আলভিকের খুন হওয়াটা সত্যি দুঃখজনক, রানা,' ধীরে ধীরে বললেন মুর্তজায়েভ। 'তবে সান্ত্বনা এই যে তিন মাসের মধ্যে এমনিতেই মারা যেত ও। ব্লাড ক্যান্সার। তোমাকে সাবধান করার জন্যে খবর পাঠানোর দরকার ছিল, শুনে আলভিক জেদ ধরল ও-ই নিয়ে যাবে মেসেজ। ওকে সার্চ করা হবে জেনে মৌখিক মেসেজ দিয়েছিলাম। আর চিরকুট দুটো আমার আত্মীয়া গুলশানকে দিয়ে পাঠিয়েছি। শুধু হোটেলে নয়, আমার বাড়িতেও কাজ করে ও।'

'আমি আঁচ করেছিলাম। আলভিককে সার্চ করে কিছু না পেয়ে ওর পিছু নিয়ে হোটেলে গিয়েছে কার্চিকের ভাই জার্জিক জোডা, ওর পিছু নিয়েই ঢুকেছে আমার কামরায়, এবং মেসেজ দেয়ার মুহূর্তে খুন করেছে। যাই হোক, এবার আমার প্ল্যানটা সম্পর্কে বলি। আপনাকে এই বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া আমার জন্যে খুব বড় কোন সমস্যা নয়,' বলল রানা। 'আপনি কি সীমান্ত পার হয়ে বসনিয়ায় যেতে চান, নাকি সাগর হয়ে ইটালিতে?'

'তুমি বলছ পুলিসের চোখ ফাঁকি দিয়ে আমাকে বের করে নিয়ে যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব?' মুর্তজায়েভের চোখে অবিশ্বাস।

রানা হাসল। 'হ্যাঁ, সম্ভব। কিভাবে কি করব সব আমার ওপর ছেড়ে দিন। তবে আমি যখন আপনাকে নিতে আসব, দশ কি পনেরো মিনিটের বেশি সময় পাবেন না। কি করতে হবে বলে যাচ্ছি আমি, সেভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। এবার বলুন, কোন পথে পালানোটা পছন্দ করবেন আপনি।'

'সীমান্ত পার হয়ে বসনিয়ায় যাবার কোন মানে হয় না,' মুর্তজায়েভ চিন্তিত ভাবে বললেন। 'কার্চিক জোডার হাত অনেক লম্বা, রানা। বসনিয়ায় তার এজেন্ট আছে। না, সাগর পথে পালানোই বোধহয় ভাল।'

'সেক্ষেত্রে আমাকে কোটর আর বাডভা, এই দুই জায়গা সম্পর্কে একটা ধারণা দিন। শুনেছি কোটর আর বাডভায় প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচের ব্যক্তিগত বনভূমি আছে, সেখানে তিনি প্রায়ই বন্যপ্রাণী শিকার করতে যান। এ-ও শুনেছি যে সার্ব ব্যবসায়ীরা বাডভা উপকূল ইজারা নিয়েছে, স্থানীয় জেলেদের হটিয়ে দিয়ে একচেটিয়াভাবে তারাই মাছ ধরে।'

'ড. সিভাক, সুনজাক আর আমার বাড়ি মন্ত্রিনিগ্রোর কোটরে,' বললেন মুর্তজায়েভ। 'তবে সুনজাক আর আমাদের পারিবারিক খামার আছে বাডভায়। এরকম পাঁচ-সাতটা খামার আর পাঁচিল ঘেরা ছোট্ট শহরটা বাদ দিয়ে গোটা এলাকাই লীজ নিয়েছে মিলোসেভিচ। হ্যাঁ, প্রতি শীতে ওখানে শিকার করতে যায় সে। বছরের অন্যান্য সময় তার বন্ধু-বান্ধবরাও যায় বলে শুনেছি। গোটা এলাকায় লোকবসতি নেই বললেই চলে, শুধু জঙ্গল আর পাহাড়। আর কি যেন জিজ্ঞেস করলে? ও, হ্যাঁ, সার্ব ব্যবসায়ীরা সাগরে নিজেদের জেলে নামিয়ে মাছ ধরে। এঞ্জিন নৌকা আর ট্রলার ব্যবহার করে ওরা। নিষেধ করা হলেও, স্থানীয় জেলেরা মাঝে মধ্যে গোপনে মাছ ধরার চেষ্টা করে। তাদেরকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেয়া আছে। সার্ব জেলেদের আলাদাভাবে চেনার জন্যে লাল ফতুয়া দেয়া হয়েছে বলে শুনেছি।'

'এবার বলুন মাইক্রোফিল্মটা কোথায় আছে,' জানতে চাইল রানা। 'প্রথমে

আমাকে ওটা পেতে হবে, দেখতে হবে কি আছে তাতে, শুধু তারপরই আমি পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে পারব।'

মুর্তজায়েভকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'তারমানে কি ওটা না পেলে তুমি আমাকে বের করে নিয়ে যেতে পারবে না?'

পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'ব্যাপারটা কি অনিশ্চিত, মি. মুর্তজায়েভ? না পাবার আশঙ্কাও আছে?'

'না, ঠিক তা নয়।' ইতস্তত করছেন মুর্তজায়েভ, সন্দেহে ভুগছেন। 'আসলে জিনিসটা তো আমার হাতে নেই, তাই জোর করে কি করে বলি যে…'

'পাইকারী হত্যাকাণ্ড, বসনিয়ার অংশবিশেষ দখল ইত্যাদি ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আপনি জেনেছেন, এখন আমিও জানি। আমরা রিপোর্ট করলে জাতিসংঘ অবশ্যই অ্যাকশন নেবে। কিন্তু তাতে শুধু ষড়যন্ত্রটা হয়তো ব্যর্থ করা যাবে, তার বেশি কিছু নয়। এই ষড়যন্ত্রের যারা হোতা তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে প্রমাণ দরকার। কাজেই মাইক্রোফিল্মটা অবশ্যই আমার হাতে আসতে হবে।'

'সেক্ষেত্রে তোমার যুক্তিই ঠিক আছে,' বললেন মুর্তজায়েভ। 'আগে তুমি ওটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করো, তারপর আমাকে বের করে নিয়ে যাও। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ওটা আমি বাডভায় পাঠিয়ে দিয়েছি, রানা। কোটর হয়ে বাডভায় যেতে হবে তোমাকে।'

'আমি বাডভায় গেলে পুলিস সন্দেহ করবে না?'

'না, করবে না, কারণ ওরা তো আর জানে না যে ডকুমেন্ট আর পাণ্ডুলিপি বাডভায় আছে। তুমি ভাব দেখাবে আমার কাছ থেকে কিছু না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছ। যুগোস্লাভিয়া ত্যাগ করার আগে মন্ট্রিনিগ্রো, অর্থাৎ কোটর আর বাডভায় বেড়াবার ইচ্ছা তোমার হতেই পারে। অনেক বিদেশী ট্যুরিস্টই মিলোসেভিচের গেইম রিজার্ভ দেখতে যায়।'

'ঠিক আছে, কোটর হয়ে বাডভায় গেলাম আমি। তারপর?'

'কোটরে একটা সরাইখানা আছে, নাম ভার্নি। ওখানে উঠবে তুমি। আমার এক আত্মীয় তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। সেই তোমাকে কোটর থেকে বাডভায় নিয়ে যাবে। পাণ্ডুলিপি আর মাইক্রোফিল্ম একটা স্টীল-এর বাক্সে আছে। ওই বাক্সের চাবিই তোমাকে দিয়েছি। বাক্সের ভেতর মাইক্রোফিল্ম আছে, আমার আত্মীয় সে-কথা জানে না।'

'আমি তাকে চিনব কিভাবে?'

'সে তোমাকে বলবে—"সুনজাক আমার বন্ধু ছিল"।' হাসলেন মুর্তজায়েভ। 'সত্যি ছিল।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'বাডভায় গিয়ে বাক্সটা নেব আমি। তারপর বেলগ্রেডে ফিরে আসব। ফিরেই আপনাকে ফোন করব। আপনি আমাকে আর ড. সিডাককে বাড়িতে চা খেতে ডাকবেন।'

'তোমার সঙ্গে সিডাককেও ডাকব?' মুর্তজায়েভ অবাক হলেন। 'কেন?'

'কেন, সেটা পরে জানতে পারবেন।'

'কিন্তু শুধু চা খেতে ডাকলে সিডাক যদি না আসে?'

'বলবেন, আপনার কাছে পাণ্ডুলিপি আছে, আর আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দলিল, আমরা এসে ওগুলো যেন নিয়ে যাই। ওগুলো আপনি ড. সিডাকের হাতেই তুলে দিতে চান, তবে আমার উপস্থিতিতে।'

'তারপর?'

'তারপর আপনাকে আমি এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব।'

'কিন্তু কিভাবে? তাছাড়া, আমাকে না হয় বের করে নিয়ে গেলে, আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের কি হবে?'

'প্ল্যানটা তাহলে খুলেই বলি আপনাকে...'

সাত মিনিট ধরে নিজের প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করল রানা। মুর্তজায়েভ নোট নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিষেধ করল ও। মাঝখানে ব্যাখ্যা থামিয়ে মিসেস ফাতেমা মুর্তজায়েভকে ডাকা হলো। ভদ্রমহিলা মুর্তজায়েভের ছাত্রী ছিলেন, তাঁর চেয়ে প্রায় বিশ বছরের ছোট। পরিচয় ও কুশলাদি বিনিময়ের পর তাঁকে কখন কি করতে হবে সব বুঝিয়ে বলল রানা।

সবশেষে আবার কার্চিক জোড়া প্রসঙ্গ ফিরে এল। মুর্তজায়েভ থমথমে গলায় বললেন, 'আমি একটা পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। প্রথম সুযোগেই আমার উচিত ছিল জোড়াকে খুন করা। তুমি যদি সুযোগ পাও, রানা, অবশ্যই তাকে খুন করবে। জীবনে যত পাপই করে থাকো, যত বড়ই হোক, তাকে খুন করতে পারলে নির্ঘাত তা মাফ হয়ে যাবে।'

আবার টেলিফোন বাজছে, শুনতে পেয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা। হ্যান্ডশেক করার সময় মুর্তজায়েভকে বলল, 'কোটর থেকে ফিরে এসে আমি আপনার ফোনের অপেক্ষায় থাকব।'

'আল্লাহ তোমার সহায় হোন,' বিড়বিড় করলেন মুর্তজায়েভ।

সাত

গেট পার হয়ে বাড়ি থেকে বেরুতেই নিজের ভুলটা ধরতে পারল রানা। ফাঁকা রাস্তা খাঁ-খাঁ করছে, কোথাও কোন গাড়ি নেই। ওর আসলে উচিত ছিল ফোনে একটা ট্যাক্সি ডাকা। আবার বাড়ির ভেতর ফিরে যাবে কিনা ভাবল। না, মুর্তজা দম্পতিকে বিব্রত করা হবে। তাছাড়া, গার্ডরাও হয়তো অনুমতি দেবে না।

অগত্যা হাঁটতে শুরু করল ও। একটু অবাকই হলো, গার্ডরা ওকে সার্চ না করেই যেতে দিচ্ছে।

একশো গজ এগিয়ে প্রথম বাঁকটা ঘুরল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না–না কোন পথিক, না কোন গাড়ি। সামনেও পরবর্তী বাঁক পর্যন্ত পুরোপুরি ফাঁকা রাস্তা। বেল্ট থেকে ওয়ালথারটা বের করে অ্যামিউনিশন আর সেফটি চেক করল ও, তারপর ওভারকোট খুলে ঝোলাল কনুইয়ের ভাঁজে, অস্ত্রটা রাখল কোট আর বাহুর মাঝখানে।

আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা ক্রমশ নিচু হয়ে নেমে গেছে। দু'পাশে কখনও দেখা যাচ্ছে উঁচু পাঁচিল, আবার কখনও কাঁটাতারের বেড়া। বেড়ার গায়ে লতানো গাছ থাকায় ভিলাগুলোকে রাস্তা থেকে দেখা যায় না। রানার চোখ-কান সতর্ক হয়ে আছে। কাউকে দেখতে না পেলেও, শিরশিরে একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর, যেন আড়াল থেকে কেউ ওকে লক্ষ করছে।

অ্যামবুশের জন্যে জায়গাটা আদর্শ। এখানে যদি কোন গুলি হয়, আশপাশের ভিলা থেকে কেউ দেখতে আসবে না কার লাশ পড়ল। দৌড়ে এলাকাটা পার হয়ে যাবার অদম্য ঝোঁক চাপলেও, দৃঢ় অথচ অলস একটা ভঙ্গিতে হাঁটছে রানা। আড়াল থেকে যে-ই লক্ষ করুক, তাকে বুঝতে দিতে চায় না যে ও নার্ভাস বোধ করছে। ডান পাশে হঠাৎ একটা ঝোপ ঝাঁকি খাওয়ায় বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর। কোটের আড়াল থেকে চোখের পলকে ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথারটা। ডানা ঝাপটে ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল সোনালি একটা চিল, ঝোপ থেকে বাচ্চা একটা খরগোস ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পিস্তলটা আবার জায়গা মত রেখে দিল রানা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর পাশের বেড়া বিস্ফোরিত হলো, কয়েকটা কাঠের টুকরো বর্শার মত ছুটে গেল চারদিকে। ডাইভ দিয়ে রাস্তার ওপর পড়ল রানা, উপলব্ধি করল হাই-পাওয়ারড্ রাইফেল দিয়ে কেউ একজন গুলি করছে ওকে। কড়াৎ! দ্বিতীয় বুলেটটা ছুটে এল একটু পরেই, এবার চুরমার করল উল্টোদিকের খানিকটা বেড়া। স্নাইপার ওকে একজোড়া ব্র্যাকেট-এর মধ্যে আটকে ফেলেছে। মনে মনে হিসাব কষে রানা আন্দাজ করল, ওর পিছন দিকের পেঁচানো পাহাড়ী রাস্তায় রয়েছে লোকটা, ওর রাস্তা থেকে অনেকটা ওপরে। রাস্তায় শুয়েই ঘাড় বাঁকা করে তাকাল ও। রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু লোকজন চোখে পড়ছে না। দেখতে পেলেও কোন লাভ হত না, ওয়ালথারের রেঞ্জ থেকে অনেক দূরে রাস্তাটা। তৃতীয় বুলেটটা বাতাসে শিস কেটে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। ক্রল করে রাস্তা থেকে ফুটপাথে উঠে এল রানা। বিপদের সময় আপনা থেকেই শান্ত হয়ে এল মাথাটা। বাঁচার একটাই উপায় দেখতে পাচ্ছে ও—এই রাস্তা ত্যাগ করা। আর তা করতে হলে সামনের বাঁকটা ওকে ঘুরতে হবে।

ফুটপাথ ধরে ক্রল করে এগোচ্ছে, নাকের এক হাত সামনে কংক্রিটের উপর লাগল বুলেট, কণাগুলো ছিটকে চোখেমুখে আঘাত করল। স্থির হয়ে গেল রানা। স্নাইপার ওকে নিয়ে খেলছে। যেখানে খুশি গুলি করে বুঝিয়ে দিচ্ছে, ইচ্ছে করলেই ওকে খুন করতে পারে সে। লোকটা যেহেতু মার্কসম্যান, তার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে, ইচ্ছে করলে প্রথম গুলিতেই খুন করতে পারত।

এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা। কালো একটা মার্সিডিজ। রানার সন্দেহ হলো, গাড়িটাকে আগেও একবার কোথাও দেখেছে ও। তারপর মনে পড়ল—নোভার ফ্ল্যাটে যাবার সময় হোটেল থেকে ট্যাক্সি নেয় ও, তখনই রাস্তার ওপার থেকে একটা কালো মার্সিডিজ ওর পিছু নিয়েছিল। এটাই কি সেটা?

রানা ভাবছে এখন কি করবে। ড্রাইভারকে গুলি করবে, নাকি চাকায় গুলি

করে অচল করে দেবে গাড়িটা? কিন্তু এ-গাড়ি যদি সেই গাড়ি না হয়?

তীর বেগে ছুটে আসছে মার্সিডিজ। ওয়ালথারটা ডান হাতে নিল রানা, রাস্তায় বাম কনুই ঠেকিয়ে ডান কব্জি রাখল হাতের তালুতে। গাড়ি কাছে চলে এসেছে, কিন্তু থামার কোন লক্ষণ নেই। জানালা থেকে উড়াল দিল বোতলটা, সরাসরি ওর দিকে ভেসে আসছে। দেখেই জিনিসটা চিনতে পারল রানা। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল, পরমুহূর্তে যেখানে বোতলটা পড়ার কথা সেখান থেকে সরে যাবার জন্যে ঝাঁপ দিল আরেক দিকে। ডাইভ দেয়া অবস্থায়, শূন্যে রয়েছে ও, কাঁচ ভাঙার আওয়াজ শুনতে পেল, দেখল ওভারকোটটায় আগুন ধরে গেছে। উল পোড়ার কটু গন্ধ ঢুকল নাকে। বাম হাতটা ঝাঁকিয়ে কোট খসাল ও, কিন্তু এরই মধ্যে জ্যাকেটের আস্তিনেও ধরে গেছে আগুন। আশঙ্কা করছে যে-কোন মুহূর্তে বুলেটের ধাক্কা খাবে, এক লাফে সিধে হলো, টেনে-হিঁচড়ে গা থেকে খুলে ফেলল জ্যাকেটটা, পা দিয়ে মাড়িয়ে আগুন নেভাচ্ছে। আট থেকে দশ ফুট উঁচু একটা আগুন জ্বলছে রাস্তায়, আলকাতরা গলে যাচ্ছে। ওর গুলি সময়ের আগেই ফাটিয়ে দিয়েছে মলোটভ ককটেলটাকে, ফলে শুধু জ্বলন্ত গ্যাসোলিনের বাইরের কিনারা ওর কোটের নাগাল পেয়েছিল।

ঘাড় ফিরিয়ে মার্সিডিজের দিকে তাকাল রানা, হাতে ওয়ালথার প্রস্তুত। রাস্তার শেষ মাথায় প্রকাণ্ড একটা মিতসুবিসি দেখতে পেল ও, আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে পথ বন্ধ করে রেখেছে। কালো মার্সিডিজ সজোরে ব্রেক কষল, কাতর আর্তনাদ করে উঠল টায়ার, তারপরই শোনা গেল কর্কশ ধাতব সংঘর্ষের গা রিরি করা শব্দ। প্রকাণ্ড জীপে ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এল মার্সিডিজ, তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল রাস্তার ধারে।

মার্সিডিজ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল সেই কালো লেদার জ্যাকেট। লাফ দিয়ে সিধে হলো সে, হাতে অস্ত্র, সরাসরি রানার দিকে ছুটে আসছে। লোকটা গোলগাল আকৃতির, মোটা, কিন্তু পায়ে যেন এক্সপ্রেস ট্রেনের গতি। জীপের পিছন থেকে তিনজন লোক উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, এখন তারাও ছুটে আসছে কালো জ্যাকেটের পিছু নিয়ে। তিনজনের মধ্যে একজনকে চিনতে পারল রানা। ড. সিডাক। বাকি লোক দু'জন বেল্ট লাগানো রেনকোট পরে আছে। তিনজনই ওরা ধাওয়া করছে লেদার জ্যাকেটকে। পাহাড় পেঁচানো রাস্তা থেকে আবার গর্জে উঠল রাইফেলটা। ড. সিডাকের একজন সঙ্গী মুখ থুবড়ে রাস্তার ওপর পড়ে গেল, তারপর আর নড়ল না।

আরেকটা গুলি হলো, তবে লাগল না কাউকে। মাথা ঘুরিয়ে পাহাড়টার দিকে তাকাল রানা। ওদিকের রাস্তায় এখন দু'জন লোক দেখা যাচ্ছে। আকাশের দিকে খাড়া একটা রাইফেল নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে তারা। তাদের মধ্যে একজন সেই তালগাছ, কার্চিক জোডার যমজ ভাই জর্জিক। অপরজনকে দেখে মনে হলো জেমস ফোলি। তবে রানা নিশ্চিত হবার আগেই ধস্তাধস্তি করতে করতে চোখের আড়ালে চলে গেল তারা।

লেদার জ্যাকেট রানার দিকে তীর বেগে ছুটে আসছে, তবে ড. সিডাকের পায়ের গতি তার চেয়েও বেশি মনে হলো। সামনে রানা, পিছনে ড. সিডাক,

ফাঁদে পড়ে গেছে লেদার জ্যাকেট। হঠাৎ ঘুরল সে, সরাসরি ড. সিডাকের দিকে অস্ত্র তুলল। তবে তার আগে গর্জে উঠল রানার ওয়ালথার। লেদার জ্যাকেটের ডান কাঁধ চুরমার হয়ে গেল। হাত থেকে খসে পড়া পিস্তলটা তোলার জন্যে ঝুঁকল সে, এই সময় ড. সিডাক ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পুলিস প্রধানের এক হাতে রিভলবার, অপর হাতে লংশোরম্যান'স লোডিং হুক, রানার হোটেল কামরায় যেটা পাওয়া গিয়েছিল। লোহার রডটা সবেগে লেদার জ্যাকেটের উন্মুক্ত ঘাড়ে নামিয়ে আনলেন তিনি। আর্তনাদ করে রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ল লোকটা, রডটা তার হৃৎপিণ্ডে গেঁথে গেছে। কয়েকটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল স্থূল শরীরটা।

তার পাশে দাঁড়িয়ে সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছেন ড. সিডাক। দিগন্তের কাছে ঝুলে থাকা সূর্যের আলো প্রতিফলিত হলো তাঁর চশমার কাঁচে। রানা দেখল, লেদার জ্যাকেটের মাথায় একটা পা রাখলেন ড. সিডাক। তবে তা মাত্র মুহূর্তের জন্যে। রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে জোর করে ক্ষীণ একটু হাসলেন। 'মলোটভ ককটেলের বদলে ওরা যদি গ্রেনেড ব্যবহার করত…' বাক্যটা তিনি শেষ করলেন না। যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, এমন ভঙ্গিতে কপালে হাত রেখে পাহাড়টার দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

'স্নাইপার লোকটা ইচ্ছে করলে আমাকে মেরে ফেলতে পারত,' বলল রানা। 'আমাকে নিয়ে তার বোধহয় অন্য কোন প্ল্যান ছিল।' হাতের ওয়ালথারটা বেল্টে গুঁজে রাখল ও।

'রাইফেল নিয়ে ওখানে কে আছে, আপনি চিনতে পেরেছেন?'

'সম্ভবত কার্চিক জোড়ার ভাই।'

রেনকোট পরা অক্ষত লোকটা ফিসফিস করল, সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ড. সিডাক। প্রতিবার একটা করে লাশ বয়ে নিয়ে গেল সে, জীপে তুলল, তারপর স্টার্ট দিয়ে চলে গেল। জীপটা চলে যাবার পর ওদিকে এখন আরও একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে।

পাহাড়ের দিকে আবার তাকালেন ড. সিডাক। 'ঠিক বুঝতে পারছি না, রাইফেলটা চুপ করে আছে কেন।'

নিজের জ্যাকেটটা তুলে আনল রানা। পকেট থেকে সমস্ত কাগজ-পত্র বের করে ট্রাউজারের পকেটে ভরল। মলোটভ ককটেলটা এখনও জ্বলছে, তবে নিভে এসেছে আগুন। রাস্তার ওপর তরল আলকাতরা গড়াচ্ছে। গ্রেনেড ব্যবহার করা হয়নি, কারণ ডকুমেন্ট ও পাণ্ডুলিপি সহ রানাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল ওরা। জ্যাকেটের আস্তিন পুড়ে গেছে, তবু সেটা গায়ে চড়াল রানা।

'কোথায় ওটা, মি. রানা?'

'কোথায় কোনটা?' না বোঝার ভান করল রানা।

'পাণ্ডুলিপি আর টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট।' চশমার ভেতর ড. সিডাকের চোখে পলক পড়ছে না।

মাথা নাড়ল রানা। 'ডকুমেন্ট সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেননি মুর্তজায়েভ।'

'আপনি জিজ্ঞেস করেননি?'

'অবশ্যই জিজ্ঞেস করেছি,' বলল রানা। 'কিন্তু প্রশ্নটা কৌশলে এড়িয়ে গেছেন

তিনি।'

'তারমানে ফাইলটার ফটোস্ট্যাট করা কপি তাঁর কাছে আছে?'

'থাকতে পারে, তবে স্বীকার বা অস্বীকার কোনটাই করেননি। আমাকে তিনি শুধু তাঁর পাণ্ডুলিপির কথা বলেছেন।'

'কি বলেছেন?'

'মোট তিনটে পাণ্ডুলিপি, ড. সিডাক,' বলল রানা। 'কিন্তু কোনটাই কমপ্লিট নয়। বলেছেন কমপ্লিট হলেই তিনি আমাকে জানাবেন।'

'আপনি সত্যি কথা বলছেন কিনা বুঝব কিভাবে?'

'তার মানে আপনি আমাকে সার্চ করতে চান, এই তো?'

ঠোঁট কামড়ে কি যেন চিন্তা করলেন ড. সিডাক। 'আপনি তাহলে আরও কিছুদিন বেলগ্রেডে থাকছেন?'

'না, আপাতত বেলগ্রেডে থাকছি না,' বলল রানা। 'ভাবছি মন্ট্রিনিগ্রোয় যাব একবার। পোডগোরিকায় কয়েকজন লেখক আছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করব। দেশটাও ঘুরে দেখা হবে।'

'গুলিটা ঠিক সময় মতই করেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ, মি. রানা।'

'ওটা লাকি শট ছিল,' বলল রানা। তারপর প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল ড. সিডাক এখানে এলেন কিভাবে।

পুলিস চীফ ব্যাখ্যা করলেন। কালো মার্সিডিজ রানার পিছু নিয়েছিল, এ-খবর নোভার কাছ থেকে পান তিনি। একটু খোঁজ করতেই পুলিস ওটার সন্ধান পেয়ে যায়। কালো লেদার জ্যাকেটকে আজ সারাটা দিনই অনুসরণ করেছে তারা। দুপুরের পর অবশ্য গাড়িটা হারিয়ে যায়। তবে এদিকে আসার পথেই হারায় সেটা। সিসটো, মিতসুবিসি জীপের ড্রাইভার, আন্দাজ করে সাঈদ মুর্তজায়েভের বাড়ির দিকেই এসেছে মার্সিডিজ। সেজন্যেই রাস্তা ব্লক করে অপেক্ষা করছিল সে। সিসটোর অনুমান ভুল হয়নি। তবে অনুমান সঠিক হওয়াতেই মরতে হয়েছে বেচারাকে।

সিটি শেরাটনের সামনে গাড়ি থামালেন ড. সিডাক। রানাকে বললেন, 'এখন তাহলে অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই, তাই না?'

'না, নেই।'

'সেক্ষেত্রে সময় নষ্ট না করে অন্যান্য লেখক-সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের কাজটা সেরে ফেলতে পারেন আপনি। তালিকাটা আপনি নোভাকে দিলে, হেডকোয়ার্টার থেকে আমরা নির্দিষ্ট দিন-তারিখ স্থির করে দেব।'

'ঠিক আছে,' বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা।

স্যুইটে ফিরে ওয়ালথারটা রিলোড করল রানা। ড. সিডাকের ওপর নোভার প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। ওর হাতে ওয়ালথারটা দেখার পরও ওকে তিনি কোন প্রশ্ন করেননি।

শাওয়ার সেরে ইন্টারকমে কফির অর্ডার দিল রানা। দশ মিনিট পর দরজায় নক হলো। দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল জেমস ফোলি, তার

পিছনে বিলিয়ার্ড ও ওয়েটার।

সিটিংরুমে ঢুকেই ধপ করে একটা সোফায় বসে পড়ল ফোলি। তার কপালের পাশে চৌকো ও সাদা অ্যাডহেসিভ টেপ লাগানো রয়েছে। ওয়েটার ট্রে রেখে চলে যাবার পর রানা জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে আপনার?'

'আপনার শত্রু ওই দুইনম্বর জোড়ার সঙ্গে মতের মিল হয়নি,' বলল ফোলি, ব্যথায় মুখটা কুঁচকে রেখেছে। 'অফিশিয়ালি, একটা দরজার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছি।'

'পাহাড়ের ওপর তাহলে আপনিই ছিলেন?'

'আপনাকে নিয়ে ওদের ইঁদুর-বেড়াল খেলাটা আমি মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছি,' বলল ফোলি। 'এ উপলক্ষে ইচ্ছে করলে আপনি আমাকে হুইস্কি খাওয়াতে পারেন।'

'ফোলি, প্লীজ,' মৃদু তিরস্কারের সুরে বললেন বিলিয়ার্ড, একটা সোফার হাতলে বসেছেন তিনি। 'তুমি জানো মি. রানা ও-সব খান না।'

হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল ফোলি। 'ঠিক আছে, হুইস্কির বদলে কফিই হোক।'

'হেলপ ইওরসেলফ,' বলল রানা।

কিন্তু কফি পটের দিকে হাত না বাড়িয়ে ফোলি জিজ্ঞেস করল, 'ওটা আপনি এনেছেন?'

'কোন্‌টা?'

'মি. রানা, প্লীজ। আমি সাঈদ মুর্তজায়েভের পাণ্ডুলিপির কথা জানতে চাইছি।'

'উনি আমাকে কোন পাণ্ডুলিপি বা অন্য কিছু দেননি,' বলল রানা। 'তবে বলেছেন, কমপ্লিট হলে আমাকে জানাবেন।'

'কমপ্লিট হলে জানাবেন?' বিড় বিড় করল ফোলি। 'লেখাটা কি নিয়ে, কোন আভাস দিয়েছেন?'

'আভাস নয়, স্পষ্টই বলেছেন। পুরো বইটাই মার্কিনীদের বলকান নীতির বিরুদ্ধে লেখা।'

'তাহলে তো অবশ্যই ওই পাণ্ডুলিপি আমাকে পেতে হবে,' জেদের সুরে বলল ফোলি। 'আপনাকে কথা দিতে হবে, মি. রানা—পাওয়া মাত্র ওটা আপনি আমার হাতে তুলে দেবেন।'

'এতই যদি তাগাদা অনুভব করেন, যান না, সাঈদ মুর্তজায়েভের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনুন,' বলল রানা। 'আপনার আর কিছু বলার আছে? না থাকলে কফি খেয়ে দয়া করে বিদায় হন, আমার কাজ আছে।'

সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ফোলি। 'আপনার কি এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধও নেই? মাত্র খানিক আগে আমি আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছি, এত তাড়াতাড়িই ভুলে গেলেন?'

'সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ,' বলল রানা। 'কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রাণ বাঁচিয়েছেন বলে অন্যায় আবদার করবেন? যান, বিদায় হোন।'

'আপনি আসছেন, মি. বিলিয়ার্ড?' দরজার দিকে পা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল

ফোলি।

'না, তুমি যাও, আমি পরে আসছি।'

ফোলি বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে দিল রানা।

'ওকে এভাবে অপমান না করলেও পারতেন আপনি, মি. রানা।' বিলিয়ার্ডকে চিন্তিত মনে হলো। 'পাণ্ডুলিপিটা পেলে সে হয়তো আপনাকে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগটা ব্যবহার করতে দিত।'

রানা বলল, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনাদের কারও কোন সাহায্য আমি নেব না।'

'ডকুমেন্টটা তাহলে কিভাবে নিয়ে যাবেন?'

'আগে সেটা পাই, তারপর ভেবে দেখব।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'দানিয়ুবের কাছে সাকায়েভ নামে একটা রেস্তোরাঁ আছে, চেনেন আপনি?'

'হ্যাঁ, চিনি। কেন?'

'ভাবছিলাম, জায়গাটা কেমন। ওখানে আমার একটা ডিনার ডেট আছে।'

'অভিজাত রেস্তোরাঁ, এলিটরাই খাওয়াদাওয়া করে ওখানে। আপনাকে আমি দেরি করিয়ে দিচ্ছি না তো?'

'না, একটু পরে বেরুলেও চলবে।'

'বাইরে আমার গাড়ি আছে,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই। যাবার পথে দু'চারটে কথাও বলব।'

বিলিয়ার্ড আজ ঝকঝকে একটা পাজেরো নিয়ে এসেছেন। নিজেই ড্রাইভ করছেন তিনি। 'ড. সিডাক আপনার বক্তব্য শান্তভাবে মেনে নিলেন, মি. রানা? আপনাকে নিশ্চয়ই তিনি সার্চ করেছেন?'

'সবাই ফোলির মত অভদ্র নয়,' বলল রানা।

'পাণ্ডুলিপি কমপ্লিট হয়নি, ভাল কথা। কিন্তু ডকুমেন্টটা?'

'ডকুমেন্ট সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি।'

'সম্ভবত পাণ্ডুলিপির সঙ্গেই ওটা আপনাকে দেবেন তিনি।'

'দিলেই বা কি। আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে।'

'হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই। সেজন্যেই বলছি, আপনি ফোলির সাহায্য নিতে আপত্তি করছেন কেন? আপনার বোধহয় ভয়, পাণ্ডুলিপিটা দিলে ফোলি সেটা নষ্ট করে ফেলবে। সেক্ষেত্রে মূল পাণ্ডুলিপি নিজের কাছে রেখে, ফটোস্ট্যাট করা একটা কপি দিলেও তো পারেন।'

রানা হেসে উঠল। 'আপনার কি ধারণা, তাতে সে সন্তুষ্ট হবে?'

'আপনি রাজি থাকলে আমি তাকে বলে দেখতে পারি। বিনিময়ে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগটা ব্যবহারের সুযোগ দিতে বলব।'

কথা না বলে চুপ করে থাকল রানা।

'মি. মুর্তজায়েভ আমার বা নোভা সম্পর্কে কিছু বললেন?' জিজ্ঞেস করলেন বিলিয়ার্ড।

'হ্যাঁ, অনেক কথাই বললেন। আপনি একবার তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। নোভাকে তিনি আপনার মাধ্যমেই সাহায্য করেন। আচ্ছা, নিকোলাই সুনজাককে

যে মুর্তজায়েভ খুন করেননি, এ তো আপনি প্রথম থেকেই জানেন, তাই না? তাহলে নোভার ভুল ধারণাটা ভেঙে দেননি কেন?'

'নোভার মাকে কথাটা আমি অনেক বারই বলার চেষ্টা করেছিলাম,' বিলিয়ার্ড বললেন। 'কিন্তু কোন লাভ হয়নি। মুর্তজায়েভের নাম পর্যন্ত শুনতে চাইত না সে। আসলে যে পরিস্থিতিতে সুনজাক খুন হয়, খুনী হিসেবে মুর্তজায়েভকেই সবাই সন্দেহ করত। নোভা তখন ছোট ছিল, কাজেই তাকে বলার সুযোগ ছিল না। সে বড় হবার পরও বলিনি, কারণ সে-ও তার মায়ের মত মুর্তজায়েভের নাম পর্যন্ত শুনতে চায় না। তাছাড়া, আমরা কেউই ওই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী নই।'

সাকায়েভের সামনে গাড়ি থামালেন বিলিয়ার্ড। রানা বলল, 'আপনার কৌতূহল হচ্ছে না, কার সঙ্গে আমি ডিনার খেতে যাচ্ছি?'

মুচকি হেসে বিলিয়ার্ড বললেন, 'আমি জানি। ফোনে নোভার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা।

রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই হেড ওয়েটার সরাসরি ওর দিকে এগিয়ে এল। 'মি. মাসুদ রানা?' রানা মাথা ঝাঁকাতে হাসল। 'আমার সঙ্গে আসুন, স্যার।' আগেই বলে রেখেছিল নোভা, রানাকে পর্দা ঘেরা একটা কেবিনে পৌঁছে দিল সে।

উদ্বেগ আর উত্তেজনায় কাহিল হয়ে পড়েছে নোভা। রানাকে দেখে প্রথমে সে কোন কথাই বলতে পারল না। তারপর, রানাকে বিব্রত ও বিহ্বল করে দিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। 'ওহ্ গড! কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব...ওহ্ গড! আমি ধরেই নিয়েছিলাম ওরা তোমাকে...'

নোভার কাঁধে একটা হাত রেখে মৃদু চাপ দিল রানা। 'শান্ত হও, মিষ্টি মেয়ে।' রুমালটা তার হাতে গুঁজে দিল। 'তুমি আমার ভাল চাও, এই বোধটাই আমাকে শক্তি এনে দিচ্ছে—ফলে ওরা আমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।' বেল বাজিয়ে ওয়েটারকে ডাকল ও। 'কি খাবে তাড়াতাড়ি বলো, আমার নাড়ীভুঁড়ি সব জ্বলছে।'

আট

ড. সিডাক তাঁর কথা রাখলেন। পরদিন রানার ব্রেকফাস্ট টেবিলে পৌঁছে গেল খামে ভরা শেডিউল। কোন্ লেখকের সঙ্গে কোথায় কবে দেখা হবে, সবই তাতে বিস্তারিত লেখা আছে, লেখক সংঘকে দেয়া পুলিসের অনুমতি-পত্র সহ। শেডিউল পড়ে রানা জানতে পারল, আগামী পনেরো দিন পাঁচটা শহরে ঘুরে বেড়াতে হবে ওকে, কিন্তু এগুলোর মধ্যে মন্ট্রিনিগ্রোর কোন শহর নেই। খামে ছোট্ট একটা চিরকুটও পাওয়া গেল, তাতে ড. সিডাক রানাকে পরামর্শ দিয়ে লিখেছেন—দোভাষী হিসেবে লিলিয়ান নোভা ওর সঙ্গে থাকলে ভাল হয়, কারণ বেশিরভাগ লেখক-সাহিত্যিকই ইংরেজি বা অন্য কোন বিদেশী ভাষা জানেন না।

তাছাড়া, ওর একজন গাইডও দরকার হবে।

কিছুক্ষণ পর ফোন করে নোভা ওকে জানাল, শেডিউলের একটা কপি সে-ও পেয়েছে। রানাকে তৈরি থাকতে বলল, আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে ওকে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাবে–প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ওখানেই।

ছোট একটা ফিয়াট নিয়ে ঠিক আধ ঘণ্টা পরই পৌঁছাল সে। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা, রোগা বলা যাবে না, হালকা নীল রঙের টুইড সুটটা দারুণ মানিয়েছে। রওনা হবার পর রানা লক্ষ করল, একটা কার অনুসরণ করছে ওদেরকে, ড্রাইভার ছাড়াও পিছনে বসে আছে ইউনিফর্ম পরা দু'জন পুলিস।

সেদিনই বিকেলে হোটেলে ফেরার সময় একটা ইংরেজি দৈনিক কিনে রানার হাতে ধরিয়ে দিল নোভা। খবরটা প্রথম পাতাতেই বেরিয়েছে। হেডিং-এ বলা হয়েছে–চুরি যাওয়া গোপন রাষ্ট্রীয় দলিল উদ্ধারে বাধা দেয়ায় পুলিসের হাতে যুবনেতা সেরোনোভিচ খুন!

খবরটা রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলল রানা। রাস্তার ওপর যার ঘাড়ে ড. সিডাক লোহার রড গাঁথেন, সে-ই যুবনেতা সেরোনোভিচ। পুলিসের হেডকোয়ার্টার থেকে দেয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নির্জন পাহাড়ী রাস্তায় চুরি যাওয়া গোপন দলিল পুনরুদ্ধারের জন্যে ফাঁদ পেতে ছিল পুলিস। ওই রাস্তা দিয়ে একজন বিদেশী লোকের আসার কথা ছিল, যার কাছে গোপন দলিলটা থাকার কথা। যেভাবেই হোক, এই খবর সিক্রেট পুলিসের পলিটিক্যাল ক্রাইম সেকশন থেকে ফাঁস হয়ে যায়। পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেরোনোভিচ ওই রাস্তায় ওত পেতে ছিল। বিদেশী লোকটার গাড়ি থামিয়ে দলিলটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করে সে। গোলাগুলি শুরু হবার পর পুলিস সেখানে পৌঁছায়। হাতেনাতে ধরা পড়ে যাচ্ছে দেখে পুলিসকে গুলি করে সেরোনোভিচ, ফলে পুলিস আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি করতে বাধ্য হয়। মারা যাবার আগে সেরোনোভিচ স্বীকার করেছে, দলিলটা বিদেশী এক দূতাবাসে বিক্রি করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। পুলিস অবশ্য দলিলটা উদ্ধার করতে পারেনি। বিদেশী লোকটার সঙ্গে আরও একজন লোক ছিল, ধারণা করা হচ্ছে দলিলটা নিয়ে পালিয়েছে সে।

পরবর্তী দুই হপ্তা কাজের মধ্যে ডুবে থাকল ওরা। আশপাশে কেউ না থাকলে ওকে রানা বলে ডাকে নোভা, অন্যান্য সময় মি. রানা বলে। তার সঙ্গে লেখক সংঘের অফিসে গেল রানা, গেল বিভিন্ন লেখকদের ভিলা ও ম্যানসনে। কখনও ফিয়াট ব্যবহার করল ওরা, কখনও রেন্ট-আ-কার থেকে ভাড়া করা মার্সিডিজ। বেলগ্রেডের বাইরে যাবার সময় প্লেনেও চড়তে হলো। ব্যক্তিগত সম্পর্কটাকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলার কোন চেষ্টাই ওদের কারও মধ্যে দেখা গেল না। হোটেলে আলাদা কামরায় থাকল, কাজের ফাঁকে অবসর সময় কাটাল চিত্র-প্রদর্শনী বা নাটক দেখে। একবার একটা কনসার্টেও গেল।

নিজের কাজে অত্যন্ত দক্ষ নোভা। লেখক-সাহিত্যিকরা সবাই তাকে চেনেন, বয়েসে ছোট হলেও তাঁরা তাকে সমীহের দৃষ্টিতেই দেখেন।

বেলগ্রেডে থাকুক বা অন্য কোন শহরে যাক, ওদের সঙ্গে সব সময় ছায়ার মত লেগে থাকল দু'জন সশস্ত্র পুলিস। ব্যাপারটা রানার মাথাব্যথার কারণ হয়ে

দাঁড়াল। পোডগোরিকা হয়ে কোটর আর বাডভায় যেতে হলে নোভার সঙ্গেই যেতে হবে ওকে। কিন্তু সেখানেও যদি ওদের সঙ্গে পুলিস থাকে, তাহলে তো বিরাট সমস্যা। পুলিস দেখলে মুর্তজায়েভের আত্মীয় হয়তো রানার ধারেকাছেও ঘেঁষতে সাহস পাবে না।

সমস্যা আরও একটা আছে। মন্ট্রিনিগ্রোয় বেড়াতে যাবার কথাটা এরই মধ্যে ড. সিডাককে একবার বলেছে রানা। আবার যদি নোভাকে বলে, ওদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। ও চাইছে, ওখানে বেড়াতে যাবার প্রস্তাবটা নোভার তরফ থেকেই আসুক।

তারপর রানা টের পেল, শুধু পুলিস নয়, দূর থেকে আরও কেউ ওদেরকে চোখে চোখে রাখছে। বারবার গাড়ি বদল করায় তাদের কাউকে স্পষ্ট ভাবে দেখতে বা চিনতে পারা গেল না। ফলে ওদের পরিচয় সম্পর্কে রানার সংশয়টাও থেকে গেল। কার্চিক জোড়া বা তার প্রতিনিধি হতে পারে। আবার জেমস ফোলির ইনফরমার হওয়াও বিচিত্র নয়।

দেখতে দেখতে দু'হপ্তা পার হয়ে গেল। নোভি শাদ থেকে প্লেনে চড়ে বেলগ্রেডে ফিরে এল ওরা। এয়ারপোর্টে নেমে অ্যারাইভাল লাউঞ্জে লাগেজ আসার অপেক্ষায় রয়েছে রানা, একটু আসছি বলে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল নোভা। ফিরল বেশ অনেকক্ষণ পর, হাতে একটা দৈনিক। আঙুল দিয়ে খবরটা রানাকে দেখিয়ে দিল সে।

পড়তে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে এল রানার। ওর বেলগ্রেড অ্যাসাইনমেন্ট ব্যর্থ হতে চলেছে, এ তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত। খবরে বলা হয়েছে, প্রখ্যাত রাজনীতিক ও দার্শনিক সাঈদ মুর্তজায়েভ হঠাৎ করে অসুস্থ বোধ করায় সরকার একটা মেডিকেল বোর্ড গঠন করেছেন। বোর্ড মুর্তজায়েভকে পরীক্ষা করে জানিয়েছে, তিনি নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার। বহুবছর গৃহবন্দী অবস্থায় আছেন, এটাকেই কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বোর্ড সুপারিশ করেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাঈদ মুর্তজায়েভকে মানসিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা দরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, তাঁরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন।

খবরটা পড়ে রানা কোন মন্তব্য-করা থেকে বিরত থাকল। নোভাও কিছু বলল না।

ট্যাক্সি নিয়ে শহরে ফিরল ওরা। নোভার অনুরোধে তার ফ্ল্যাটে এল রানা। ওকে নিজের বেডরুমে বসিয়ে ভেতরে চলে গেল সে, ফিরে এল কফি নিয়ে। একটু পরই ফোনটা বেজে উঠল। দু'একটা কথা বলে রিসিভারটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল নোভা। 'তোমার ফোন, সিডাক আঙ্কেল কথা বলবেন।'

রিসিভার নিয়ে রানা বলল, 'বলুন, মি. সিডাক।'

'সব খবর ভাল তো, মি. রানা?' পুলিস চীফ জানতে চাইলেন। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বললেন, 'নোভা বলল, বেচারি মি. মুর্তজায়েভের অসুস্থতা সম্পর্কে খবরটা আপনি পড়েছেন। সত্যি, খুবই দুঃখজনক।'

'হ্যাঁ, খবরটা পড়েছি,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'কিন্তু বোধগম্য হয়নি, মি. সিডাক। সাঈদ মুর্তজায়েভ আমার বা আপনার চেয়ে বেশি অসুস্থ নন। তাঁকে

আপনারা ষড়যন্ত্র করে পাগলা-গারদে পাঠাতে চাইছেন।'

'আপনি চান আমরা যেন তাঁকে মেন্টাল হস্‌পিটালে না পাঠাই?'

'আমি চাওয়ার বা না চাওয়ার কে?' বলল রানা। 'তবে আমি যতটুকু বুঝি, তাঁকে পাগলা-গারদে পাঠালে আপনাদেরই ক্ষতি।'

'কি রকম?'

'ডকুমেন্টটা যদি সত্যিই মি. মুর্তজায়েভের কাছে থাকে,' বলল রানা, 'নিশ্চয়ই গোপন কোন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন তিনি। তাঁকে পাগলা-গারদে পাঠালে সেটা ফিরে পাবার আশা আপনাদেরকে ত্যাগ করতে হবে।'

'সরকার এখুনি তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠাচ্ছে না,' পুলিস চীফ বললেন। 'ওখানে পাঠাবার কথা বলে তাঁকে আসলে তাগাদা দেয়া হচ্ছে–তিনি যাতে তাড়াতাড়ি ডকুমেন্ট আর পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে তুলে দেন।'

'ভুলে যাবেন না, তিনি সময় চেয়েছেন,' বলল রানা। 'আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে একটা পরিবেশ তৈরি করেছি, ফলে আমার হাতে ডকুমেন্টটা তুলে দিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছেন তিনি। এখন যদি খোঁচাখুঁচি করা হয়, পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ভয় পেয়ে তিনি হয়তো আর কারও হাতে তুলে দেবেন ওগুলো। আপনারা কি তাই চান?'

'আর কারও হাতে কিভাবে তুলে দেবেন?' জিজ্ঞেস করলেন ড. সিডাক। 'এখন থেকে আমরা তাঁর সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দিচ্ছি না।'

'আপনি বলতে চাইছেন এ-দেশের মানুষ ঘুষ খায় না? তাছাড়া, ওগুলো যে তাঁর বাড়িতেই আছে, কে বলল আপনাকে? হয়তো অন্য কোথাও অন্য কারও কাছে আছে, নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর তিনি ফেরত না চাইলে সেই লোক হয়তো বিদেশী কোন দূতাবাসে দিয়ে আসবে।'

অপরপ্রান্তে চুপ করে আছেন ড. সিডাক। সন্দেহ নেই, চিন্তায় পড়ে গেছেন তিনি।

রানা আবার বলল, 'আমার মতে, ওনাকে আরও কিছু দিন সময় দেয়া দরকার। তিনি যখন আমাকে ডাকবেন, ইচ্ছে করলে আপনিও আমার সঙ্গে যেতে পারেন।'

'আমি গেলে কি ডকুমেন্টটা দেবেন তিনি?' পুলিস চীফের গলায় সন্দেহ।

'মি. মুর্তজায়েভ ভাল করেই জানেন যে ডকুমেন্টটা আমার হাতে তুলে দিলেও আমি সেটা যুগোস্লাভিয়া থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারব না,' বলল রানা। 'যদি দেন, সরকারকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যেই দেবেন। আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনি আমার সঙ্গে থাকলে আমাকে না দিয়ে আপনাকেই দেবেন তিনি। হাজার হোক, এক সময় আপনারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।'

রানার কথায় যুক্তি খুঁজে পেলেন ড. সিডাক। হঠাৎ হেসে উঠে বললেন, 'শুধু কি বন্ধু ছিলাম! আত্মীয়-স্বজন আর প্রতিবেশীরা বলত, আমরা নাকি যমজ ভাই...'

'হ্যাঁ, বলারই কথা!' হাসিটা চেপে রাখল রানা। 'এখন তাহলে রাখি,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল ও।

ওকে ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বলে কিছুক্ষণ আগে বাথরুমে শাওয়ার নিতে

গেছে নোভা। কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে দেখল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত প্রায় ধ্যানমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করছে। তারপর নিঃশব্দে হাসল আপনমনে। বিছানা থেকে নিজের সুটকেসটা তুলে দরজার দিকে এগোবার সময় ভাবল, বিচ্ছেদের ভাব সৃষ্টি করার জন্যে সামান্য নাটকীয়তার আশ্রয় নিলে ক্ষতি নেই। আশা করা যায় নোভা ওর আচরণে অস্থির হয়ে উঠবে।

দরজা খুলে নিঃশব্দে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল রানা। নিচে যথারীতি পাহারা দিচ্ছে গার্ডরা, তবে ওকে কিছু বলল না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরল ও।

শাওয়ার সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে, ফোনটা ঝন ঝন করে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নয়, বেশ কিছুক্ষণ পর রিসিভার তুলল রানা। 'হ্যাঁ, বলো নোভা।'

'তুমি এভাবে চলে গেলে কেন?'

রানা কথা বলছে না।

'রানা?' দশ সেকেন্ড অপেক্ষা করল নোভা। তারপর ব্যাকুল গলায় জানতে চাইল, 'কি হয়েছে তোমার? আমার কোন কথায় বা আচরণে দুঃখ পেয়েছ?'

'না।'

'তাহলে? আমাকে কিছু না বলে তুমি চলে গেলে কেন?'

'আমাকে তুমি ক্ষমা করো, নোভা,' ম্লান গলায় বলল রানা। 'জানি কাজটা উচিত হয়নি, তবে হঠাৎ উপলব্ধি করলাম তোমার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে থাকাই সবদিক থেকে ভাল।'

'কিন্তু কেন?' নোভার গলায় শুধু উদ্বেগ নয়, কাতর অভিমানের সুরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'কেন, তুমি বুঝতে পারো না? সুন্দরী একটা মেয়ের সঙ্গে একটানা পনেরো দিন কাটালাম। তার অতীত বর্তমান সব জানলাম। তার স্বভাব, অভ্যাস, রুচি, বুদ্ধি, সরলতা, কোমলতা যত দেখলাম ততই মুগ্ধ হলাম। শুরু হলো নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। যুদ্ধও বলা যায়। নিজেকে সন্ন্যাসী করে রাখার কঠিন সাধনা। পনেরোটা দিন কম সময় নয়, নোভা। আমি নিজেকে সংযম হারাতে দিইনি। কিন্তু আমিও তো রক্ত-মাংসের মানুষ, বলো? সংযম পালনের আমারও তো একটা সীমা আছে। যখন বুঝতে পারলাম, আমার দ্বারা তোমার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, সিদ্ধান্ত নিলাম দূরে সরে থাকব...'

'ওহ্ গড! ঠিক যা ভেবেছি! প্লীজ, রানা, প্লীজ—আমার কথা শোনো। তুমি যে কতটা ভদ্র, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সে-কথা বলার জন্যে এয়ারপোর্ট থেকে আমার ফ্ল্যাটে আনি তোমাকে। কেন ভাবছ আমার ক্ষতি হয়ে যাবে...'

'নিজেকে চিনি, নোভা,' শান্ত গাম্ভীর্যের সুরে বলল রানা। 'তাই কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। দুঃখিত। পারলে আমাকে ক্ষমা কোরো।' নোভাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল ও।

ঘটনাটা ঘটাবার পর এখন রানা উপলব্ধি করছে, নোভার প্রতি সত্যি সত্যি দুর্বল হয়ে পড়েছে ও। যাকে অসম্ভব ভাল লাগছে, স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষে তার সঙ্গে চালাকি করা শুধু অরুচিকর নয়, এক হিসেবে নীচতাই। তবে এই মুহূর্তে অন্য

কোন উপায়ও তো নেই ওর। পরে নাহয় সময় মত ক্ষমা চেয়ে নেবে।

তারপর নিজেকে রানা স্মরণ করিয়ে দিল, শুধু ক্ষমা চাইলেই হবে না। কারণ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে।

অ্যাসাইনমেন্টটা সফল করতে হলে নোভার সাহায্য একান্ত দরকার রানার। কিন্তু নোভা ওকে সাহায্য করেছে, এ-কথা জানাজানি হয়ে গেলে সিক্রেট পুলিস ও যুগোস্লাভিয়া সরকার ওকে ছাড়বে না। কাজেই নোভার সাহায্যও পেতে হবে, আবার শত্রুদের বোঝাবারও ব্যবস্থা করতে হবে যে সে কোন অপরাধ করেনি।

কিন্তু তা কি সম্ভব? এর উত্তর একমাত্র সময়ই বলে দেবে।

পরবর্তী তিনদিন নিজেকে হোটেলে বন্দী করে রাখল রানা। প্রতিদিন দশ-বারোটা ফোন এল, কিন্তু একটাও ধরল না ও। হোটেল ম্যানেজমেন্টকে বলা ছিল, দিন শেষে ঠিকই জানতে পারল রানাকে কে কতবার ফোন করেছে। তিন দিনে পঁচিশ বার ফোন করেছে নোভা। ছ'বার করেছেন বিলিয়ার্ড।

নোভা শুধু ফোন করেনি, ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যে হোটেলেও এসেছে তিন দিনে তিনবার। কিন্তু নিচের লাউঞ্জ থেকেই তাকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে মি. রানা কোন ভিজিটরের সঙ্গে দেখা করতে রাজি নন।

তিন দিন পর আজ রানার মনে সংশয় জাগছে, কৌশলটা আদৌ কি কোন কাজে লাগবে? এ যেন নিজেকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছে ও। রানার ধারণা, ওর সান্নিধ্য পাবার জন্যে এতটাই ব্যাকুল হয়ে উঠবে নোভা, নিজেকে ওর হাতে তুলে দিতেও কোন বাধা অনুভব করবে না সে। নিজেকে নিয়ে রানার এই অহঙ্কার বরাবরই ছিল, অনেক কাল সুপ্ত থাকার পর হঠাৎ করে মাথাচাড়া দিয়েছে। নিজের সম্পর্কে দৃঢ় একটা বিশ্বাস, যে মেয়ে ওকে একবার চিনেছে তার পক্ষে ওর আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

সত্যিই কি তাই?

গভীর রাতে হঠাৎ রানার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলার আগে বালিশের তলায় হাত দিল ও। ওয়ালথারটা ঠিক জায়গাতেই আছে। ঘুমটা হঠাৎ ভাঙল কেন? ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠল। ও, আচ্ছা, তাহলে বোধহয় ফোনের আওয়াজেই ঘুম ভেঙেছে। রিস্টওয়াচের আলো জ্বেলে ডায়ালে চোখ রাখল রানা। রাত আড়াইটা। এত রাতে কে হতে পারে? নোভা?

কি একটা উত্তেজনায় রানার মুখ গরম হয়ে উঠল। তাহলে কি ওর আশা পূরণ হতে যাচ্ছে? দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে মুক্ত বিহঙ্গ হতে চাইছে নোভা? টেবিল ল্যাম্পটা ইচ্ছে করেই জ্বালল না ও। হাত বাড়িয়ে ক্রেডল থেকে রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকাল। 'হ্যালো?'

অপরপ্রান্তে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে নোভা। নিজেকে অপরাধী মনে হলো রানার। মনে মনে গাল দিল নিজেকে, 'ব্যাটা বদমাশ!' এ-ও ইচ্ছে হলো–সব কথা স্বীকার করে নোভাকে বলবে, তোমার যে-কোন শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব। 'কাঁদছ কেন?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

নোভা জবাব দিল না। তার কান্না যেন আরও বেড়ে গেল।

'তুমি যদি এভাবে কাঁদতে থাকো, নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারব? কি হয়েছে বলো আমাকে, নোভা। তিন দিন কেটে গেছে, এখন আমি শান্ত–জোর দিয়েই বলতে পারি, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছি। আমি বলতে চাইছি, আবার আমাদের দেখা হতে পারে।'

'তুমি নিষ্ঠুর...' ধরা গলায় বলল নোভা। 'তোমার মধ্যে দয়ামায়া বলতে কিচ্ছু নেই।'

'অভিযোগ মিথ্যে নয়,' বলল রানা। 'কিন্তু এ-ও তোমাকে বুঝতে হবে যে আমি যদি নিষ্ঠুর হয়ে থাকি, সেটা তোমার ভালর জন্যেই।'

'আমার ভাল কে চাইতে বলেছে তোমাকে?' অভিমান উথলে উঠল নোভার গলায়। 'আমার ক্ষতি হয়ে যাবে, এই অজুহাত দেখিয়ে আমাকে তুমি এড়িয়ে থাকছ। আসল কথা তা নয়। আসল কথা হলো, আমার প্রতি তোমার কোন ফিলিংসই নেই।'

'না, নোভা, তুমিও জানো কথাটা সত্যি নয়,' প্রতিবাদ করল রানা।

'সত্যি নয়? কি করে বুঝব সত্যি নয়? তুমি যদি আমার মনের অবস্থা বুঝতেই, তাহলে এভাবে এত কষ্ট দিতে পারতে না। ফোন ধরেছ ঠিকই, কিন্তু ধরেই প্রথমে জানিয়ে দিলে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছ। এ-কথা বলে তুমি আমাকে অপমান করছ। এটাও যে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখার নতুন আরেকটা কৌশল, ভেবেছ এটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার নেই? তুমি সত্যি একটা পাষাণ, রানা। তোমাকে চিনতে আমি ভুল করেছি...'

'নোভা, প্লীজ...'

'আমাকে বলতে দাও, রানা। বলেছ, আমার ক্ষতি। আমার কি ক্ষতি, ব্যাখ্যা করতে পারবে? যদি বলি যে ক্ষতির কথা তুমি ভাবছ আমি এখন নিজেই চাইছি আমার ওই ক্ষতিটা হোক?'

রানা বিহ্বল।

'আমি নিজেই চাইছি, রানা। সত্যি চাইছি। আমার ওই ক্ষতিটা করো তুমি। আমরা বড় হয়েছি তো, নাকি? কি, কথা বলছ না কেন? আমাকে এড়াবার নতুন কোন অজুহাত খুঁজছ বুঝি? কোন লাভ হবে না, রানা। তুমি নিজের তৈরি ফাঁদে নিজেই ধরা পড়ে গেছ। শোনো, আমি কি চাই বলি। শুনছ তো?'

'হ্যাঁ, নোভা, শুনছি। সত্যি কথা বলতে কি, এখন আর কিছুই তোমাকে আমার বলার নেই। শুধু শুনেই যাব। বলো কি বলবে।'

'আমি চাই তুমি আমাকে দূরে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাও,' আবদারের সুর নোভার কণ্ঠে। 'এমন কোথাও, যেখানে শহরের কোলাহল নেই, পুলিসের নজরদারি নেই, কৌতূহলী মানুষের উঁকি-ঝুঁকি নেই...'

'সেরকম জায়গা কি আমি চিনি?' একটা ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তাহলে আমিই বলে দিই কোথায় আমাকে তুমি নিয়ে যাবে? কোটরে চলো। ওখানে আমাদের ফ্ল্যাট বাড়ি আছে। ছোট্ট শহর, কাছেই গভীর বনভূমি আর সাগর, আমার ক্ষতি করার জন্যে একেবারে আদর্শ জায়গা। এই শহরে সবাই আমার ভাল চাইছে, তাদের খবরদারিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি আমি। আমাকে তুমি

বাঁচাও, রানা, প্লীজ!'

নিজের কানকে রানা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছে ও।

'কি হলো, রানা? চুপ করে আছ কেন? তুমি যাবে না?'

'যাব। কিন্তু বেলগ্রেডের কাজ এখনও তো আমার শেষ হয়নি, তাই ভাবছি...'

'কি কাজ সে আমি জানি,' বলল নোভা। 'এক ভদ্রলোক তোমাকে ফোন করবেন, এই তো? করলে করবেন, কোটর থেকে ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে তুমি।'

'ঠিক আছে, তাই হবে,' বলল রানা, বুঝতে পারছে রাজি হতে আর দেরি করা উচিত হবে না। 'কবে রওনা হতে চাও বলো।'

'প্রস্তুতি নিতে খুব বেশি সময় লাগবে না,' বলল নোভা। 'প্লেনের টিকিট আমিই কাটব। পরশু দিন যেতে চাই। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'মনে থাকে যেন, আমার ক্ষতি করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছ আমাকে!' এখন নোভার কথায় কান্না বা অভিমানের সুর নেই, থাকলে আছে সকৌতুক হুমকি। 'তা যদি না পারো, আমি কিন্তু তোমার ক্ষতি করতে ছাড়ব না!'

হাসতে গিয়ে রানা বুঝতে পারল, নার্ভাস হয়ে পড়েছে। 'তবে একটা কথা, নোভা। তুমি যখন চাইছই, তোমার ক্ষতি করতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার দুর্নাম হোক, এটা আমি চাই না।'

'মানে?'

'কোটরে আমি হোটেলে উঠব,' বলল রানা। 'কুমারী একটা মেয়ের সঙ্গে তার বাড়িতে রাত কাটানো আমার উচিত হবে না।'

'এ তোমার মাত্রা ছাড়ানো রক্ষণশীলতা নয় তো, মাসুদ রানা?' নোভার গলায় রাগ রাগ ভাব।

'তোমার কি লোকনিন্দার ভয় নেই?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'ঠিক আছে,' মেনে নেয়ার সুরে বলল নোভা। 'কিন্তু দিনের বেলা তোমাকে আমি সারাক্ষণ নিজের পাশে চাই।'

'জো হুকুম!' বলে ফোন ছেড়ে দিল রানা।

নয়

পডগোরিকা থেকে কোটরে যাচ্ছে ওরা। বাসে করে ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটারের রোমহর্ষক যাত্রা। জমিন থেকে তিন হাজার ফুট ওপরে পাহাড়ের গা কেটে অর্থাৎ কার্নিস চওড়া করে বানানো হয়েছে আঁকাবাঁকা রাস্তা, একপাশে গভীর খাদ, অন্যপাশে নিরেট পাহাড়-প্রাচীর। সময়টা দুপুর, কুয়াশা কেটে গেছে,

ফলে দূর থেকেও কোটর আর বাডভার নিবিড় বনভূমি দেখে রানার চোখ জুড়িয়ে গেল। ও ভাবছে, সীমাহীন ক্ষমতা মানুষকে অসম্ভব লোভীও করে তোলে, সেজন্যেই কোটর আর বাডভার মত বিশাল বনভূমি ব্যক্তিগত শখ মেটাবার উদ্দেশ্যে কিনে দখলে নিয়েছেন মিলোসেভিচ। আরও দূরে পারদের মত ঝলমল করতে দেখা গেল এড্রিয়্যাটিক সাগর।

ড্রাইভার খুব সাবধানে বাস চালাচ্ছে। দু'ঘণ্টা পর একটা বাঁক ঘুরতেই শহরটাকে দেখা গেল। কোটর বৃত্তাকার পাথুরে পাঁচিল দিয়ে সম্পূর্ণ ঘেরা। বিশাল দুর্গটার শুধু কাঠামোটাই কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে, অযত্ন-অবহেলায় বিধ্বস্ত-প্রায়। বৃত্তের বাইরে বনরক্ষীদের ছাউনি, খাকি ক্যানভাসের তৈরি বিশাল কয়েকটা তাঁবু। ছাউনির সামনে বাজার, সশস্ত্র বনরক্ষীরা ঘুরেফিরে কেনাকাটা করছে। কোটরের একমাত্র সরাইখানাটাও বৃত্তের বাইরে, চওড়া ও ভাঙাচোরা একটা রাস্তার ওপর। সরাইখানা ছাড়াও এই রাস্তায় দু'চারটে দোকান-পাট আছে, বেশিরভাগই মনোহারী। পাশাপাশি দুটো দোকানে আর্মস ও অ্যামিউনিশন সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

রানার প্রশ্ন শুনে নোভা জানাল, 'প্রেসিডেন্টের বন্ধু-বান্ধবরা বছরের যেকোন সময় কোটর আর বাডভায় শিকার করতে আসেন। সঙ্গে লাইসেন্স থাকলে দোকান থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র আর গোলাবারুদ কিনতে পারেন তাঁরা।'

তাঁবুগুলোকে ছাড়িয়ে এসে সরাইখানার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল বাস। পুরানো একটা দোতলা বাড়িকে সরাইখানা বানানো হয়েছে, ভার্নি লেখা তোবড়ানো সাইনবোর্ড কাত হয়ে আছে একদিকে, অক্ষরগুলো কোন রকমে পড়া গেল।

'এখানেই তোমাকে নামতে হবে,' রানাকে বলল নোভা।

চকলেট রঙের ব্রিফকেসটা ইঙ্গিতে দেখাল রানা। 'অসম্ভব ভারী ওটা, বাস থেকে নেমে বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারবে? আমি বরং তোমার সঙ্গে যাই…'

'খবর দেয়া আছে, পাঁচিলের গেটে বাস থামলে পরিচিত লোকজন অনেককেই দেখতে পাব,' বলল নোভা। 'তুমি বরং খাওয়াদাওয়া আর বিশ্রাম সেরে বিকেলে আমাদের বাড়িতে চলে এসো। প্লেনে চড়লে আমার কান ব্যথা করে, খানিকটা না ঘুমালে সারে না।' রানার হাতে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিল সে। 'এতে আমার ঠিকানা লেখা আছে, বাড়িটা চিনতে কোন অসুবিধে হবে না। ডুপ্লিকেট চাবিটাও রাখো।'

বাস থেকে নেমে যাচ্ছে রানা, পিছন থেকে নোভা আবার বলল, 'সরাইখানায় ওরা কিছু জিজ্ঞেস করলে আমার নাম বলবে, কেমন?'

সরাইখানার মালিক টুপি পরা এক বৃদ্ধ মুসলমান। খাতায় নাম লেখাবার জন্যে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'আপনি আমাদের লক্ষ্মীমেয়ে নোভা সোনার মেহমান, মাসুদ রানা, তাই না?'

রানা অবাক। 'আপনি জানলেন কিভাবে?'

দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসলেন বৃদ্ধ। 'ছোট্ট জায়গা, কে আসছে কে যাচ্ছে সব আমরা আগে থেকেই জানতে পারি। কোটরে ফোন আছে, নোভা তার বুড়ো দাদুকে ফোন করে আপনার জন্যে একটা কামরা খালি রাখতে বলে দিয়েছে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে দোতলায় নিজের কামরায় উঠে এল রানা। জানালার সামনে দাঁড়াতে পাঁচিল ঘেরা কোটর শহরটা দেখা গেল। পাঁচিল দেয়া ঘেরা বলেই সম্ভবত কোটরকে ছোট্ট শহর বলা হয়। এক সময় পাঁচিলের ভেতর শুধু দুর্গটাই ছিল। তারপর দুর্গের চারপাশে বেশ বড় একটা জায়গা জুড়ে লোকবসতি গড়ে উঠেছে, তবে তা-ও সম্ভবত কয়েকশো বছর আগের ঘটনা কারণ বাড়িঘর বেশিরভাগই প্রাচীন। পুরানো প্রতিটি দালান মুসলিম স্থাপত্য রীতির নিদর্শন বহন করছে। তবে একটা জিনিস দেখে অবাকই হলো রানা। শহরে অনেকগুলো চার্চ রয়েছে, কিন্তু মসজিদ নেই একটাও।

দোতলায় শুধু এই কামরাতেই সংলগ্ন বাথরুম আছে। তবে রুম-সার্ভিসের ব্যবস্থা নেই, নিচে নেমে ডাইনিং রুমে খেতে হবে। তার আগে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাবে রানা।

বাথরুমে ঢুকতেই এনভেলাপটা চোখে পড়ল। ওয়াশবেসিনের ওপর গ্লাস শেলফ, তার ওপর পড়ে আছে। এনভেলাপ ছিঁড়ে কাগজটা বের করল রানা। ইংরেজিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা হয়েছে–

'মাসুদ রানা,

এত বাধা দেয়া সত্ত্বেও গ্রাহ্য করলে না, সাঈদ মুর্তজায়েভের সঙ্গে ঠিকই দেখা করলে। এবার তাহলে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকো। কথা দিয়েছিলাম পরের বার দেখা হলে তোমাকে আমি খুন করব, তবে পরিস্থিতির কারণে সফল হতে পারিনি। খুব শিগ্গির আবার আমাদের দেখা হবে, এবং এবার তোমাকে আমি ঠিকই খুন করব। আমার গায়ে টোকা দিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ বাঁচতে পারেনি।'

চিঠিতে প্রেরকের নাম নেই। তবে বোঝাই যাচ্ছে রানার পিছু নিয়ে কোটরেও পৌঁছে গেছে জর্জিক। বলা যায় না, হয়তো কার্চিক জোড়া নিজেও পৌঁছে গেছে।

খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিল রানা। গেট পেরিয়ে যখন শহরে ঢুকল, সূর্য দিগন্ত ছুঁই-ছুঁই করছে। শহরের প্রতিটি রাস্তা পাথর দিয়ে বাঁধানো। একটাই চৌরাস্তা, লোকজনের বেশ ভিড়ও দেখা গেল। তবে পাঁচিলের ভেতর কোন দোকান-পাট নেই। গেটের একটা সাইনবোর্ডে বলা আছে, গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢোকা নিষেধ। রাস্তা ও বাড়ির দেয়াল একদম পরিষ্কার, কোথাও এতটুকু ধুলো নেই। এখানে সবাই সবাইকে চেনে, ফলে রানাকে দেখে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠল। তবে কেউ ওকে কোন প্রশ্ন করল না।

শহরটা একবার চক্কর দিল রানা। না, সত্যি কোন মসজিদ নেই। অথচ টুপি পরা বেশ ক'জন লোককে দেখা যাচ্ছে। মসজিদ না থাকার কি কারণ, নোভাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আবার চৌরাস্তায় ফিরে এল রানা। ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে, ওকে কেউ অনুসরণ করছে না।

দ্রুত কমে আসছে আলো। ইলেকট্রিসিটি আছে, তবে রাস্তায় কোন লাইটপোস্ট নেই। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে চৌরাস্তা থেকে সরু একটা গলিতে ঢুকল রানা। চৌরাস্তা বাদে, শহরের প্রতিটি গলিই অসম্ভব সরু–দু'হাত লম্বা

করলে দু'দিকের দেয়াল ছোঁয়া যাবে। প্রাচীন হলেও, প্রায় প্রতিটি দালান তিন-চারতলা উঁচু মুখ তুলে সরু এক ফালি ম্লান আকাশ দেখতে পেল রানা। বাড়িগুলোর ঝুল-বারান্দা থেকে লতানো গাছ নেমে এসেছে। বাতাসে ফুলের গন্ধ। এরই মধ্যে কোন কোন বাড়িতে আলো জ্বালা হয়েছে। কাছেই কেউ একজন গিটার বাজাচ্ছে। রেডিওর গানও শোনা গেল। আলোকিত একটা জানালা দিয়ে এক তরুণীকে নামাজ পড়তে দেখা গেল।

একটা বাঁক ঘুরল রানা। গলিটা নির্জন। মাথার ওপর ডানা ঝাপটাল এক দল কবুতর। পরমুহূর্তে, ঠিক ওর পিছনে, প্রচণ্ড শব্দে কি যেন একটা পড়ল উপর থেকে। লাফ দিয়ে একটা বাড়ির দোরগোড়ায় আশ্রয় নিল রানা, জ্যাকেটের ভেতর থেকে ওয়ালথারটা বেরিয়ে এসেছে হাতে। কিন্তু ওর পিছনে ফাঁকা গলি, কেউ নেই। পাথরের বেশ বড় একটা টুকরো, সম্ভবত কার্নিসের ভাঙা অংশ, কোন বাড়ির মাথা থেকে খসে পড়েছে নিচে। এক মুহূর্ত আগে যেখানে ছিল রানা, ঠিক সেখানেই পড়েছে ওটা। গলির দু'পাশের জানালা খুলে গেল, দোতলা আর তিনতলা থেকে লোকজন ঝুঁকে নিচে তাকাচ্ছে। অনেকেই প্রশ্ন করছে। আঞ্চলিক ভাষা, রানার বোঝার কথা নয়। একটু পরই উত্তেজনা থিতিয়ে এল। জানালাগুলো আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দোরগোড়া থেকে বেরিয়ে এসে পাথরের টুকরোটা পরীক্ষা করল রানা। তুলতে চেষ্টা করে পারল না, এতই ভারী। ওয়ালথারটা এখনও হাতে, মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল ও। ইতিমধ্যে অন্ধকার জাঁকিয়ে বসেছে। দেখা গেল না কাউকে।

ঠিকানা মিলিয়ে নোভাদের বাড়িটা খুঁজে নিল ও। চারতলা বাড়ি, নোভা তিনতলায় আছে। দরজায় নক করল ও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আরেকবার। কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

চাবি বের করে তালাটা খুলতে যাবে রানা, হাতের চাপ লাগায় দরজার কবাট ফাঁক হয়ে গেল। ওয়ালথারটা আবার বেরিয়ে এল হাতে। কবাট আরও ফাঁক করে নিঃশব্দ পায়ে ফ্ল্যাটে ঢুকল ও, অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে। দরজা বন্ধ করে সেটার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। ডান দিকে অন্ধকার, বাম দিকে অস্পষ্ট আলোর আভাস। সরু করিডর ধরে সাবধানে সেদিকে এগোল ও। সামনে একটা কামরা, উল্টোদিকের খোলা জানালা দিয়ে মেঝেতে চাঁদের আলো ঢুকেছে। এটা একটা স্টুডিও। বড় একটা ডেস্ক আছে, তাতে নিকোলাই সুনজাকের আরও একটা ব্রোঞ্জ মূর্তি দেখল রানা।

ছায়ার ভেতর থেকে লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে একজোড়া হিংস্র প্রাণী—একটা প্যান্থার ও একটা লেপার্ড। তারপর ওগুলোকে চিনতে পেরে পরম স্বস্তি অনুভব করল রানা। নোভার কালো সুটটা চেয়ারের পিঠে ঝুলছে, লেপার্ড-স্কিন কলার সহ বাতাসে দোল খাচ্ছে ওটা। চেয়ারটার সামনে বেশ বড় একটা স্টুডিও বেড, নীল ডোরা কাটা রোব পরে তাতে পাশ ফিরে শুয়ে আছে নোভা। অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে, পিছনে ছড়িয়ে আছে বিশাল এলো চুল। ওয়ালথারটা ডেস্কে রেখে নিঃশব্দে চেয়ারে বসল রানা, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নোভার চওড়া পিঠের ওঠা-নামা দেখছে।

যেন রানার উপস্থিতি টের পেয়েই একটু পর চোখ মেলল নোভা। চাঁদের অল্প আলোয় রানাকে চিনতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিল সে, তারপর কথা না বলে দু'হাত বাড়িয়ে দিল–ডাকছে ওকে।

জোছনা এক সময় উঠে এল বিছানার ওপর। আধ ঘণ্টারও বেশি হবে পরস্পরকে ছুঁয়ে শুয়ে আছে ওরা। অনেকক্ষণ কোন কথা হয়নি। রানার একটা হাত টেনে নিয়ে চুমো খেলো নোভা, তারপর ফিসফিস করে মাত্র দুটো শব্দ উচ্চারণ করল, 'আমি সুখী!'

ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার আর তার স্ত্রীকে বিদায় করে দিয়েছে নোভা, তার খুব শখ রানাকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে। কিচেনটা খুদে, রান্নার কাজে তাকে সাহায্য করল রানা। খাওয়া শেষ হতে হাতে কফির কাপ নিয়ে স্টুডিওতে ফিরেছে ওরা, এই সময় ফোনটা বেজে উঠল।

ড. সিডাক ফোন করেছেন। দু'এক মিনিট কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল নোভা, হঠাৎ করে আতঙ্কিত দেখাচ্ছে তাকে। রানা জানতে চাইল, 'কোন খারাপ খবর?'

'সিডাক আঙ্কেল বললেন, তাঁর লোকেরা কার্চিক জোডা আর তার ভাইকে কোটরের দিকে আসতে দেখেছে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি। সরাইখানায় তার ভাইয়ের একটা চিঠি পেয়েছি।' জ্যাকেটের পকেট থেকে চিঠিটা বের করে নোভার হাতে ধরিয়ে দিল ও।

চিঠিটা পড়ার পর ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল নোভা। 'এখন তাহলে কি করব আমরা?'

'ড. সিডাক কি বললেন?'

'উনি কয়েকজন বডিগার্ড পাঠাতে চাইছেন। কিন্তু আমি নিষেধ করেছি। বলেছি, আমাকে পাহারা না দিয়ে আপনার লোকদের বলুন তারা যেন জোডার ওপর নজর রাখে।'

মনে মনে খুশি হলো রানা। 'ভাল করেছ। বেড়াতে এসে যদি পিছনে বডিগার্ড নিয়ে ঘুরতে হয়, আনন্দটাই মাটি।'

'কিন্তু তোমার কথা ভেবে আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে। জোডা মানুষ নয়, পিশাচ। সে যেভাবে তোমার পিছনে লেগেছে...'

'কোন চিন্তা কোরো না, নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি,' বলল রানা। 'জোডা প্রসঙ্গ থাক। এসো, আমরা অন্য একটা জরুরী বিষয়ে কথা বলি।'

'জরুরী বিষয়?'

'হ্যাঁ। ড. সিডাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা তোমার কাছে গোপন করে গেছেন।'

'কি কথা?' ভুরু কোঁচকাল নোভা।

'তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও,' বলল রানা। 'তোমার বাবা নিকোলাই সুনজাককে সাঈদ মুর্তজায়েভ খুন করেছেন, একথা সত্যি নয়–তা কি তুমি জানো?'

'মানে?' হাঁ হয়ে গেল নোভা।

ধীরে ধীরে বলল রানা, 'গোটা ব্যাপারটাই ছিল ষড়যন্ত্র, নোভা। তোমার বাবাকে খুন করেছে কার্চিক জোডা। ম্যাক বিলিয়ার্ড জানেন। ড. সিডাকও জানেন। অবশ্য খুনটা হতে ওঁরা কেউ দেখেননি। তবে বিশ্বাস করেন, মুর্তজায়েভ নন, কার্চিক জোডাই খুনী।'

'শুধু বিশ্বাস করেন, কোন প্রমাণ ছাড়াই?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল নোভা। 'যেহেতু সবাই সাঈদ মুর্তজায়েভকেই খুনী বলে মনে করে, তাঁরই তো উচিত নিজেকে নির্দোষ বলে প্রমাণিত করা। তা কি তিনি পারবেন?'

'জোডাকে তিনি বলেছিলেন–সুনজাককে তুমিই খুন করেছ। উত্তরে শুধু হেসেছে জোডা, স্বীকার বা অস্বীকার কোনটাই করেনি। এই ঘটনার সাক্ষী হলো কয়েকজন পুলিস, তাদের মধ্যে অফিসারও ছিলেন দু'চারজন। জোডার ওই হাসি দেখে মুর্তজায়েভের মাথায় রক্ত চেপে যায়, তিনি জোডার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, তারই ছুরি কেড়ে নিয়ে পোঁচ দেন জোডার গলায়। ক্ষতটা শুকিয়ে গেছে, তবে দাগটা কোন দিন মুছবে না।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল নোভা। অনেকক্ষণ পর সে বলল, 'তুমি বললে সিডাক আঙ্কেল গুরুত্বপূর্ণ কি যেন একটা গোপন করে গেছেন আমার কাছে। কি?'

'তুমি আমাকে বলেছ, অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির প্রতি তুমি কৃতজ্ঞ। কারণ তিনিই তোমার লেখাপড়ার সমস্ত খরচ বহন করেছেন। ড. সিডাক তোমাকে শুধু জানিয়েছেন, তিনি তোমার বাবার একজন বন্ধু।'

'হ্যাঁ। তাঁর পরিচয় সিডাক আঙ্কেলও জানেন না।'

'না, কথাটা ঠিক নয়,' বলল রানা। 'ওই ব্যক্তির পরিচয় তিনি জানেন।'

'জানেন? কি বলছ!'

'হ্যাঁ। তিনি সাঈদ মুর্তজায়েভ। ম্যাক বিলিয়ার্ডের মাধ্যমে তিনিই তোমার লেখাপড়ার সমস্ত খরচ চালিয়েছেন। তোমার স্কলারশিপের ব্যবস্থাও তিনিই করেছিলেন। লন্ডনে তুমি লেখাপড়া করতে যাও, তা-ও মুর্তজায়েভের খরচে। এমন কি লেখক সংঘে যে চাকরিটা তুমি করছ, সেটাও তোমাকে পাইয়ে দিয়েছেন তিনিই।'

'রানা,' ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল নোভা। 'এ-সব কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, প্রতিটি শব্দ।'

বিছানা ছেড়ে উঠল নোভা, রানা কিছু বুঝতে পারার আগেই ওকে জড়িয়ে ধরল সে। রানা অনুভব করল, শরীরটা ঝাঁকি খাচ্ছে। ফোঁপাচ্ছে নোভা। কাঁদতে কাঁদতেই সে বলল, 'অথচ জানো, কয়েক বছর ধরে কি সাংঘাতিক একটা অপরাধবোধে ভুগছি আমি!'

'কেন?'

রানার কাঁধে চিবুক রেখে ফিসফিস করছে নোভা। 'তিনি আমার বাবার হত্যাকারী জানা সত্ত্বেও তাঁর লেখা আমার অসম্ভব ভাল লাগে, তাই। কাউকে দেখাইনি, তাঁর একটা কবিতার বই অনুবাদ করেছি আমি···'

হেসে উঠল রানা। 'তিনি তোমাকে ভালবাসেন, কারণ তুমি তাঁর বাল্যবন্ধুর

মেয়ে। তুমিও তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারোনি, কারণ আসলে তো তিনি তোমার বাবাকে খুন করেননি। প্রকৃতির প্রতিশোধ বলে যেমন একটা কথা আছে, তেমনি প্রকৃতির সুবিচার বলেও একটা কিছু আছে বৈকি…'

'বেলগ্রেডে ফিরে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। ভাবতেই নিজের ওপর ঘৃণা হচ্ছে, আমি তাঁকে চড় মেরেছিলাম। রানা, তিনি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন?'

'তুমি না চাইতেই তাঁর ক্ষমা পেয়ে গেছ, নোভা,' বলল রানা। 'তা না হলে এত বছর ধরে তিনি কি তোমাকে সাহায্য করতেন?'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নোভা রিস্টওয়াচে সময় দেখল। 'অনেক রাত হলো। চলো, গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিই তোমাকে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'কোন প্রয়োজন নেই। আমি একাই যেতে পারব। তুমি কিন্তু খুব সাবধানে থাকবে, কেমন? কেয়ারটেকার আর তার স্ত্রীকে ডেকে নাও, ফ্ল্যাটে একা থাকা তোমার উচিত হবে না। কোথায় ওরা? ভাল কথা, ব্রিফকেস থেকে লুগারটা বের করে নিজের কাছে রাখো।'

'ঠিক আছে। একতলার একটা কামরায় আছে ওরা। যাচ্ছ যাও, কিন্তু কাল সকালেই চলে আসবে, কেমন? তোমাকে নিয়ে ঘুরতে বেরুব।'

'ঠিক আছে।'

আঁকাবাঁকা সরু গলিগুলো চিনে রেখেছে রানা, সেই পথেই সরাইখানায় ফিরছে। কোটরে দশটাই অনেক রাত। রাস্তায় তো আলো নেইই, দালান-কোঠাগুলোও অন্ধকার হয়ে গেছে। পাথর বসানো পথে ওর জুতোর শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে। ওর সামনে আড়াআড়িভাবে হঠাৎ রাস্তা পেরুল সাদা একটা বিড়াল, পরক্ষণে পিলে চমকে দিয়ে কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল একটা পেঁচা।

শুধু প্রতিধ্বনি নয়, আরও একজোড়া পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে কয়েকবারই তাকাল, অন্ধকারে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। থামল ও, কান পেতে থাকল। পিছনের লোকটাও স্থির হয়ে গেছে। সে-ও রানাকে দেখতে পাচ্ছে না, ওর পদশব্দ অনুসরণ করছে।

এবার হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা। একটা বাঁক ঘোরার পর বুঝতে পারল পিছনে কোন শব্দ হচ্ছে না। লোকটা কি হতাশ হয়ে থেমে গেছে? নাকি ঘুরপথে ওর সামনে চলে যাবার মতলব করেছে?

অন্ধকার এত গাঢ়, দেয়াল ধরে হাঁটতে হচ্ছে রানাকে। অকস্মাৎ খুট করে একটা আওয়াজ হলো পিছনে। রানা ঘুরতে শুরু করেছে, মস্ত একটা হাত ওর মুখ চেপে ধরল, আরেকটা হাত হ্যাঁচকা টান দিয়ে কেড়ে নিল ওয়ালথারটা। লোকটা ফিসফিস করল ওর কানে, 'সুনজাক আমার বন্ধু ছিল।' রানার মুখ থেকে হাত সরিয়ে একটা কব্জি চেপে ধরল সে। 'আসুন।' টান দিয়ে রানাকে গলির পাশের একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকাল। ঘরে আলো না জ্বললেও অন্ধকার নয়, পাশের ঘর থেকে আলোর আভা আসছে। লোকটা ওকে ছেড়ে দিল। তার শক্তির প্রমাণ আগেই পেয়েছে রানা, এবার প্রকাণ্ড কাঠামোটা দেখতে পেল। দৈত্য

বললেই হয়. তবে বয়স পঞ্চান্ন বা ষাটের কম নয়।

'আমি আলভিক সুজায়েভ. আলভিক নুরানিকের বাবা,' বলল লোকটা, হ্যান্ডশেক করার সময় রানার মনে হলো হাড়গুলো না ভেঙে যায়। 'খবরের কাগজে দেখলাম, মুর্তজায়েভের খুব বিপদ। তাকে পাগলা-গারদে পাঠাবার ষড়যন্ত্র চলছে। মি. রানা, এখানে আপনারও খুব বিপদ। শুধু আমরা নই, আরও অনেকে আপনাকে অনুসরণ করছে। কাজেই আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

'আপনি এত তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, এ আমি আশা করিনি,' ফিসফিস করল রানা।

'শত্রুরাও তা আশা করছে না,' সুজায়েভ বলল। 'সেজন্যেই যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।'

'কখন?'

'কাল রাতে।'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'যত তাড়াতাড়ি করা হবে ততই নিরাপদ। শুনুন, কি করতে হবে বলে দিচ্ছি। কাল ঠিক সন্ধের আগে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে বাডভার দিকে হেঁটে রওনা হবেন। দক্ষিণ-পুব দিকের পাকা রাস্তাটা ধরে পাহাড়ের দিকে যাবেন। ওই রাস্তায় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

'কিন্তু আমাকে যদি অনুসরণ করা হয়?'

'সম্ভব হলে খসাবার চেষ্টা করবেন,' বলল সুজায়েভ। 'তবে এ-কাজে বেশি সময় নষ্ট করবেন না। একান্তই যদি ফেউ খসাতে না পারেন, তার বা তাদের ব্যবস্থা আমিই করব। দরজা খুলে দিচ্ছি, কোন শব্দ না করে বেরিয়ে যান। ভয় নেই, আশপাশে আমাদের লোক আছে।'

'একটা কথা,' ইতস্তত করে বলল রানা। 'আমার সঙ্গে যদি নোভা থাকে, সমস্যা হবে? তাকে আপনি চেনেন নিশ্চয়?'

মৃদু শব্দে হাসল সুজায়েভ। 'সুনজাক আমার বাল্যবন্ধু ছিল, তার মেয়েকে আমি চিনব না—ছোটবেলায় আমার কোলেই তো সে মানুষ হয়েছে! শুনুন, নোভা আপনার সঙ্গে থাকলে ভালই হয়। আমি যদি কোন কারণে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে না থাকি, ওই আপনাকে বাডভায় নিয়ে যেতে পারবে। ওকে বলবেন, বাডভায় ওদের খামারবাড়িতে যেতে হবে।'

'বাক্সটা কোথায় আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনাকে যদি না পাই, ওটা খুঁজে বের করব কিভাবে?'

'বাক্সটা এমন এক জায়গায় আছে, বলে দিলেও আপনারা খুঁজে পাবেন না। আমি রাস্তায় যদি থাকতে না পারি, নোভাদের খামারবাড়িতে ঠিকই থাকব, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন। ওদের খামারবাড়িটা আমিই দেখাশোনা করি।'

'এখুনি নয়, দু'দিন থেকে এক হপ্তার মধ্যে কয়েকটা জিনিস দরকার আমার,' বলল রানা। 'ভেবেচিন্তে বলুন, জিনিসগুলো আপনি যোগাড় করতে পারবেন কিনা।'

'বলুন।'

তালিকাটা বেশ বড় হয়ে গেল। সবশেষে জানতে চাইল রানা, 'এ-সব আপনার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব?'

সুজায়েভ গম্ভীর। 'সম্ভব।'

'সেক্ষেত্রে লিখে নিন, তা না হলে ভুলে যাবেন।'

কাগজ-কলম নিয়ে এল সুজায়েভ। পেন্সিল টর্চের আলোয় লিখতে বসল। লেখা শেষ হতে রানা বলল, 'এ-সব যোগাড় করতে অনেক টাকা দরকার। আমার কাছে মাস্টার কার্ড আছে, হাজার দশেক মার্কিন ডলার দিতে পারব। কিন্তু সেটা ভাঙাতে হলে আপনাকে বড় কোন শহরে যেতে হবে। তাই বলছি, খরচটা আপাতত আপনি করলেই ভাল হয়। কিংবা যদি বাকিতে করাতে পারেন।'

তালিকার ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে সুজায়েভ বলল, 'দশ হাজার ডলার? নাহ্, অত টাকা লাগবে না। আশা করি পাঁচ হাজার ডলারেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।'

'গুড। এবার বলুন, কোটর ও বাডভা জুড়ে মিলোসেভিচের রিজার্ভ আর সৈকত সহ উপকূলের একটা ম্যাপ এঁকে দেয়া সম্ভব কিনা। গোটা এলাকাটা আপনি তো ভাল করেই চেনেন, তাই না?'

'এখনই দরকার?'

'না, কাল হলেও চলবে।'

'ঠিক আছে, পাবেন।'

'এবার তাহলে দরজাটা খুলুন, আমি বেরিয়ে যাই।'

দশ

পরদিন সূর্য ওঠার আগে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে শহরে ঢুকল রানা। চৌরাস্তার দিকে না গিয়ে পাঁচিলের গা ঘেঁষে অলস পায়ে হাঁটছে ও। মাত্র ভোর হয়েছে, রাস্তায় লাঠি হাতে কয়েকজন বৃদ্ধকেই শুধু দেখা গেল, মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন।

দুর্গটার জানালা-দরজা অনেক আগেই লোপাট হয়ে গেছে, গায়ে অসংখ্য গর্ত আর ফাটল, তবু ছাল ছাড়ানো কাঠামোটা এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের উঠানটায় বস্তি, শ্রমিক শ্রেণীর লোকজন বাঁশ আর পলিথিন দিয়ে মাথাগোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে। বস্তির ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে উঁচু একটা বারান্দায় উঠল রানা। এখানেও অনেক লোক শুয়ে আছে। তাদেরকে সাবধানে টপকে এল ও, তারপর ঢুকে পড়ল একটা টাওয়ারের নিচে। প্যাঁচানো পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় বার কয়েক থামল ও, কেউ পিছু নিয়েছে কিনা দেখছে। সিঁড়ির ধাপে কেউ নেই। কোন শব্দও পেল না।

সঙ্গে স্থানীয় কেউ না থাকলে বনভূমিতে ঢোকা ঠিক হবে না, বনরক্ষীরা চ্যালেঞ্জ করে বসতে পারে। অথচ সৈকত পর্যন্ত দীর্ঘ পাকা রাস্তাটা একবার দেখা দরকার, দেখা দরকার বনভূমির কোথায় কি আছে। কোন রকম ঝুঁকির মধ্যে না

গিয়ে রানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দুর্গের মাথা থেকে যতদূর সম্ভব এলাকাটার ওপর চোখ বুলিয়ে নেবে।

টাওয়ারের চারদেয়ালের ভেতর সিঁড়িটা। ত্রিশ ফুট ওঠার পর রানা দেখল, দেয়াল বলে আর কিছু নেই। ধাপগুলোর দু'পাশ এখন ফাঁকা, এমন কি ধরার মতও কিছু নেই। তারপর পাওয়া গেল কাঠের ধাপ, তা-ও কালের আঁচড় লেগে পচে গেছে, নড়বড় করছে ফ্রেম। পাথরের ধাপ ভেঙে যাওয়ায় কাঠের এই ধাপ লাগানো হয়েছে, যদিও তারপর আর মেরামত করা হয়নি।

ওপরে ওঠাটা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠল। একবার থেমে রানা ভাবল, ফিরে যাবে কিনা। কিন্তু মন সায় দিল না। আর বিশ ফুটের মত উঠতে পারলেই দুর্গের মাথায় পৌঁছে যাবে ও। আশি ফুট উঠতে পেরেছে, বাকি বিশ ফুট না উঠতে পারার কোন কারণ নেই।

কিন্তু দেখা গেল সিঁড়ি শেষ হয়েছে দুর্গের ছাদ সাড়ে তিন কি চার ফুট দূরে থাকতেই। এখানেও কাঠের ধাপ ছিল, কিন্তু ভেঙে গেছে। ধরার কিছু নেই, তীব্র বাতাসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই সমস্যা, এই অবস্থায় লাফ দিতে গিয়ে যদি পা পিছলায়, তাহলে আর দেখতে হবে না, সোজা নিচে...বেশি চিন্তা না করে দম আটকাল রানা, তারপর লাফ দিল।

নিরাপদেই ছাদে চলে এল ও। ছাদটা বিশাল। চারকোণে চারটে ছোট টাওয়ার দেখা যাচ্ছে, প্রায় অক্ষতই বলা যায়। ছাদের দক্ষিণ দিকটায় চলে এল ও। কামান বসানোর ফোকরগুলো অনেক কাল আগেই ভেঙে গেছে। রেলিং বলতে কিছুই নেই। কিনারা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বনভূমির ওপর চোখ বুলাল রানা।

আঁকাবাঁকা রাস্তাটা বেশ অনেক দূর পর্যন্ত দেখা গেল, কখনও পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে এগিয়েছে, কখনও হারিয়ে গেছে নিবিড় গাছপালার আড়ালে। কুয়াশা থাকায় এত দূর থেকে সাগর দেখা যাচ্ছে না। এত কষ্ট করে ওপরে ওঠায় লাভ হলো এই যে বনভূমিতে কিছু দূর পর পর কাঠের তৈরি ওয়াচটাওয়ার দেখতে পেল রানা। সন্দেহ নেই, ওগুলো থেকে বনভূমির ওপর নজর রাখে মিলোসেভিচের বেতনভুক বনরক্ষীরা। তাহলে ধরে নিতে হয় এদিকে পোচারদের উপদ্রবও আছে।

একেবারে কিনারায় না দাঁড়ালে নিচের শহরটা দেখা যাবে না। পিছিয়ে এসে দক্ষিণ প্রান্তের টাওয়ারের দিকে এগোল রানা। খানিক দূর যাবার পর দেখতে পেল এদিকের দুর্গ-প্রাকার অনেকটাই অক্ষত। গর্তে পা দিয়ে পাঁচিলের মাথায় উঠল ও। বেশ চওড়া পাঁচিল, পড়ে যাবার কোন ভয় নেই। তবু সাবধানেই দরজাবিহীন টাওয়ারটার দিকে এগোল। সামনে একটা প্ল্যাটফর্ম দেখা গেল। কিছুদিন আগেও এখানে একটা রেস্তোরাঁ ছিল। ফরমিকা-টপ কাউন্টার ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। একপাশে স্তূপ হয়ে আছে অনেকগুলো টেবিল আর চেয়ার। একটা রিফ্রিজারেটরকেও শুয়ে থাকতে দেখা গেল। টাওয়ারের বাইরে ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা ছিল, রাতে ব্যাটলমেন্টে আলো ফেলা হত। ফ্লাডলাইটটা ভেঙে গেছে, চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে কাঁচের টুকরো।

নিচের শহরটাকে এখান থেকে অনেক দূরে মনে হলো। লোকজনের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, মোরগের ডাক, চার্চ থেকে ভেসে আসা ভোঁতা ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ঘুম ভাঙছে শহরের। মুখ তুলে দূরে তাকাল রানা। বনভূমির শেষ প্রান্ত কুয়াশায় ঢাকা। এখান থেকে বাডভা ত্রিশ কিলোমিটার দূরে, তারপর সাগর। সৈকত থেকে ইটালি একশো মাইলও নয়, কোন রকমে পেরিয়ে যেতে পারলেই আমৃত্যু পাগল হয়ে থাকার অভিশাপ থেকে বেঁচে যাবেন সাঈদ মুর্তজায়েভ।

কি কারণে চমকে উঠল বলতে পারবে না রানা। তবে ঝট্ করে ঘুরতেই টুইডের সুট পরা শক্ত-সমর্থ লোকটাকে দেখতে পেল, ওর দিকে ক্যামেরা তাক করছে। সম্ভবত মন্ট্রিনিগ্রোরই লোক, তবে চেহারায় জার্মান ভাব আছে। লোকটা এমন এক ভাষায় কথা বলল, কিছুই বুঝতে পারল না রানা। ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, জার্মান–কিছুই সে বোঝে না। অসহায় একটা ভঙ্গি করে পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করল সে, ছবি এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করল টাওয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের একটা ফটো তুলতে চায়, রানার সাহায্য দরকার। তারপর ইঙ্গিতে দেখাল কিভাবে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে শাটার টিপতে হবে। দূরে সরে গেল সে, টাওয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে পোজ দিল, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে।

ফটো তোলার পর ক্যামেরাটা ফিরিয়ে দিল রানা।

কিন্তু আবার লোকটা মূকাভিনয় শুরু করল। ভাব-ভঙ্গি আগের চেয়েও ব্যাকুল। কি ব্যাপার? না, সৌজন্যবশত রানারও একটা ফটো তুলতে চাইছে সে। লোকটা হঠাৎ উদয় হওয়ায় প্রথম থেকেই কেমন যেন একটা অস্বস্তিবোধ করছে রানা। মাথা নেড়ে ফটো তুলতে অসম্মতি জানাল। কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা। অগত্যা আপদ বিদায় করার জন্যে রাজি হতে হলো ওকে। পোজ দেয়ার জন্যে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল ও। চোখে ক্যামেরা তুলল লোকটা। তার আঙুল ক্যামেরার মাথায় বসানো অন্য একটা বোতাম ছুঁলো। সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দিল রানা। গুলির আওয়াজটা ভোঁতা, যেন কেউ চড় মেরেছে। রানার পিছনে, ফরমিকা টপ কাউন্টারে লেগেছে বুলেটটা। ডাইভ দিয়ে পাঁচিলেই পড়েছে রানা, কিন্তু সিধে হতে গিয়ে পারল না। লোকটা এগিয়ে এসে ক্যামেরা দিয়ে বাড়ি মারল ওর মাথায়। পাঁচিলের মেঝের সঙ্গে ঠুকে গেল রানার কপাল। লোকটা আরও এগিয়ে এসে ওর মাথা লক্ষ্য করে লাথি মারতে যাচ্ছে। তার পায়ের গোড়ালি ধরে সজোরে মুচড়ে দিল রানা, ধপাস করে পাঁচিলের ওপর পড়ল ভারী শরীরটা। ইতিমধ্যে রানার হাতে ওয়ালথারটা বেরিয়ে এসেছে। 'দাঁড়া শালা, সিধে হ!' ওর কঠিন মূর্তি দেখে ধীরে ধীরে দাঁড়াল লোকটা। 'হাত দুটো মাথার পিছনে রাখ!' শুধু ইংরেজিতেই কাজ হচ্ছে, মূকাভিনয়ের দরকার পড়ছে না।

ব্যাপারটা রানার কাছে রীতিমত ধাঁধার মত লাগছে? এখনও ওর হাতে মাইক্রোফিল্মটা আসেনি, এই অবস্থায় কে ওকে খুন করতে চাইবে? কার্চিক জোডার যমজ ভাইয়ের কথাই ধরা যাক–তার সঙ্গে রানার দ্বন্দ্বটা ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পৌঁছেছে, নিজের হাতে রানাকে খুন করার যে তৃপ্তি, সেটা থেকে সে বঞ্চিত হতে চাইবে না। পুলিস চীফ ড. সিডাককে টোপ গেলানো

হয়েছে—রানা তাঁকে মুর্তজায়েভের বাড়িতে নিয়ে যাবে, এই অপেক্ষায় থাকবেন তিনি।

বাকি থাকল জেমস ফোলি। পাণ্ডুলিপিগুলো রানার হাতে পড়ুক, এটা সে চায় না। 'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ড. সিডাক? কার্চিক জোড়া?' লোকটা এক চুল নড়ছে না। 'নাকি জেমস ফোলি?'

রানা থামতে হলুদ দাঁত বের করে হাসল লোকটা। প্রফেশনাল, প্রচুর সময় নিয়ে টরচার না করলে মুখ খোলানো যাবে না। কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়। 'ঠিক আছে, চলো, পুলিসই তোমার মুখ খোলাবে।' লোকটার পেটের দিকে ওয়ালথার ধরে সামনে এগোচ্ছে ও। 'পিছন ফিরে দাঁড়াও, তোমাকে আমি সার্চ করব।'

লোকটা ঘুরল। ঘুরেই ছুটল।

ওয়ালথার ধরা হাতটা লম্বা করল রানা, ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল। মাত্র সাত-আট গজ দূরে লোকটা, ইচ্ছে করলেই তার মাথাটা উড়িয়ে দিতে পারে ও। কিন্তু ট্রিগারটা টানতে পারছে না, কোথায় যেন বাধছে। রানা পিছু নিয়েছে কিনা দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাল লোকটা, আর ঠিক তখনই হোঁচট খেলো। ডানা মেলা পাখির মত একটা ভঙ্গি করল, পাঁচিলের কিনারা থেকে দুর্গের নিচে পড়ে যাচ্ছে। এক কি দুই সেকেন্ড স্থির থাকল সে, কিন্তু কোনভাবেই আর ভারসাম্য ফিরে পেল না। একেবারে শেষ পর্যায়ে বাতাসকে আলিঙ্গন করল লোকটা। শুরু হলো দীর্ঘ পতন।

উঁকি দিয়ে নিচে তাকিয়ে লোকটাকে একটা ঝোপের পাশে পড়ে থাকতে দেখল রানা। ক্যামেরাটা তুলে কয়েকটা আছাড় মারল ও, তারপর ফেলে দিল নিচে।

ফ্ল্যাটে এসে নোভাকে রানা কিছুই বলল না। শাওয়ার সেরে নাস্তা খেতে বসল। খুব উৎসাহের সঙ্গে বলে যাচ্ছে নোভা, সারাটা দিন আজ কোথায় কোথায় ঘুরবে ওরা।

বেড়াতে বেরিয়ে এলাকা সম্পর্কে মূল্যবান কয়েকটা তথ্য পেল রানা। কোটর আর বাডভার বেশিরভাগ জায়গা যেহেতু মিলোসেভিচ কিনে নিয়েছেন, তাই ব্যক্তিগত খামারগুলোয় আসা-যাওয়া করতে হলে বনরক্ষীদের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয়। মিলোসেভিচের বনভূমিতে ব্যক্তিগত যানবাহন নিয়ে প্রবেশ করা নিষেধ। তবে চাইলে বনরক্ষীরা নিজেদের ভ্যানগাড়ি ধার দেয়, কিংবা খামারবাড়ির লোকজনকে নিজেরাই পৌঁছে দেয়। ভ্যানগাড়ি পাওয়া গেলে ভাল, তা না হলে হেঁটে আসা-যাওয়া করতে হয়। নোভা ওকে আরও জানাল, বনরক্ষীদের কয়েকজন ড্রাইভার কোটবের বাসিন্দা, তার পরিচিত। সে চাইলে ভ্যানগাড়ি পাওয়া যাবে।

সকালে ওরা শহর থেকে বেরিয়ে বনরক্ষীদের ছাউনিতে চলে এল। বনরক্ষীদের কমান্ডার নোভাকে চেনে, তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হাঁটতে বেরুল ওরা। একটাই পাকা রাস্তা, ঢেউ খেলানো পাহাড়ের ওপর দিয়ে সেই সাগর পর্যন্ত চলে গেছে, শাখা রাস্তাগুলো ইঁট বিছানো। মাইল দুয়েক হাঁটার পর ফিরতি

পথ ধরল ওরা। নোভাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলবে কিনা, এ নিয়ে রানার মনে একটা দ্বিধা আছে। এখনও মনস্থির করতে পারছে না। এ শুধু নোভাকে বিশ্বাস করার প্রশ্ন নয়, এর সঙ্গে তার নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত।

দুপুরে সরাইখানায় খেলো ওরা। দু'জনেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। সময় কাটানো একটা সমস্যা বলে মনে হচ্ছে এখন। রানার ইচ্ছে নিজের কামরায় উঠে বিশ্রাম নেবে। কিন্তু কথাটা বলা হলো না। তার আগে নোভা প্রস্তাব দিল, 'আমার স্টুডিওতে চলো, রানা। আমি তোমার একটা ছবি আঁকব। পরে যদি তোমার একটা মূর্তি গড়তে চাই, ছবিটা কাজে লাগবে।'

'আমার মূর্তি? কেন, কি দরকার?'

'তোমাকে ধরে রাখব, সে সাধ্য আমার নেই,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ঝাপসা কণ্ঠে বলল নোভা। 'দু'দিনের জন্যে হলেও তোমাকে পেয়েছিলাম, সেই স্মৃতিটা অন্তত থাকুক আমার কাছে।'

এ-প্রসঙ্গে বেশি কথা বললে নোভার ভাবাবেগ উথলে উঠতে পারে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে গেল রানা। ফ্ল্যাটে ফিরে একটা চেয়ারে বসল ও। ইজেলে ক্যানভাস চড়িয়ে কাজ শুরু করল নোভা।

কিন্তু একটু পরই হাতের রঙ তুলি ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। 'আমি একটা বোকা, রানা!'

'কেন, কি হলো?'

'সবচেয়ে বড় ক্যানভাস তো মন, সেখানে তোমার স্মৃতি চিরকাল অম্লান থাকবে।' বিষণ্ন হাসি লেগে আছে নোভার ঠোঁটে। 'মূর্তিটা গড়ার সময় অন্তরের চোখ খুলে তোমাকে দেখে নেব।'

'তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'আমার ফিরে যাবার সময় হয়ে এসেছে।'

রানার দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল নোভা। 'সময় হয়ে এসেছে?' বিড়বিড় করল সে।

'হ্যাঁ, খুব বেশি হলে আর হয়তো এক হপ্তা আছি।'

'প্ল্যানটা কি, আমাকে বলবে না?' ফিসফিস করল নোভা।

'বলব বৈকি, সময় হলেই বলব। আচ্ছা, সুযোগ পেলে তুমি কি আমার সঙ্গে লন্ডনে যাবে?'

'না। এখানে আমার অনেক কাজ আছে।'

'কি কাজ?'

'যুগোস্লাভিয়া থেকে আলাদা হয়ে মন্ট্রিনিগ্রো স্বাধীন হতে চাইছে,' বলল নোভা। 'একটু হয়তো সময় লাগবে, কিন্তু স্বাধীন আমরা হবই। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে আমার বা আর কারও নিরাপত্তা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করতে হবে না।' হঠাৎ হাসল সে। 'তখন যদি তোমাকে ডাকি, রানা? তুমি আসবে না?'

'নিশ্চয়ই আসব,' বলল রানা। 'কিন্তু তার তো দেরি আছে, নোভা। আমি পাণ্ডুলিপি আর ডকুমেন্টটা নিয়ে চলে যাবার পর কি হবে সেটা ভেবে দেখেছ?'

'যা হবার হবে, এ নিয়ে এখুনি চিন্তা করে কি লাভ?'

'আমি একটা বুদ্ধি করেছি,' বলল রানা। 'টপ সিক্রেট ডকুমেন্টের একটা কপি তোমাকে দিয়ে যাব। ড. সিডাককে তুমি বলবে, মুর্তজায়েভকে আটকাতে পারোনি ঠিকই, কিন্তু ডকুমেন্টটা কৌশলে আমার কাছ থেকে রেখে দিয়েছ।'

'বাহ্, চমৎকার!' হেসে উঠল নোভা, যেন জোর করেই। 'সিডাক আঙ্কেল দারুণ খুশি হবেন। ভাল কথা, কাল রাতে সুজা আঙ্কেল আমার কাছে এসেছিলেন। শুনলাম তুমি নাকি বাডভায় যাচ্ছ। কাগজগুলো আনতে। তা কবে যাচ্ছ?'

'আজ রাতে, আর কয়েক ঘণ্টা পর।'

'আজই!' নার্ভাস দেখাল নোভাকে। 'কিন্তু, রানা, তোমাকে তো আমি একা ছাড়তে পারব না। তোমার সঙ্গে যেতে হবে আমাকেও।'

কথা না বলে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

ছ'টা বাজতেই সরাইখানায় ডিনার খেয়ে নিল ওরা, সূর্য তখন মাত্র পাটে বসেছে। দু'জনে একসঙ্গেই বেরুল, হাত ধরাধরি করে। বনরক্ষীদের ছাউনিটাকে পাশ কাটাবার সময় ফিসফিস করল নোভা, 'পিছনে লোক লেগেছে।'

'না লাগলেই অবাক হতাম,' বলল রানা। 'ব্রিফকেস থেকে লুগারটা এনেছ তো?'

'এনেছি।'

অলস পায়ে হাসাহাসি করতে করতে হাঁটছে ওরা। বাঁক ঘোরার পর অদৃশ্য হয়ে গেল শহরের পাঁচিল, সরাইখানা, বনরক্ষীদের তাঁবু। এই রাস্তা পাহাড়ের গায়ে উঠেছে, তবে ঢালটা এখনও শুরু হয়নি। ফাঁকা রাস্তায় লুকাবার উপায় নেই, ঘাড় ফেরালেই ফেউগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। দু'জন লোক, পরস্পরের কাছ থেকে খানিকটা ব্যবধান রেখে পিছু পিছু আসছে। লোক দু'জনের পিছনে, ইঁট বিছানো সরু একটা গলির মুখে, বনরক্ষীদের একটা ভ্যানগাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সন্ধে ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শীতও বাড়ছে। কোটটা পরে নিল রানা, তারপর নোভাকে পরতে সাহায্য করল। এই সুযোগে আরেকবার পিছন দিকে তাকাল ও। তাকাতেই হাসি পেল। লোকগুলো কি করবে বুঝতে পারছে না—একজন রাস্তার ধারে প্রস্রাব করতে দাঁড়িয়েছে, আরেকজন ঝুঁকে ঘাসের ডগা ছিঁড়তে ব্যস্ত।

একটা হাফ-ট্রাক দ্রুতবেগে ওদেরকে পাশ কাটাল। খানিক দূরে গিয়ে সজোরে ব্রেক কষল ড্রাইভার, তারপর পিছিয়ে এসে ওদের পাশে থামল। ড্রাইভিং সীটে সুজায়েভকে দেখা গেল। 'ভাব দেখাও আমাকে পথ-নির্দেশ দিচ্ছ,' নোভাকে বলল সে। হাত তুলে অভিনয় শুরু করল নোভা। 'এক হাজার মিটার সামনে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়েছে রাস্তা,' বলে চলেছে সুজায়েভ। 'বাঁকটা ঘুরলে পিছনের ওরা তোমাদেরকে আর দেখতে পাবে না। বাঁক ঘুরেই ছুটবে।' একটা হাত নাড়ল সে, তারপর গিয়ার দিয়ে হাফ-ট্রাক ছেড়ে দিল।

ইতিমধ্যে পিছনের লোক দু'জন ওদেরকে লক্ষ করে ছুটতে শুরু করেছে। তাদের পিছন থেকে ভ্যানগাড়িটাও রওনা হলো। তবে হাফ-ট্রাকে রানা ও নোভা

ওঠেনি দেখে ভ্যানগাড়ি আবার রাস্তার ধারে পার্ক করল, লোক দু'জনও দৌড় থামিয়ে আগের মত হাঁটছে।

রাস্তা ক্রমশ উঁচু আর সরু হতে শুরু করল। বাঁকটা দূর থেকেই দেখতে পেল ওরা। ওদের সামনে পাঁচতলা বাড়ির মত প্রকাণ্ড একটা বোল্ডার পড়ে আছে, প্রায় চারকোনা; সেটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়েছে রাস্তাটা। ওরা বাঁক ঘোরার পর পিছনের রাস্তা অদৃশ্য হয়ে গেল। নোভার হাত ধরে ছুটল রানা। সামনে থেকে অকস্মাৎ ধেয়ে আসতে দেখা গেল ক্যানভাস ঢাকা সাতটনী একটা ট্রাক–বনরক্ষীদের ভ্যানগাড়ি। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে বাঁকের মুখে আড়াআড়ি ভঙ্গিতে থামল সেটা, এঞ্জিন বন্ধ করে লাফ দিয়ে নিচে নামল ড্রাইভার, ছুটে ঢুকে পড়ল পাশের জঙ্গলে।

ছুটতে ছুটতে আরও একটা বাঁক ঘুরল ওরা। সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সুজায়েভের হাফ-ট্রাক। ওরা দু'জন ক্যাবে উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল সে।

বাডভা ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু বিশ কিলোমিটার পেরুবার পরই বেঁকে বসল হাফ-ট্রাক। রেডিয়েটরে পানি নেই দেখে আসাদ নামে কারও চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করছে সুজায়েভ। জানা গেল, বনরক্ষীদের ড্রাইভার আসাদ তার বন্ধুর ছেলে, পাঁচ হাজার দিনার দিয়ে হাফ-ট্রাকটা ধার নেয়ার সময় সে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিল, ট্রাকে তেল-পানি সব ভরে দেয়া হয়েছে।

'দশ কিলোমিটার কি হাঁটতে হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই অন্ধকারে?' মাথা নাড়ল নোভা। 'রাতে নিজেদের গাড়ি দেখলে বনরক্ষীরা কিছু বলবে না। কিন্তু কাউকে হাঁটতে দেখলে থামাবে। আমাকে দেখলে আটকে হয়তো রাখবে না, কিন্তু প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে জান খারাপ করে দেবে। সুজা আঙ্কেল, কাছেপিঠে ঝর্না নেই?'

'আছে, তিন কিলোমিটার হাঁটতে হবে,' বলে একটা জেরিক্যান নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সে।

হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে ট্রাকের পিছনে বসে থাকল ওরা। ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের ঢালে রয়েছে, চারপাশে গভীর জঙ্গল। ঝিঁঝি পোকার ডাকাডাকিতে কান পাতা দায়। চাঁদ নেমে গেছে পশ্চিম দিগন্তের কাছে, গাছপালার আড়াল থাকায় দেখা যাচ্ছে না। ওরা বসেছে স্তূপ করা একটা তেরপলের ওপর। এক সময় রানার হাতটা ধরে নিজের কোলের ওপর তুলে নিল নোভা। আঙুলগুলো মটকে দিচ্ছে। 'নিজের সম্পর্কে আমাকে তুমি প্রায় কিছুই বলোনি, রানা।'

'না, বলিনি।'

'কেন?'

'বলার তেমন কিছু নেই যে, তাই।'

'না বললেও, অনেক কিছুই আমি আন্দাজ করতে পারি, রানা।'

'তাই নাকি? শুনি তো?'

'তুমি একজন স্পাই।'

'মাই গড!'

'তুমি বিয়ে করোনি।'
'কি করে বুঝলে?' রানা এবার সত্যি বিস্মিত।
'তোমার খেলা মৃত্যু বা আজরাইলের সঙ্গে, রানা। কঠিন বাস্তবতা তোমাকে নিষ্ঠুর হতে শিখিয়েছে। তবে তোমার মত বেপরোয়া পুরুষের জীবনে নারী পরম বন্ধু হিসেবেই উদয় হয়। তুমি তাদেরকে দেবীর আসনে বসাও। কিন্তু তাদের কাউকেই খুব বেশি কাছে আসতে দাও না, সব সময় একটা দূরত্ব বজায় রাখো। তুমি যে-কোন দিন হারিয়ে যেতে পারো, তাই তাদের কাউকে বাঁধনেও জড়াও না।'
রানা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল।
'তোমার জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, রানা,' বিড়বিড় করল নোভা। 'কারণ পৃথিবীতে তোমার মত নিঃসঙ্গ মানুষ খুব কমই আছে। একদিক থেকে তোমার জীবন অভিশপ্তই বলতে হবে।'
নোভার গলার সুরে এমন কিছু ছিল, একটা হাত তুলে তার গালে আঙুল বোলাল রানা। 'এ কি, নোভা! তুমি কাঁদছ!'
'দু'দিনের জন্যে হলেও, তোমাকে কাছে পেয়ে নিজেকে আমার সুখী মনে হয়েছে,' ধীরে ধীরে বলল নোভা। 'কিন্তু তার বিনিময়ে তোমার জন্যে আমার কিছুই করার নেই। আমার যদি ক্ষমতা থাকত! যিশু! আমি যদি তোমাকে সুখী করতে পারতাম!'
জোর করে হাসল রানা। 'মিষ্টি মেয়ে, কে বলল আমি সুখী নই?'
রানার গালে নিজের গালটা চেপে ধরল নোভা। 'অস্বীকার করে লাভ নেই, রানা। আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি। আমি সামান্য একটা মেয়ে, কতটুকুই বা বুদ্ধি আমার, তবু বলি–যদি সম্ভব হয়, এক সময় থেমো। কাউকে চিরকালের জন্যে আপন করে পাওয়া, হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতই লোভনীয়...'
'স্বর্গ তো এই মুহূর্তে আমাদের হাতের মুঠোতেই। এসো, নোভা, কাল কি হবে ভুলে যাই। আজ, এই মুহূর্তে, এসো আমরা সুখী হই।'
'হই,' রানার কানে ফিসফিস করল নোভা।

পানি নিয়ে দু'ঘণ্টা পর ফিরল সুজায়েভ। কোন ঘটনা ছাড়াই আরও দশ কিলোমিটার পার হয়ে এল ওরা। একটা মাঠের পাশ দিয়ে যাবার সময় সারি সারি কয়েকটা কুঁড়েঘর দেখাল নোভা, ওদের খামারবাড়ি। তবে অন্ধকারে কিছুই তেমন পরিষ্কার নয়। খামারবাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে উপত্যকার একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এল হাফ-ট্রাক। থামল একটা চার্চ ও কবরস্থানের পাশে।
'এখানে থামলেন কেন, সুজা আঙ্কেল?' অবাক হয়ে জানতে চাইল নোভা।
নিচে নেমে ট্রাকের পিছন থেকে একটা কোদাল আর একটা টর্চ নিল সুজায়েভ। 'এসো আমার সঙ্গে, বলছি।' ভাঙা গেট পেরিয়ে কবরস্থানে ঢুকে পড়ল সে। নোভা আর রানা পিছু নিল।
কবরস্থানটা দু'ভাগে ভাগ করা, মাঝখানে নিচু একটা পাঁচিল। পাঁচিলের ওপারে, বেশ খানিকটা দূরে, গম্বুজ আকৃতির কি যেন দেখা যাচ্ছে। 'কি ওটা?'

নোভার হাত ছুঁয়ে জানতে চাইল রানা।

'পাঁচিলের ওপারে তোমাদের কবরস্থান, মানে মুসলমানদের,' বলল নোভা। 'আকাশের গায়ে গম্বুজ দেখতে পাচ্ছ? ওটা মসজিদ।'

'বাডভায় মসজিদ আছে, কিন্তু কোটরে নেই কেন?'

'নেই, কারণ কার্চিক জোড়ার যুবদল কোটরের মুসলমানদের মেরে ভাগিয়ে দিয়েছে, মসজিদগুলোকে করা হয়েছে চার্চ, আশ্চর্য কি জানো, ওই নতুন চার্চগুলোয় কোন খ্রিস্টান প্রার্থনা করতে যায় না।'

পাঁচিলের এপারেই, একটা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল সুজায়েভ। 'এসো, নোভা। যা তুমি জীবনে কোনদিন দেখবে বলে ভাবোনি, আজ তোমাকে তাই দেখাই।'

'কি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল নোভা।

'এই যে কবরটা দেখছ, এখানে আমার প্রিয় বন্ধু শুয়ে আছে। সাঈদ মুর্তজায়েভ আমাকে নির্দেশ দেন, আমি আমার খ্রিস্টান বন্ধুদের গোপনে খবর দিয়ে এখানে ডেকে আনি। আমাদের সামনে নিকোলাই সুনজাককে এখানে কবর দেয়া হয়েছে।'

'ওহ্, গড!' কবরের পাশে ঝপ করে বসে পড়ল নোভা। 'কিন্তু আমি তো সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, বাবার লাশটা পাওয়া যায়নি...'

'তুমি হয়তো জানো, এদিকের একটা পাহাড়েই লুকিয়ে ছিলেন মুর্তজায়েভ। তোমার বাবা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে খুন হয়ে যান। কার্চিক জোড়া লাশের কোন ব্যবস্থা না করেই বেলগ্রেডে ফিরে যায়। পুলিস এসে লাশ খুঁজবে, মর্গে নিয়ে গিয়ে কাটাছেঁড়া করবে, মুর্তজায়েভ এটা চাননি। ভাল করে দেখো, কবরে কারও নাম নেই। ইচ্ছা করেই নাম লেখানো হয়নি, কেউ যাতে চিনতে না পারে।'

বাবার কবরে হাত বুলাচ্ছে নোভা। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এসেছে।

টর্চটা রানার হাতে দিয়ে কবরের আরেক মাথায় কোদাল চালাতে শুরু করল সুজায়েভ।

আঁতকে উঠে নোভা বলল, 'কি করছেন!'

'না-না, কবরের কোন ক্ষতি হবে না,' তাড়াতাড়ি আশ্বস্ত করল সুজায়েভ। কবরের পায়ের দিকটা তিন ফুট খুঁড়তেই স্টীলের একটা চৌকো বাক্স বেরুল। বাক্সটা তুলে রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'এটায় তালা দেয়া আছে, কিন্তু চাবিটা আমার কাছে নেই।'

'আমার কাছে আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু বাক্সটা আমি নিরিবিলি কোন জায়গায় খুলতে চাই, একা। সেখানে আলোও থাকতে হবে।'

'মোমের আলো হলে চলবে?' জিজ্ঞেস করল সুজায়েভ।

'হ্যাঁ, চলবে।'

'আসুন,' বলে হাঁটা ধরল সুজায়েভ।

উপত্যকা থেকে ঢাল বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠল ওরা। সরু পথ, ভেড়ার পাল আসা-যাওয়ায় তৈরি হয়েছে। প্রশস্ত একটা মালভূমিতে পৌঁছাল ওরা, চারদিকে পাইন আর সাইপ্রেস গাছের ছড়াছড়ি। রাখালদের কুঁড়েটা একজোড়া

বুড়ো ওক গাছের মাঝখানে। ভেতরে ঢুকে দুটো মোমবাতি জ্বালল সুজায়েভ। দেয়ালগুলো নিরেট পাথর, ছাদে স্লেট ব্যবহার করা হয়েছে। ফার্নিচার বলতে বেঢপ সাইজের একটা টেবিল, খানকতক হাতলবিহীন চেয়ার।

একটা চেয়ারে বসে টেবিলে হাত রাখল নোভা, হাতের ওপর চিবুক ঠেকিয়ে চোখ বুজল। বোঝাই যায়, সে তার বাবার কথা ভাবছে।

'এখানে আপনি কতক্ষণ থাকবেন?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সুজায়েভ।

'ট্রাকটা আপনি সম্ভব হলে কোথাও লুকিয়ে রাখুন,' বলল রানা। 'আমাদেরকে নিতে আসবেন এক ঘণ্টা পর।'

সুজায়েভ চলে যাবার পর চাবি বের করে বাক্সটা খুলল রানা। পলিথিনে মোড়া তিনটে পাণ্ডুলিপি রয়েছে ভেতরে। ছোট একটা প্লাস্টিকের কৌটার ভেতর পাওয়া গেল খুদে বোতাম আকৃতির মাইক্রোফিল্ম।

নিঃশব্দে রানার দিকে তাকিয়ে আছে নোভা।

'এটা একটা নেগেটিভ ফিল্ম,' মাইক্রোফিল্মটা দেখিয়ে বলল রানা। 'ওয়াশ ও এনলার্জ না করলে বোঝা যাবে না কি আছে এতে। আর, কি আছে না জেনে আমি কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নই।'

'ওয়াশ কিংবা এনলার্জ করতে হলে বেলগ্রেড অথবা পডগোরিকায় যেতে হবে তোমাকে,' বলল নোভা। 'পডগোরিকায় আমার পরিচিত একটা স্টুডিও আছে, একমাত্র সেখানেই কাজটা গোপনে করা সম্ভব।'

'কিন্তু আমি চাই বেলগ্রেড থেকে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে, এই বাড়ভাতেই থাকো তুমি,' বলল রানা। 'তুমি যদি চিঠি লিখে দাও, স্টুডিওর মালিক কাজটা করে দেবে? তার আগে বলো, লোকটা কি বিশ্বস্ত?'

'হ্যাঁ, বিশ্বস্ত,' বলল নোভা। 'সাঈদ আঙ্কেলের আপন ভাই তিনি। ঠিক আছে, কাগজ-কলম দাও, চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি বেলগ্রেডে ফিরে যাবে, তারপর আবার আসবে, এ-সব কিন্তু কিছুই আমাকে জানাওনি।'

'এই তো জানালাম। বাকি সবও ধীরে ধীরে জানতে পারবে।'

প্লাস্টিকের বাক্সটা জানালা দিয়ে ফেলে দিল রানা। রোলেক্স রিস্টওয়াচের পিছনের ঢাকনি খুলে মাইক্রোফিল্মটা লুকিয়ে রাখল ভেতরে। ঘড়িটা আবার কব্জিতে বাঁধছে, পলিথিনের মোড়ক খুলে একটা পাণ্ডুলিপি বের করল নোভা। 'এটায় শুধু কবিতা, রানা।'

'তোমার সাবজেক্ট হলেও, এখন ওটা রাখো,' বলল রানা। 'ওঁর আত্মজীবনী আর রাজনীতির ওপর লেখা বইটা থেকে এক-আধটু পড়ে শোনাও দেখি।'

নোভা শুধু আত্মজীবনীর ভূমিকাটা ইংরেজিতে ভাষান্তর করে শোনাল রানাকে। রাজনীতির ওপর লেখা বইটার নাম দেয়া হয়েছে, 'বলকানে কার কি স্বার্থ'। পাতার পর পাতা উল্টে গেল নোভা, মাঝে মধ্যে দু'চার প্যারা ভাষান্তর করে শোনাচ্ছে। ঘড়ির ওপর একটা চোখ রেখেছে রানা। সুজায়েভের ফিরে আসতে এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি।

নোভা পড়ছে, 'মন্ট্রিনিগ্রোর ভবিষ্যৎ সার্বদের হাতে নিরাপদ নয়, এটা আর নতুন করে ব্যাখ্যা না করলেও চলে। তবে আমেরিকার সাহায্য নিয়ে মন্ট্রিনিগ্রো

স্বাধীন হবে, এ-ও আমরা চাইতে পারি না। কারণ ওয়াশিংটন চিরকালই বলকানের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে...'

'ওয়াশিংটন এখানে উপস্থিত থাকলে এই মিথ্যে অভিযোগের প্রতিবাদ করত,' নতুন একটা কণ্ঠস্বর বাধা দিল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জেমস ফোলি, হাতে একটা অটোমেটিক রাইফেল। তার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছেন ম্যাক বিলিয়ার্ড, হাতে একটা কোল্ট .৪৫। তাঁর কাঁধের ন্যাপস্যাকটা রানার দৃষ্টি এড়ায়নি, ডিপ্লোম্যাটিক ডিসপ্যাচ পাউচের মত দেখতে।

'সারপ্রাইজড, মি. রানা?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করল ফোলি।

'এক অর্থে নয়,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'যেখানে মধু, মৌমাছি তো সেখানে আসবেই।'

'আপনাকে সহযোগিতা করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, কিন্তু আপনি রাজি হননি,' কঠিন সুরে বলল ফোলি। 'এখন আমরা পরস্পরের প্রতিপক্ষ। মুর্তজায়েভের পাণ্ডুলিপি আর ডকুমেন্টটা আমরা নিয়ে যাব। প্লীজ, বাধা দেবেন না।'

'এটা কি আপনার বাপের সম্পত্তি যে নিয়ে যাব বললেই নিয়ে যেতে পারবেন?' রানা রাগ চেপে রাখার চেষ্টা করছে না।

'নিয়ে যেতে এসেছি, নিয়েও যাব, প্রয়োজনে আপনাকে খুন করে হলেও,' বলল ফোলি। 'বিশ্বাস করুন, আপনাকে খুন করতে আমার খারাপ লাগবে না। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা আমি উপভোগই করব।'

ফোলিকে পাশ কাটিয়ে টেবিলের দিকে এগোলেন বিলিয়ার্ড, লক্ষ রাখলেন ফোলির লাইন অভ ফায়ারে বাধা হচ্ছেন না। টেবিলে পড়ে থাকা পাণ্ডুলিপি দুটো কাঁধের ব্যাগে ভরলেন তিনি। শেষ পাণ্ডুলিপিটা নোভার হাত থেকে টেনে নিলেন।

নোভা বলল, 'ম্যাক আঙ্কেল, কবিতার বইটা সাঈদ আঙ্কেল আপনার নামে উৎসর্গ করেছেন।'

'তাই নাকি!' কবিতার পাণ্ডুলিপিটাও নিজের ব্যাগে ভরলেন বিলিয়ার্ড। 'ইন্টারেস্টিং। আমার একটা প্রস্তাব আছে, মি. রানা। এগুলো আমার কাছেই থাকবে। আমি একটা একটা করে ফোলিকে পড়তে দেব। পড়ে দেখার পর সে যদি আমাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারে যে এগুলো ছাপা হওয়া উচিত নয়, আমি তাকে পাণ্ডুলিপি সংশোধন করার সুযোগ দিতে চাই। সে সংশোধন করবে ডুপ্লিকেট কপিতে। মূল কপিগুলো আমার কাছেই থাকবে। পরে আমি সেগুলো আপনাকে দিতে পারি, কিংবা পুড়িয়েও ফেলতে পারি।'

'আপনাকে তো আমি বলেইছি, মি. বিলিয়ার্ড, আপনার এই প্রস্তাব আমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। মূল পাণ্ডুলিপিগুলোই চাই আমার।'

'না, আমার চাই,' মার্জিত ইংরেজিতে বলল কেউ। 'আরও চাই টপ সিক্রেট ডকুমেন্টটা।'

লোকটা সেই তালগাছ, জর্জিক জোডা। ঠিক তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ডুপ্লিকেট কার্বন কপি, কার্চিক জোডা। ভাইয়ের সঙ্গে তফাৎ, ক্ষতচিহ্নটা তার গালে নয়, গলায়। কমপ্লিট কালো সুট পরেছে সে, দেখতে একজন কূটনীতিকের

মতই লাগছে। ঝট করে পিছন দিকে ঘাড় ফেরাল ফোলি। ব্যাগ থেকে হাত বের করে বিলিয়ার্ডও ধীরে ধীরে তাকালেন। দুই জোড়ার হাতে দুটো মেশিন পিস্তল।

'আমি জানতাম আবার আমাদের দেখা হবে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। 'তবে এত তাড়াতাড়ি বা এখানেই দেখা হবে তা ভাবিনি।'

'চিঠি লিখে আমিই তোমাকে জানিয়েছি,' ভারী গলায় বলল ছোট জোড়া। 'তোমার কাছে একটা ওয়ালথার আছে, রানা। ওটা বের করে টেবিলের ওপর রাখো।' ফোলির দিকে তাকাল। 'আপনার রাইফেলটাও ওয়ালথারের পাশে রাখুন।' সবশেষে বিলিয়ার্ডকে বলল, 'কাঁধের ব্যাগ আর হাতের রিভলবার রাইফেলের পাশে রাখবেন।'

কেউ এক চুল নড়ল না।

কর্কশ শব্দে হেসে উঠল কার্চিক জোড়া। ভাইকে সরিয়ে দিয়ে দোরগোড়া থেকে এক পা সামনে বাড়ল সে। 'আমাকে খুন করার সুযোগ দিচ্ছ?' মেশিন পিস্তলের ট্রিগারে চেপে বসছে তার আঙুল।

এবার বিলিয়ার্ড নড়ে উঠলেন। হাতের কোল্ট আর কাঁধের ব্যাগ টেবিলের ওপর রাখলেন তিনি।

ফোলিকে রানা আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখল। জোড়ার দৃষ্টি নিজের দিকে ফেরাবার জন্যে ওয়ালথারটা বের করে ঠকাস করে টেবিলে রাখল ও, বলল, 'আমারই ভুল—আগেই তোমার একটা ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।' কিন্তু তাতে কাজ হলো না। রাইফেলটা ঘোরানো শেষ করতে পারল না ফোলি, তার আগেই মাথায় গুলি করল কার্চিক জোড়া। এত কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে, ফোলির মাথার অর্ধেকই স্রেফ উড়ে গেল।

জোড়া নাগালের মধ্যেই রয়েছে, ফলে রানা ও বিলিয়ার্ড তাকে ধরার চেষ্টা করল। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল কার্চিক জোড়া, মেশিন পিস্তল ঘুরিয়ে লক্ষ্যস্থির করল নোভার মাথায়। 'সম্ভবত এক পশলা গুলিতে তিনজনকেই শেষ করে দিতে পারি, তবে প্রথম কয়েকটা বুলেট নোভাকেই লাগবে।'

স্থির হয়ে গেল রানা ও বিলিয়ার্ড। জোড়া আর ওদের মাঝখানে পড়ে রয়েছে ফোলি—ওদের পায়ের কাছে এখনও সামান্য ঝাঁকি খাচ্ছে, তবে বেঁচে নেই। পা দিয়ে টেনে রাইফেলটা দরজার বাইরে ফেলে দিল কার্চিক জোড়া। সাবধানে এগোল তার ভাই। টেবিল থেকে কোল্ট আর ওয়ালথারটা নিয়ে কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল। সবশেষে হাত বাড়াল ব্যাগটার দিকে। তার চোখ ও মেশিন পিস্তল সারাক্ষণ ওদের দিকেই তাক করা। 'ডকুমেন্টটা কোথায়?'

'তোমরা আমাদেরকে পেলে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জেমস ফোলি আর ম্যাক বিলিয়ার্ডকে অনুসরণ করে। আমি জানতাম, ওরা তোমাকে ঠিকই খুঁজে পাবে।' হাসছে কার্চিক।

সময় পাবার চেষ্টা করছে রানা। বিলিয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কিভাবে জানলেন আমরা এখানে আছি?' ভাবছে, সুজায়েভের কোন বিপদ হয়নি তো?

বিলিয়ার্ড বললেন, 'অনেক বছর আগেই মুর্তজায়েভ আমাকে জানিয়েছিলেন

নিকোলাই সুনজাককে বাডভায় কবর দেয়া হয়েছে। কবরটা চিনতাম না, তবে কবরস্থানটা কোথায় জানতাম। আপনারা বাডভায় আসছেন, এটা জানতে পেরেই ধরে নিই মুর্তজায়েভ তাঁর পাণ্ডুলিপি ও ডকুমেন্ট সুনজাকের কবরেই লুকিয়ে রেখেছেন। নোভাদের খামার বাড়িতে খোঁজ করে আপনাদেরকে পেলাম না। কবরস্থানে ঢুকে দেখলাম একটা কবর খানিকটা খোঁড়া হয়েছে। তখনই সন্দেহ হলো, আপনারা নিশ্চয়ই পাহাড়ের ঢালে রাখালদের কুঁড়েতে আছেন।'

'এখানে আমি গল্পগুজব করতে আসিনি,' হুমকি দেয়ার সুরে বলল কার্চিক জোড়া। 'রানা, নামাজ পড়ো তো? পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ো। মি. বিলিয়ার্ড, আপনিও। প্রতিটা নির্দেশ আমি শুধু একবারই দেব। ভাল কথা, কেউ যেন না ভাবে ডকুমেন্টটার কথা ভুলে গেছি আমি। এই ঘরেই কারও কাছে আছে ওটা, সার্চ করলেই বেরিয়ে পড়বে।'

হাঁটু ভাঁজ করে বসল ওরা, হলুদ মগজ সহ রক্তাক্ত ফোলির মাথা রানার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে।

'এবার, কচি, তোমার পালা,' নোভাকে বলল কার্চিক জোড়া। পকেট থেকে এক প্রস্থ নাইলন কর্ড বের করে ছুঁড়ে দিল টেবিলের দিকে। 'বাঁধো ওদেরকে। শক্ত হওয়া চাই, আমি পরীক্ষা করব। যদি দেখি কোন রকম চালাকি করেছ, তোমার একটা স্তন কেটে নেব ব্লেড দিয়ে।'

মেশিন পিস্তল রানা আর বিলিয়ার্ডের মাথা লক্ষ্য করে ধরে আছে দুই ভাই। ভয়ে ও অপমানে থরথর করে কাঁপছে নোভা।

কার্চিক নির্দেশ দিচ্ছে। 'হাতগুলো পিছনে টেনে নাও, পিঠের ওপর। তারপর পায়ের গোড়ালি হাতের সঙ্গে এক করো।' কান্না চেপে রাখায় নোভার কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল। তবে জোড়ার নির্দেশ মত কাজ শুরু করল সে। 'আবার বলছি, শক্ত করে বাঁধবে, কর্ড যেন মাংসে ডেবে যায়।'

রহস্যটা রানা ধরতে পারছে না। গুলি করে চলে গেলেই তো পারে জোড়া। লাশগুলোর হাত-পা বাঁধা হতে হবে কেন? তারপর রানা ভাবল, সুজায়েভ কি ঠিক এক ঘণ্টা পার করেই ফিরবে? সেক্ষেত্রে আরও অন্তত পঁচিশ মিনিট সময় নেবে সে। ফিরলেই বা কি, সে তো নিরস্ত্র। রাইফেলটা অবশ্য দরজার বাইরে পড়ে রয়েছে। কিন্তু সুজায়েভ কি রাইফেল চালাতে জানে? 'নোভার একটা প্রশ্ন আছে, জোড়া,' বলল রানা। নোভা বিলিয়ার্ডের হাত-পা এক করে বাঁধছে, হাত কাঁপায় কাজটায় সময় লাগছে। 'এ-কথা কি সত্যি যে ওর বাবাকে তুমিই খুন করেছিলে?'

নাটকীয় ভঙ্গিতে, বিনয়ের অবতার সেজে, কুর্নিস করার আদলে সসম্মানে অভিবাদন জানাল কার্চিক জোড়া। 'হ্যাঁ, কৃতিত্বটা এই অধম বান্দারই। যদি জিজ্ঞেস করো কেন, তাহলে বলব পার্টি ও দেশের স্বার্থে ওটা ছিল আমার পবিত্র দায়িত্ব। সুনজাক মূল দলে থেকে গেলে কি হবে, মন্ত্রিনিগ্রোকে স্বাধীন করার শপথ নিয়েছিল সে, তলে তলে মুর্তজায়েভের দলে যোগ দেয়ার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিল।'

'তুমি বলতে চাইছ ব্যক্তিগত কোন কারণ ছিল না?'

কদর্য হাসি ফুটল জোড়ার মুখে। 'একেবারে ছিল না, তাই বা বলি কি করে!

ছোটবেলায় নোভার মায়ের সঙ্গে এক সঙ্গে খেলেছি। তার প্রতি আমার একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। একবার একটা সাপ তাড়া করেছিল, সেটাকে মেরে আমি তাকে বাঁচাই। আরেকবার নদীতে ডুবে যাচ্ছিল, সেবারও আমিই তার প্রাণ রক্ষা করি। তোমরাই বলো, এ-সব কারণে তার প্রতি আমার একটা অধিকার জন্মাল না?'

রানার হাত-পা এক করছে নোভা।

'কিন্তু বড় হবার পর লিলি এমন ভাব দেখাতে শুরু করল, সে যেন আমাকে চেনেই না,' আবার শুরু করল জোডা। 'তারপর সে আমাকে কাঁচকলা দেখিয়ে সুনজাককে বিয়ে করল। অর্থাৎ আমার ভেতর আগুনটা আরও উসকে দিল সে।'

রানার হাত-পা বাঁধছে নোভা, কিন্তু তাকিয়ে আছে জোডার দিকে। ফিসফিস করল রানা, 'নোভা, তোমার লুগারটা আমার পকেটে ঢুকিয়ে দাও।' কিন্তু আতঙ্কিত নোভা শুনেছে বা উপলব্ধি করেছে বলে মনে হলো না, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে জোডার দিকে।

'বিয়ে হবার পরও লিলির ওপর আমি আমার অধিকার কায়েম করার চেষ্টা করেছি,' বলে যাচ্ছে জোডা। 'কিন্তু সে আমাকে পাত্তাই দিল না। ভেবে দেখলাম, সুনজাক যতদিন বেঁচে আছে, আমার কথায় কান দেবে না লিলি।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তারপর? হ্যাঁ, তারও পর আছে। ক্যান্সারে মারা গিয়ে লিলি আমাকে ফাঁকি দিল। কিন্তু আমার ভেতর যে আগুনটা সে জ্বেলে দিয়ে গেছে সেটা তো নিভল না। তাই প্রতিজ্ঞা করলাম, লিলিকে পাইনি তো কি হয়েছে, লিলির মেয়েকে ঠিকই আমি একদিন ধরব।' হাহ্-হাহ্ করে গা রিরি করা হাসিতে ফেটে পড়ল সে। 'লিলির মেয়ে এই নোভা, কচি লিলি, এখন আমার হাতের মুঠোয়।'

রানার হাত-পা বেঁধে সিধে হলো নোভা। থমথম করছে তার চেহারা, তবে কাঁপুনিটা বন্ধ হয়ে গেছে। সে সিধে হতেই ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডাকল জোডা। টেবিল ঘুরে তার দিকে এগোল নোভা, হাত দুটো কোটের পকেটে। বাম হাত দিয়ে তার একটা স্তন ধরল জোডা। 'এ তোমার নিয়তি, নোভা। আমার ভেতর যে আগুনটা তোমার মা জ্বেলে দিয়ে গেছে, এখন সেটা আমাকে নেভাতে হবে।' নোভার চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল সে। মুখ বাড়িয়ে চপ্ করে চুমো খেলো ঠোঁটে, তারপর ঠেলে দিল দূরে। 'কি বলেছি, মনে আছে তো? একই নির্দেশ দু'বার দেব না।' হাত তুলে কামরার একটা কোণ দেখাল, সেখানে এক গাদা খড় পড়ে আছে। 'ওখানে দাঁড়িয়ে কাপড় খোলো। তাড়াতাড়ি। আগুনটা নিভুক, তারপর রানাকে সার্চ করতে হবে।'

নোভা নড়ছে না।

কর্ড বাঁধা হাত দুটো মোচড়াচ্ছে রানা। ঢিল করেই বাঁধা হয়েছে, খুলতে বেশি সময় লাগল না। বাঁধন মুক্ত হয়েও নড়তে পারছে না রানা, তার আগে লুগারটা হাতে পেতে হবে। কিন্তু কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখল, সেটা খালি।

'কি হলো?' মারমুখো হয়ে নোভার দিকে এগোল জোডা। 'লজ্জা পাচ্ছ

নাকি?' আবার চুল ধরে নোভাকে নিজের গায়ের ওপর টেনে আনল সে।

রানা লাফ দেয়ার জন্যে সিধে হতে শুরু করেছে, শুরু হলো বিস্ফোরণ। একটা, দুটো, তিনটে–যতক্ষণ না জোড়া লাগা দুটো শরীর ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হলো। মেশিন পিস্তলটা জোডার আঙুল থেকে খসে পড়ল, দু'হাত দিয়ে বুক আর পাঁজর চেপে ধরল সে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। কোটের পকেট থেকে হাত দুটো বের করেনি নোভা। একটা পকেট থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখনও। তার পায়ের কাছে ধপাস করে পড়ে গেল জোডা, পড়ার পর আর নড়ল না।

বিদ্যুৎগতিতে কার্চিকের মেশিন পিস্তল তুলে নিয়ে গুলি করল রানা ওর ভাইকে। ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ধপাস করে পড়ল সে ঘরের বাইরে।

ছুটে এসে রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল নোভা। সেই কাঁপুনিটা শুরু হলো আবার।

এগারো

নোভার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল রানা। এখন আর সে ফোঁপাচ্ছে না। বুক থেকে তাকে ছাড়িয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল ও, হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা তুলে কাঁধে ঝোলাল।

জর্জিক জোডার বেল্ট থেকে ওয়ালথার আর কোল্টটা বের করল রানা। কোল্টটা ধরিয়ে দিল বিলিয়ার্ডের হাতে। 'এখনও এটা আপনার কাজে লাগতে পারে।'

'ধন্যবাদ, মি. রানা।' দরজার বাইরে থেকে ফোলির রাইফেলটাও তুলে আনলেন বিলিয়ার্ড।

ওয়ালথারটা পকেটে রেখে জোডার মেশিন পিস্তলটা নোভার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। 'এটা নোভার কাছে থাকবে, পরে আমার কাজে লাগতে পারে।' বিলিয়ার্ডের দিকে তাকাল ও। 'লাশগুলো এখানে থাকলে নোভা আর সুজায়েভের বিপদ হবে। ফোলির লাশ নিশ্চয়ই আপনি বেলগ্রেডে নিয়ে যেতে চাইবেন, লন্ডনে পাঠাবার জন্যে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'আপনারা বোধহয় বনরক্ষীদের গাড়ি নিয়ে এখানে এসেছেন?'

বিলিয়ার্ড মাথা নাড়লেন। 'না, পডগোরিকা থেকে ডিপ্লোম্যাটিক প্লেট লাগানো একটা পাজেরো নিয়ে এসেছি।'

'কিন্তু আমার জানামতে, মিলোসেভিচের জঙ্গলে প্রাইভেট কোন গাড়ি ঢুকতে দেয়া হয় না।'

'আমরা ডিপ্লোম্যাট, মি. রানা,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'শিকারে বেরুলেও ছোটখাট বার আর হিটার দরকার হয় আমাদের। বনরক্ষীদের গাড়িতে কি এ-সব

থাকে?'

'ওই গাড়িটা কাল বিকেলে বা পরশু পডগোরিকায় আমার দরকার হতে পারে, পাব কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সাঈদ মুর্তজায়েভের উপকার হলে আরও বড় ধরনের সাহায্য করতেও আমার আপত্তি নেই,' বললেন বিলিয়ার্ড।

'গাড়িটার যদি কোন ক্ষতি হয়,' বলল রানা। 'তার ক্ষতিপূরণ অবশ্যই পাবেন আপনারা। পরে যাতে কোন ঝামেলা না হয়, পুলিসকে জানাবেন ওটা চুরি হয়ে গেছে। তবে থানায় খবরটা দেবেন গাড়িটা আমার হাতে আসার অন্তত বারো ঘণ্টা পর।'

বিলিয়ার্ড মাথা ঝাঁকালেন। 'তাই হবে।'

'এবার বলুন, এখানে কি আপনারা শিকার করতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে লিখিত অনুমতি নিয়ে,' বললেন বিলিয়ার্ড। 'একটানা সাতদিন এখানে আমরা থাকতে পারব। সেজন্যেই ফোলির করুণ পরিণতি ব্যাখ্যা করতে আমার কোন অসুবিধে হবে না। অন্ধকার জঙ্গলে কাউকে নড়াচড়া করতে দেখে চ্যালেঞ্জ করে ফোলি, জবাবে মেশিন পিস্তল দিয়ে তাকে গুলি করে কার্চিক জোড়া। টর্চের আলোয় তাকে আমি দেখতে পাই, কিন্তু ধরতে পারিনি। ফোলিকে খুন করে সে গা ঢাকা দিয়েছে।'

'কিন্তু ওদের লাশ?'

'ওদেরকে এখানেই কোথাও পুঁতে ফেলতে হবে। ওদের আমরা কেউ দেখিনি।'

'তবে কবরস্থানে নয়,' বলল রানা। 'জঙ্গলের কোন গোপন জায়গায়।' হাতঘড়ি দেখল। 'আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবে সুজায়েভ। নোভা, দায়িত্বটা তাকে দেয়া যায়?'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল নোভা।

'সুজায়েভ দুই জোড়াকে পুঁতে হাফ-ট্রাক নিয়ে একাই ফিরে যাবেন কোটরে,' বলল রানা। 'মি. বিলিয়ার্ড, আপনি আমাকে পডগোরিকা পর্যন্ত লিফট দিতে পারবেন তো? আমার ইচ্ছা ডকুমেন্টের একটা কপি আপনার কাছেও থাকুক।'

'কেন পারব না।'

'আরেকটা কথা, মি. বিলিয়ার্ড। ফোলির মৃত্যু সংবাদ কি চব্বিশ ঘণ্টা গোপন রাখা সম্ভব? প্লীজ, কারণটা জানতে চাইবেন না।'

চিন্তামগ্ন হলেন বিলিয়ার্ড। প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড পর মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'সম্ভব।'

নোভার দিকে তাকাল রানা। 'আগের প্ল্যান একটু বদলাতে হচ্ছে, নোভা। এখানে তিনটে লাশ পড়েছে, কাজেই বাডভায় তোমার না থাকাই উচিত। একসঙ্গেই চলো, তোমাকে আমরা কোটরে নামিয়ে দেব। ঠিক আছে?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল নোভা।

'মি. বিলিয়ার্ড, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। ভাল কথা, আজ রাতে তো কোন ফ্লাইট নেই, ফোলির লাশ নিয়ে আপনি সম্ভবত কাল সকালের ফ্লাইটে

বেলগ্রেডে ফিরবেন?'

মাথা নাড়লেন বিলিয়ার্ড। 'চার্টার করা প্লেনটা আমাদের জন্যে এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে।'

'ওই প্লেনে আমার ফেরা চলে না,' বলল রানা। 'আমি পডগোরিকায় রাত কাটিয়ে কাল সকালের ফ্লাইটে বেলগ্রেডে ফিরব।'

রানা থামতেই দোরগোড়ায় হাজির হলো সুজায়েভ। অনেক দূর থেকে দৌড়ে আসায় ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। 'খামারবাড়িতে আপনাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করছিলাম, গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে এসেছি। কি হয়েছে, এরা কারা?'

'আপনি কিছু শোনেননি, আপনি কিছু দেখেননি,' বলল রানা। 'যে-ই প্রশ্ন করুক, আপনি কিছুই জানেন না। ঠিক আছে?'

বোবা হয়ে গেল সুজায়েভ। ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল।

'গাড়িটা লুকিয়ে রেখেছেন তো?'

আবার মাথা ঝাঁকাল সুজায়েভ।

'গুড। আমরা চলে গেলে এই লাশ দুটো,' ইঙ্গিতে কার্চিক জোড়া আর তার ভাইকে দেখাল রানা, 'জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে পুঁতে ফেলবেন। সাবধান, কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। পারবেন?'

'জ্বী।'

'আপনাকে যে আয়োজন করার দায়িত্ব দিয়েছি, তা কাল বিকেলের মধ্যে শেষ করা দরকার। সম্ভব?'

'জ্বী, সম্ভব।'

'হাফ-ট্রাক ধার করে আনলেন, রাস্তায় ট্রাক দাঁড় করিয়ে আপনার লোক রোড ব্লক তৈরি করল, এ-সব কারণে আপনাকে কি বিপদে পড়তে হবে?'

'যে ট্রাকটা রোড ব্লক তৈরি করেছে সেটা চুরি করা। কে চুরি করেছে তার আমি কি জানি। আর এই হাফ-ট্রাক নিয়েই সব সময় কোটর থেকে বাডভায় আসি আমি, বনরক্ষীরা সবাই তা জানে, কাজেই কেউ আমাকে কোন ব্যাপারে জড়াতে পারবে না।' সুজায়েভ হাসছে।

'ভেরি গুড। আমরা অন্য একটা গাড়ি নিয়ে এখুনি ফিরে যাচ্ছি। আমরা চলে গেলেই আপনি লাশের ব্যবস্থা করবেন। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আবার আমাদের দেখা হবে।'

কুঁড়ে থেকে সবাই বেরিয়ে আসছে, রানার হাতে একটা এনভেলাপ গুঁজে দিল সুজায়েভ। কোন প্রশ্ন না করে সেটা পকেটে রেখে দিল রানা।

বেলা একটায় বেলগ্রেড পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে সাঈদ মুর্তজায়েভকে ফোন করল রানা। আশ্চর্যই বলতে হবে, রানার সঙ্গে কথা বলতে তিনি বেশি উৎসাহ দেখালেন না। অনেকটা জেদের সুরেই বললেন, 'মি. রানা, রিসিভারটা আপনি ড. সিডাককে দিন, যা বলার সরাসরি তাঁকেই বলব আমি।'

'উনি আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি নন,' মুখ ভার করে ড. সিডাককে বলল রানা। 'বলছেন, যা বলার আপনাকেই বলবেন।'

রিসিভার নিয়ে পুলিস চীফ বললেন, 'হ্যালো, সাঈদ? কেমন আছ তুমি?'

অপরপ্রান্তে কথা বলছেন সাঈদ মুর্তজায়েভ, মনোযোগ দিয়ে শুনছেন ড. সিডাক। মাঝে মধ্যে হুঁ-হ্যাঁ করছেন। একবার বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাই হবে।' তারপর বললেন, 'এখুনি? ঠিক আছে, আসছি...' রিসিভার রেখে দিলেন তিনি, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ।

'কি কথা হলো?'

'হাজার হোক এক সময় তো আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলাম, তাই না? পাণ্ডুলিপি আর ডকুমেন্টটা আমার হাতেই তুলে দিতে চাইছে সে। আল্লার কসম খেয়ে বলল, ডকুমেন্ট সে পড়েনি। চলুন, বেরিয়ে পড়ি।'

'আমাকেও তাহলে যেতে হবে?' রানা ইতস্তত করছে।

'সাঈদ বলছে, ওগুলো সে আপনার সামনে হস্তান্তর করতে চায়। বলছে, বিদেশী একজন লোক সাক্ষী থাকলে ভাল হয়।'

কথা আর না বাড়িয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা। 'বেশ, চলুন তাহলে।'

পুলিস চীফ আসছেন, এ-খবর টেলিফোনে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে বাড়ির গার্ডরুমকে। গেটে জীপ থামতে ছুটে এসে স্যালুট করল সশস্ত্র গার্ডরা। ড্রাইভিং সীট থেকে ড. সিডাক জানতে চাইলেন, 'ঠিকমত পাহারা দিচ্ছ তো? টহলে কোন অবহেলা হচ্ছে না?'

'জ্বী, স্যার, ঠিকমত পাহারা দিচ্ছি। জ্বী-না, স্যার, কোন রকম অবহেলা করা হচ্ছে না। একটা পিঁপড়ে গললেও আমরা জানতে পারব।'

'বাড়িতে এই মুহূর্তে কে কে আছেন?'

'সবাই আছেন, স্যার–মি. মুর্তজায়েভ, তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলেমেয়ে।'

জীপ ছেড়ে দিলেন ড. সিডাক। গার্ডরা আবার তাঁকে স্যালুট করল। পুলিস চীফের পাশের সীটে চুপচাপ বসে আছে রানা।

গার্ডরা গেট থেকেই দেখতে পেল, জীপটা উঁচু বারান্দার সামনে পৌঁছে থামল। জীপ থেকে নেমে ধাপ বেয়ে ওপরে উঠছেন তাদের চীফ, ঘরের ভেতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন সাঈদ মুর্তজায়েভ। করমর্দন নয়, ড. সিডাককে আলিঙ্গন করলেন তিনি। দৃশ্যটা দেখে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস শুরু করল গার্ডরা।

মেহমানদের আজ বারান্দায় না বসিয়ে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন গৃহবন্দী কবি ও রাজনীতিক। এটাও গার্ডদের মধ্যে একটা আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল।

বিশ মিনিট পর জীপটাকে ফিরে আসতে দেখল ওরা। আগের মতই ড্রাইভিং সীটে বসে আছেন ড. সিডাক, পাশে মাসুদ রানা। তবে আরোহীর সংখ্যা বেড়েছে। জীপের পিছনের সীটগুলোয় বসেছেন মিসেস ফাতেমা মুর্তজা আর তাঁর দুই ছেলেমেয়ে–মেয়েটার বয়স সাত, ছেলেটার পাঁচ।

গেটে আবার জীপ থামালেন ড. সিডাক। গার্ডরা স্যালুট করল। হাত তুলে সাড়া দিলেন পুলিস চীফ, তবে ওদের দিকে তাঁর মনোযোগ নেই। জীপে রেডিও ফোন আছে, মাউথপীসটা মুখের সামনে তুলে হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে দ্রুত কথা

বলছেন তিনি। গার্ডরা জীপের পাশে দাঁড়িয়ে শুনছে।

'মি. মুর্তজায়েভ জানালেন, পাণ্ডুলিপি ও ডকুমেন্ট মন্ত্রিনিগ্রোয় আছে। কোথায় আছে তা শুধু তাঁর স্ত্রী জানেন। কাজেই মিসেস ফাতেমাকে নিয়ে এয়ারপোর্টে যাচ্ছি আমি, তোমরা পরবর্তী ফ্লাইটের পাঁচটা সীট বুক করো। হ্যাঁ, মিসেস ফাতেমার সঙ্গে তাঁর দুই ছেলেমেয়েও আছে। পরবর্তী ফ্লাইট দেরি হলে একটা প্লেন চার্টার করো, ঠিক আছে? দিস ইজ অ্যান ইমার্জেন্সী।'

হেডকোয়ার্টার থেকে কয়েকটা প্রশ্ন করা হলো।

ড. সিডাক সেগুলোর জবাবে বললেন, 'পডগোরিকা এয়ারপোর্টে আমাদের অন্তত দু'জন লোককে থাকতে বলবে, একটা জীপ নিয়ে। সাবধান, আমার যাবার খবর যেন লিক না হয়। হ্যাঁ, সম্ভব হলে আজ রাতেই আমি বেলগ্রেডে ফিরে আসব। আর একজন? উনি ব্রিটিশ পাবলিশার, মাসুদ রানা। মি. মুর্তজায়েভের পাণ্ডুলিপিতে আপত্তিকর কিছু না থাকলে ওগুলো তিনি লন্ডন থেকে প্রকাশ করতে চান। সেজন্যেই আমার সঙ্গে থাকতে চাইছেন তিনি...না, পডগোরিকায় যারা জীপ নিয়ে থাকবে তাদেরকে বলার দরকার নেই যে আমি যাচ্ছি...না, বেলগ্রেড এয়ারপোর্টেও কারও থাকার দরকার নেই। রাখলাম।'

এতক্ষণে গার্ডদের দিকে তাকালেন ড. সিডাক। 'পাহারা আরও জোরদার করো তোমরা। মি. সাঈদ পালাবার চেষ্টা করলে আমি একটুও অবাক হব না।'

'জ্বী, স্যার।'

জীপ ছেড়ে দিলেন ড. সিডাক।

এয়ারপোর্টে ভিআইপি ট্রীটমেন্ট পেল ওরা। সরকারী এভিয়েশন ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান স্বয়ং ড. সিডাককে বিশেষ অভ্যর্থনা জানালেন। দক্ষতার সঙ্গে সুষ্ঠু আয়োজন করা হয়েছে, কোন রকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই চার্টার করা প্লেনে তুলে দেয়া হলো ওদেরকে। আধ ঘণ্টার মধ্যে আকাশে ডানা মেলল রাশিয়ার তৈরি প্যাসেঞ্জার প্লেন টুপোলভ।

দুপুর দুটোয় রওনা হয়ে বিকেল পাঁচটায় পডগোরিকা এয়ারপোর্টে নামল প্লেন। টারমাক ধরে ছুটে এল পুলিসের একটা জীপ, তাতে সাদা পোশাক পরা দু'জন পুলিস অফিসার বসে আছে; জীপে পডগোরিকা এয়ারপোর্টের এয়ার কন্ট্রোলারও উপস্থিত। ওরা প্লেন থেকে নামতে তিনিই অভ্যর্থনা জানালেন, সবিনয়ে জীপে উঠতে অনুরোধ করলেন। পুলিস অফিসাররা চীফকে চিনতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেল। চোখ রাঙিয়ে ড. সিডাক তাদেরকে সাবধান করে দিলেন, 'এটা আমার সারপ্রাইজ ভিজিট, গোপন একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছি, খবরটা যেন জানাজানি না হয়। পডগোরিকার শপিং মল...কি যেন নাম?'

'মেসট্রোভিচ।'

'হ্যাঁ, ওখানে আমাদেরকে নামিয়ে দেবে তোমরা।'

এয়ার কন্ট্রোলার বললেন, 'অতিরিক্ত একটা গেট খুলে রাখা হয়েছে, মি. সিডাক, স্যার। গার্ডদের বলা আছে, আপনাদের জীপ তারা থামাবে না।'

'ধন্যবাদ।'

পুলিস অফিসারদের একজন ড্রাইভিং সীটে বসেছে। ড. সিডাক বলতে যা দেরি, জীপ ছেড়ে দিল সে।

শপিং মলের সামনে পৌঁছাতে পনেরো মিনিট লাগল। জীপ থেকে নেমে একটা চীনা রেস্তোরাঁর দিকে এগোলেন ড. সিডাক, বাকি সবাই তাঁর পিছু নিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে রানা। রাস্তার ওপারেই পার্কিং এরিয়া। সেদিকে তাকাতেই হলদেটে মাখন রঙা পাজেরো জীপটা দেখতে পেল। নিজের অজান্তেই পকেটে হাত বুলিয়ে একটা চাবির অস্তিত্ব অনুভব করল ও। পাজেরোর জানালা-দরজায় টিনটেড কাঁচ, ভেতরটা দেখার কোন উপায় নেই।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পুলিস অফিসারদের দিকে ফিরলেন ড. সিডাক। 'সোজা নিজেদের কাজে ফিরে যাও। আমি পডগোরিকায়, এ গল্প কারও সঙ্গেই করবে না, এমন কি স্ত্রীর সঙ্গেও নয়। মনে থাকবে?'

স্যালুট ও উত্তর একযোগে দিল অফিসাররা, 'জ্বী, স্যার।' পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে করতে জীপ নিয়ে চলে গেল তারা।

রেস্তোরাঁয় বসে খাবারের অর্ডার দেয়া হলো, সব প্যাকেট করে দিতে হবে। বিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো এখানে। এই সুযোগে ড. সিডাক কোটরে একটা ফোন করলেন। প্রথমে নোভার কুশল জানতে চাইলেন তিনি, তারপর জরুরী কয়েকটা নির্দেশ দিলেন। অপরপ্রান্তে বিমূঢ় নোভাকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। খাবারের প্যাকেট পাবার পর বিল মিটিয়ে আবার তিনি মিছিল নিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলেন, জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পেরুচ্ছেন। পৌনে ছ'টা বাজে, সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। বিপদসঙ্কুল পাহাড়ী রাস্তা ধরে কোটরে পৌঁছতে ওদের রাত হয়ে যাবে। দিনের বেলা পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পেরুতে সময় লাগে দু'ঘণ্টা, অন্ধকারে আরও বেশি লাগবে।

হাতে টর্চ, ইঁট বিছানো রাস্তা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে নোভা। আশপাশে কাউকে দেখা না গেলেও, সে একা নয়। বনরক্ষী বা অন্য কেউ দেখে ফেলবে, এই ভয়ে টর্চটা একবারও জ্বালছে না সে। অন্ধকারে মশার কামড় খাচ্ছে, তবু এক চুল নড়ছে না। উদ্বেগ আর উত্তেজনা অসুস্থ করে তুলছে তাকে। রিস্টওয়াচের আলোর বোতাম টিপে ডায়ালের দিকে বারবার তাকাচ্ছে সে। আটটা বেজে বারো মিনিট।

পাকা রাস্তার বাঁকটা নোভার কাছ থেকে দুশো গজ পিছনে। বাঁক থেকে তিনশো গজ দূরে বনরক্ষীদের ছাউনি। সব মিলিয়ে পাঁচশো গজ দূরত্ব, তারপরও তাদের চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে আসছে। অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠল নোভা। মনে হাজারটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে, একটারও উত্তর জানা নেই তার। সে শুধু জানে সিডাক আঙ্কেল আসছেন। কিন্তু কেন আসছেন তা জানে না। তাঁর সঙ্গে রানাও কি থাকবে? ওকে কি গ্রেফতার করা হয়েছে? আজ সকালেই বেলগ্রেডে ফিরে গেছে রানা, আজই সন্ধ্যায় সিডাক আঙ্কেল আসছেন–দুটো ঘটনার সঙ্গে নিশ্চয়ই একটা যোগাযোগ আছে।

বনরক্ষীরা হঠাৎ এমন যুদ্ধংদেহি হয়ে উঠল কেন?

পডগোরিকার দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। আড়ষ্ট হয়ে গেল নোভা। গাড়ির শুধু হেডলাইট দেখা যাচ্ছে, অন্য কিছু নয়। বাঁক নিয়ে ইঁট বিছানো রাস্তায় চলে এল গাড়িটা। তারপর রাস্তা ছেড়ে ঢুকে পড়ল জঙ্গলের ভেতর। ঝোপ-ঝাড় ভেঙে ইউ টার্ন নিল, দাঁড়িয়ে পড়ল পাকা রাস্তার দিকে মুখ করে। স্টার্ট বন্ধ করল ড্রাইভার। উজ্জ্বল হেডলাইট নিভে গেল।

অন্ধকার আবার গাঢ় হয়ে উঠল। ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। গাড়ির ভেতর থেকে ওরা কেউ নামেনি।

ঝাড়া এক মিনিট অপেক্ষা করার পর হাতের টর্চটা গাড়ির দিকে তাক করে বোতামটায় পরপর দু'বার চাপ দিল নোভা। উত্তেজনায় দম আটকে রেখেছে।

হেডলাইট জ্বলল, নিভল, আবার জ্বলল, আবার নিভল। খানিকটা স্বস্তিবোধ করল নোভা। টর্চের বোতামে আরও দু'বার চাপ দিল সে। এবার গাড়ির হেডলাইট জ্বলার পর আর নিভল না। গাড়ি থেকে একজনকে নামতে দেখল নোভা। সে-ও এবার ঝোপ থেকে বেরিয়ে এগোল সেদিকে।

গাড়িটা ঝকঝকে একটা মাখন রঙা পাজেরো। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ড. সিডাক। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে নোভা। তারপর সিডাক আঙ্কেলও কয়েক পা এগোলেন। নোভাকে হতচকিত করে দিয়ে আলিঙ্গন করলেন তিনি।

'সিডাক আঙ্কেল, আপনি...'

পাজেরো থেকে নেমে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে রানা। 'ভাল করে দেখো, নোভা—উনি কি সত্যি তোমার সিডাক আঙ্কেল? নাকি তাঁর ছদ্মবেশে অন্য কেউ?'

নিজেকে আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ভাল করে দেখল নোভা। 'তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ, রানা? সিডাক আঙ্কেল, কি ঘটছে আমাকে বলবেন, প্লীজ?'

ড. সিডাক হাসছেন। হাসছে রানাও। ও-ই নোভার প্রশ্নের জবাব দিল। 'আশ্চর্য, নোভা, মি. সাঈদ মুর্তজায়েভকে তুমি চিনতে পারছ না?'

'সাঈদ মুর্তজায়েভ...সাঈদ আঙ্কেল...' থতমত খেয়ে গেছে নোভা।

'কেন, মি. মুর্তজায়েভ আর ড. সিডাক, দু'জনকেই তো খুব কাছ থেকে বছরের পর বছর দেখেছ তুমি, একবারও মনে হয়নি দু'জনের চেহারায় কেমন অদ্ভুত মিল?'

'ওহ্ গড!' যেন হঠাৎ করেই নোভার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। 'হ্যাঁ, ঠিক, সত্যিই তো...আপনি, আপনি সাঈদ আঙ্কেল!' এবার সে-ই ঝাঁপিয়ে পড়ল, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সাঈদ মুর্তজায়েভকে।

নোভার মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন মুর্তজায়েভ। নিঃশব্দে কাঁদছেন তিনি।

হঠাৎ ছিটকে দূরে সরে এল নোভা। 'আঙ্কেল, রানা—এদিকের পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। হঠাৎ কিছু একটা হয়েছে, বনরক্ষী আর পুলিস গিজগিজ করছে ছাউনিতে। বাডভায় যাবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে ওরা। শহরের

লোকদের বলে দেয়া হয়েছে, কেউ যেন ভুলেও পাঁচিলের বাইরে না বেরোয়। অন্ধকার গাঢ় হবার পর পাঁচিল টপকে বেরিয়ে এসেছি আমি···

'সর্বনাশ!' চশমা খুলে রুমাল দিয়ে কাঁচ মুছলেন মুর্তজায়েভ। 'এত তাড়াতাড়ি ওরা খবর পেল কিভাবে, রানা?'

'আমি জানি কি ঘটেছে,' বলল রানা। 'সন্ধের পরও আপনার বাড়িতে আলো জ্বলতে না দেখে গার্ডদের সন্দেহ হয়, ভেতরে ঢুকে হাত-পা বাঁধা আর মুখে টেপ লাগানো পুলিস চীফকে দেখতে পেয়েছে ওরা। মুক্ত হবার পর সঙ্গে সঙ্গে রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করেছেন ড. সিডাক। ছাউনিতে ফোন আছে, কাজেই খবরটা পেতে এদের দেরি হয়নি।'

'আমরা তাহলে কোটরে এখন যাব কিভাবে?' মুর্তজা জানতে চাইলেন।

নোভা ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, 'কোন মতেই যাওয়া সম্ভব নয়। কোটরে যাবার এই একটাই রাস্তা, সেটা বন্ধ করে দিয়েছে ওরা।'

'কিভাবে বন্ধ করেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রাস্তার ওপর পাশাপাশি বিশ-বাইশটা খালি তেলের ড্রাম খাড়া করে রেখেছে,' বলল নোভা। 'ওগুলোর পিছনে স্টেনগান আর পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বনরক্ষী ও পুলিস।'

'হুম।' কি যেন চিন্তা করল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'বুঝলাম একটাই রাস্তা, কিন্তু আমরা যদি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা তৈরি করে নিই? এভাবে খানিক দূর যাবার পর পাকা রাস্তায় উঠলাম?'

'না, তাও সম্ভব নয়,' বলল নোভা। 'ফোন পাবার পর আমি দুর্গে উঠেছিলাম। ওরা বোধহয় সন্দেহ করছে জঙ্গল দিয়ে কেউ কোটরে যাবার চেষ্টা করতে পারে, কারণ দেখলাম জঙ্গলের ভেতর টর্চ নিয়ে টহল দিচ্ছে বনরক্ষীরা।'

রানা বলল, 'মি. মুর্তজা, বনরক্ষীরা জানে নকল ড. সিডাক পডগোরিকা পুলিসের একটা জীপ নিয়ে আসবেন। কিন্তু আমরা যাব পাজেরো নিয়ে। পাজেরোয় ডিপ্লোম্যাটিক প্লেট আছে। প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে দেয়া শিকার করার অনুমতি-পত্রটাও আছে। ধরুন, ড্রাইভিং সীটে আপনি বসে থাকবেন। ওরা দেখবে গাড়ি চালাচ্ছেন চকচকে টাক মাথা, দাড়ি-গোঁফ কামানো, চশমাবিহীন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। এমন কি হতে পারে না, এ-সব দেখে ব্যারিকেড সরিয়ে নেবে ওরা?'

মুর্তজায়েভ খানিক ইতস্তত করে বললেন, 'আমার মনে হয় ফিফটি-ফিফটি চান্স।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা। 'নোভা, তোমাকে ফোনে ব্লেড, কাঁচি আর রেজার আনতে বলা হয়েছিল, এনেছ?'

'হ্যাঁ, এনেছি, কিন্তু···'

'সুজায়েভ আসেননি? তোমার হাতে ব্রিফকেসটাও তো দেখছি না।'

'সুজা আঙ্কেল আড়াল থেকে কাভার দিচ্ছেন আমাকে। ব্রিফকেসটা তাঁর কাছে আছে,' বলে ওদের দিকে পিছন ফিরল নোভা, একটা ঝোপ লক্ষ্য করে টর্চের বোতামে পরপর দু'বার চাপ দিল।

একটু পরই দেখা গেল ভারী ব্রিফকেসটা নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে সুজায়েভ। মুর্তজায়েভের আপন ভগ্নিপতি, সে-ই মাথাটা মোড়াল তাঁর। দাড়ি-গোঁফ অবশ্য নিজেই কামালেন তিনি। ইতিমধ্যে চকলেট রঙের ব্রিফকেস খুলে অস্ত্র ও গোলাবারুদ কোটের বিভিন্ন পকেটে ভরে ফেলেছে রানা। লুগারটা নোভার কাছে ছিল, সেটা চেয়ে নিল। ওয়ালথারটা ফিরিয়ে দিল তাকে। সুজায়েভের কাছ থেকে মেশিন পিস্তলটাও চেয়ে নিল রানা। সব শেষে পকেট থেকে মাইক্রোফিল্মের একটা অতিরিক্ত কপি বের করল, নোভার হাত ধরে সরে এল একটা ঝোপের আড়ালে। 'নোভা, এখনও সময় আছে, আমি অনুরোধ করছি, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।'

'না, তা হয় না, রানা!' বিড়বিড় করল নোভা। 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, এখানে আমার অনেক কাজ।'

'মাইক্রোফিল্ম পেলেও ড. সিডাক খুব একটা সন্তুষ্ট হবেন বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'কারণ দু'দিন পর হলেও তিনি জানতে পারবেন, আরও কপি ছিল, জাতিসংঘের হাতে তা পৌঁছেও গেছে। তাঁকে বোকা বানাবার জন্যে তোমাকেও তিনি দায়ী ভাবতে পারেন। আমি বলতে চাইছি, যুগোস্লাভিয়া তোমার জন্যে আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তারচেয়ে মন্ট্রিনিগ্রো স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত মুক্তবিশ্বের কোন দেশে থাকলে ভাল হয় না?'

'দেশের লোক স্বাধীনতার জন্যে লড়বে, আর আমি পালিয়ে থাকব? তারপর স্বাধীনতার সুফল ভোগ করার জন্যে ফিরে আসব?' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল নোভা।

'এ-ব্যাপারে আমি তোমাকে জোর করতে পারি না,' বলল রানা। 'তোমার জন্যে প্রার্থনা করব আমরা। এবার তাহলে বিদায় দাও, নোভা।' মাইক্রোফিল্মটা তার হাতে গুঁজে দিল ও।

'আমি কিন্তু সত্যি তোমাকে ডাকব, রানা।' বিদায়ের মুহূর্তে নিজেকে সামলে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল, কান্নাটাকে কোন রকমে গলার কাছে ঠেকিয়ে রেখেছে নোভা। 'সত্যি তুমি আসবে তো, রানা?'

'তুমি ডাকলে ছুটে চলে আসব আমি,' বলল রানা। 'যদি ততদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি।'

'আর আমি যদি মারা যাই?' রানার হাতটা ধরে নিজের গালে চেপে ধরল নোভা। 'তবু তুমি এসো, রানা। হয় বেলগ্রেড, না হয় কোটর থেকে তোমার মূর্তিটা নিয়ে যেয়ো। ফ্ল্যাটে ফিরে এখুনি আমি আমার যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ শুরু করব। তুমি নিরাপদে চলে যেতে পেরেছ, এই খবর না পাওয়া পর্যন্ত কাজ ছেড়ে আমি উঠব না।'

'জানালাটা খোলা রেখো,' বলল রানা। 'যদি দেখো দক্ষিণের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, ধরে নেবে বড় বাধাটা পার হতে পেরেছি আমরা।'

'মানে?'

'এখন সব কিছু ব্যাখ্যা করার সময় নেই, নোভা। আসি, কেমন?'

পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হলো নোভা, রানার গালে ঠোঁট আর নাক ঘষল,

যেন ঘ্রাণ নিচ্ছে। 'সাবধানে থেকো, রানা।'

'তুমিও,' বলে গাড়ির কাছে ফিরে এল রানা। 'সুজায়েভ, আপনাকে যা করতে বলেছিলাম...'

সুজায়েভ নয়, রানাকে থামিয়ে দিলেন মুর্তজায়েভ। 'কোথায় কি আছে সব আমাকে জানিয়েছে সুজা। এখানেই আমার জন্ম, সবই তো চিনি, কাজেই খুঁজে নিতে কোন অসুবিধে হবে না।'

'তাহলে আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়,' বলল রানা। 'সুজায়েভ, আপনার ওপর দায়িত্ব থাকল, নোভাকে নিরাপদে ওর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবেন। পকেট থেকে মাস্টার কার্ড বের করে ধরিয়ে দিল তার হাতে।

'অবশ্যই, মি. রানা।'

মুর্তজায়েভ বললেন, 'তোমরা আগে চলে যাও, তারপর আমরা রওনা হব।'

রানার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল নোভা, নড়ছে না। পরিবেশটা আড়ষ্ট, ভারী হয়ে উঠতে এগিয়ে এল সুজায়েভ, নোভার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। তার কান্নার শব্দ শুনে কাঁপা একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা।

বাঁক ঘুরতেই দূরে দেখা গেল রোড ব্লক। একজোড়া ফ্লাডলাইট দিনের মত আলোকিত করে রেখেছে গোটা এলাকা। হেডলাইট দেখেই বনরক্ষী আর পুলিস দ্রুত বালির বস্তার আড়ালে সরে গেল, স্টেনগানের মাজল অনুসরণ করছে পাজেরোকে। তেলের ড্রামগুলো খালি হলেও, খাড়া করে দু'সারিতে বসানো হয়েছে। রোড ব্লক থেকে বিশ-পঁচিশ গজ সামনে, রাস্তার বাম পাশে, এক সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাঁচটা ট্রাক। তারমধ্যে তিনটে হাফ-ট্রাক। বাকি দুটো পাঁচ টনী, ক্যাবের পিছনে লোহার ফ্রেম আছে, তেরপল দিয়ে ঢাকা।

সবাই বালির বস্তার আড়ালে কাভার নেয়নি, ড্রামগুলোর এদিকে পাঁচজন বনরক্ষী আর তিনজন পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অস্ত্রও পাজেরোর দিকে তাক করা।

রোড ব্লক থেকে বিশ গজ দূরে গাড়ি থামালেন মুর্তজা। হাতে পিস্তল নিয়ে বনরক্ষীদের হেড এগিয়ে এল। নিজের দিকের জানালার কাঁচটা নামালেন মুর্তজা, তবে পুরোপুরি নয়। 'রোড ব্লক কেন?' ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন তিনি। চোখের কোণ দিয়ে দেখলেন, একজন বনরক্ষী ও একজন পুলিস গাড়িটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করেছে। উঁকি দিয়ে গাড়ির ভেতরটা দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করছে তারা।

পাজেরোর ব্যাক সীটে বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে, মিসেস ফাতেমা তাদেরকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছেন। রানা বসেছে পাজেরোর বাঁ পাশের অতিরিক্ত একটা সীটে। ওর কোলের ওপর একজোড়া গ্রেনেড পড়ে আছে, হাতে মেশিন পিস্তল।

'ইমার্জেন্সী, স্যার,' বনরক্ষীদের হেড জবাব দিল। 'গোপন রাষ্ট্রীয় দলিল চুরি করে একজন রাষ্ট্রদ্রোহী পালিয়েছে। আমাদের ওপর নির্দেশ আছে, বাডভায় যেন কাউকে যেতে দেয়া না হয়।'

'কিন্তু আমরা তো গত দু'দিন ধরে পডগোরিকা থেকে বাডভায় আসা-যাওয়া

করছি,' মুর্তজা বললেন। 'কই, একবারও তো বাধা দেয়া হয়নি। আমার কাছে প্রেসিডেন্ট ভবনের লিখিত অনুমতি আছে, ইচ্ছে করলে আপনি দেখতে পারেন।'

'তা ঠিক, গাড়িটাকে আমরা দু'তিনবার আসা-যাওয়া করতে দেখেছি,' ইতস্তত করছে হেড। 'এ-ও জানি যে আপনাদের কাছে অনুমতি-পত্র আছে। কিন্তু আগে যা হবার হয়েছে, রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করার পর বাডভায় এখন আমরা কোন গাড়িকে যেতে দিতে পারি না।'

'সেক্ষেত্রে মোবাইল ফোনে প্রেসিডেন্ট ভবনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে আমাকে,' বললেন মুর্তজা। কোলের ওপর থেকে মোবাইলটা হাতে নিলেন। 'বাডভায় আমার বন্ধু অপেক্ষা করছেন, আমি না পৌঁছালে তিনি খুব দুশ্চিন্তা করবেন...'

'আপনার বন্ধু?'

'জাতীয় যুবদলের নেতা—কার্চিক জোডা।'

জোডার নাম শুনে স্পষ্টই বিচলিত হয়ে উঠল হেড। 'এক মিনিট, স্যার,' বলে দু'পা পিছিয়ে গেল সে, সঙ্গীদের সঙ্গে নিচু স্বরে আলাপ করছে। সাতজন আবার এক হয়েছে তারা।

প্রায় পাঁচ মিনিট আলাপ করার পর ফিরে এল হেড। 'ঠিক আছে, স্যার, আপনি যেতে পারেন।' ইঙ্গিতে নিজের লোকদের রোড ব্লক সরিয়ে নিতে বলল সে। 'নেতাকে আমাদের শুভেচ্ছা জানবেন, স্যার। বলবেন তাঁর কোন খবর না পাওয়ায় প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি যেন অবশ্যই টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। আরেকটা কথা, স্যার। বাডভায় তিনি কোথায় আছেন জানেন নিশ্চয়ই?'

'কেন, যেখানে থাকার কথা—সাঈদ মুর্তজায়েভের খামার বাড়িতে।'

এই সময় হেডকে একপাশে ডেকে নিল একজন পুলিস ইন্সপেক্টর। আবার ফিসফাস শুরু হলো। এবার মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে এল হেড, সঙ্গে ইন্সপেক্টর। 'গাড়িতে আপনি ছাড়া আর কে আছেন, স্যার?' জানতে চাইল ইন্সপেক্টর।

'আমার কয়েকজন বন্ধু আছেন, ঘুমাচ্ছেন তাঁরা,' মুর্তজা বললেন।

'আমরা তাঁদের দেখতে চাই, স্যার,' ইন্সপেক্টর হাতের অস্ত্র নেড়ে বলল, 'দরজা খুলুন, প্লীজ। কিছু মনে করবেন না, রুটিন ওঅর্ক—গাড়িটা সার্চও করতে হবে।'

'কি বলছেন! ডিপ্লোম্যাটিক প্লেট লাগানো গাড়ি আপনারা সার্চ করবেন কিভাবে!'

ইন্সপেক্টর হাত তুলে বনরক্ষীদের নিষেধ করল, ড্রাম সরানোর কাজ বন্ধ করে দিল তারা। ইতোমধ্যে দুই সারি থেকে মাত্র চারটে ড্রাম সরানো হয়েছে। 'দুঃখিত, স্যার। কিন্তু আমাদের উপায় নেই। ইমার্জেন্সী, কাজেই...' দরজার হাতল ধরে টানাটানি শুরু করল সে।

'ঠিক আছে, জানালা খুলছি,' বললেন মুর্তজা।

সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা মুচড়ে প্যাসেঞ্জার সাইডের একটা জানালা ইঞ্চি পাঁচেক

নামাল রানা, বাইরে একটা হাত বের করে দিয়ে বলল, 'ধরো!' হেড সহ ছয়জন লোক এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে, পিন খোলা গ্রেনেডটা সেদিকে ছুঁড়ে দিল ও। রিফ্লেক্স অ্যাকশনই বলতে হবে, বনরক্ষীদের একজন গ্রেনেডটা লুফে নিল। ইতিমধ্যে নিজের দিকের জানালা বন্ধ করে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন মুর্তজা।

তাঁর পিছনের আংশিক খোলা জানালা দিয়ে রানার অপর হাতটা বেরিয়ে এল, মেশিন পিস্তল সহ। এক পশলা গুলি করল ও, প্রথমে ইন্সপেক্টরের উরু, তারপর বাকি চারজনের হাঁটু লক্ষ্য করে।

গ্রেনেড এখনও ফাটেনি, তবে মেশিন পিস্তল স্তব্ধ হবার আগেই বালির বস্তার আড়াল থেকে ছুটে এল ঝাঁক-ঝাঁক বুলেট।

বিশ গজ পেরিয়ে এল পাজেরো, দু'পাশে ছিটকে পড়ল খালি ড্রামগুলো। গাড়ির গায়ে মুষল ধারে বৃষ্টির মত বুলেট লাগছে। কোন রকমে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখছেন মুর্তজা, হিংস্র চিতার মত ছুটছে ওটা।

মেশিন পিস্তল রেখে দিয়ে আরেকটা গ্রেনেড তুলে নিয়েছে রানা। এক সারিতে পাঁচটা ট্রাক, দ্বিতীয় গ্রেনেডটা মাঝখানের হাফ-ট্রাকে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো প্রথমটা। কয়েক সেকেন্ড পর দ্বিতীয়টা।

বাঁক ঘোরার সময় বিকট আওয়াজ করল টায়ার। সদ্য ঘুম ভাঙা বাচ্চা দুটো চিৎকার করে কাঁদছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে পিছন দিকে তাকাল রানা। হতাশায় ছেয়ে গেল মনটা। মাত্র দুটো ট্রাকে আগুন জ্বলছে। বাকি তিনটে ট্রাক এরইমধ্যে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিচ্ছে বনরক্ষীরা। ওগুলো নিয়েই ওদেরকে ধাওয়া করা হবে।

দ্বিতীয় বাঁকটা ঘোরার সময় প্রকাণ্ড বোল্ডারটাকে পাশ কাটাল ওরা। 'গাড়ি থামান,' বলল রানা। পুরোপুরি থামার আগেই দরজা খুলে নেমে পড়ল ও, হাতে একজোড়া ফ্লেয়ার। রাস্তা এদিকে সরু, দু'পাশে ঘন ঝোপ আর পাতাবিহীন শুকনো গাছপালা। রাস্তার দু'পাশের ঝোপ আর গাছ লক্ষ্য করে দুটো ফ্লেয়ার ছুঁড়ল রানা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল আগুন।

তিন কিলোমিটার পর আবার গাড়ি থামালেন মুর্তজা। রাস্তার দু'পাশে আরও দুটো আগুন জ্বালল রানা। গাড়িতে ফিরে আসতে মিসেস ফাতেমা জিজ্ঞেস করলেন, 'এ আপনি কি করছেন, মি. রানা? গোটা জঙ্গলটাই তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

'আমি খোঁজ নিয়েছি,' বলল রানা। 'গোটা এলাকায় মাত্র পাঁচ-ছ'টা খামারবাড়ি। শুধু পাহারাদারই আছে, মালিকরা কেউ থাকে না। এমন কি গরু-ছাগলও না থাকারই মত।'

'তবু, এত বড় একটা জঙ্গল[illegible]আগুন তো সব না পুড়িয়ে নিভবে না।'

'এই জঙ্গলের প্রতিটি গাছ [illegible]ভিচের,' বলল রানা। 'ধরে নিন তার কুশপুত্তলিকায় আগুন দিয়েছি। অল্প [illegible] ক'জন লোকের ক্ষতি হবে, মন্ত্রিনিগ্রোর গর্বকে বাঁচাবার স্বার্থে এই সামান্য ক্ষতি তাদের মেনে নেয়া উচিত।'

'পরিবেশটা দূষিত হবে,' মুর্তজা বিড়বিড় করে বললেন। 'ওয়াইল্ডলাইফও ধ্বংস হয়ে যাবে। নো অফেন্স, রানা। আমি শুধু পরিস্থিতিটা বর্ণনা করছি। আমি

উপায় নেই। পালাতে হলে এছাড়া সত্যিই আর কোন উপায় ছিল না। তবে কি জানো, খুশি হতাম যদি গাছগুলোর বদলে মিলোসেভিচকে অগ্নিস্নান করাতে পারতে।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তার জন্যেও অগ্নিস্নান অপেক্ষা করছে,' বলল রানা। 'সব স্বৈরাচারকেই কোন না কোন অর্থে এক সময় পুড়তে হয়।'

দূরে একটা ওয়াচটাওয়ার দেখতে পেয়ে মুর্তজাকে আরেকবার গাড়ি থামাতে বলল রানা। আর মাত্র একজোড়া ফ্লেয়ার অবশিষ্ট আছে। একটা ছুঁড়ল ওয়াচটাওয়ার লক্ষ্য করে, শেষটা দিয়ে জ্বালাল রাস্তার ধারের শুকনো একটা ঝোপ। আধ ঘণ্টা পর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটা চূড়ায় উঠল পাজেরো। আরেকবার নিচে নামল রানা। ফেলে আসা এলাকার ওপর চোখ বুলিয়ে সন্তুষ্ট হলো ও। জোরাল বাতাস থাকায় প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুতবেগে ছড়াতে শুরু করেছে কমলা রঙের শিখাগুলো। কার সাধ্য এই দাবাগ্নি থামায়। ফেলে আসা পথ পাঁচ মাইল পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কোন হেডলাইট চোখে পড়ল না।

বাডভাকে পিছনে ফেলে সাগরের দিকে ছুটছে পাজেরো। রাত এগারোটা বাজে, কিছুক্ষণ আগে ট্র্যাঙ্কুইলাইজার খাইয়ে বাচ্চা দুটোকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন মিসেস ফাতেমা। বাডভায়, নিজেদের খামারবাড়ির কাছে, গাড়িটাকে জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে ফেলতে হয়েছিল মুর্তজাকে। হেডলাইট নিভিয়ে বিশ মিনিট চুপচাপ বসে ছিল ওরা, মাথার ওপর চক্কর দেয়া শেষ করে হেলিকপ্টার চলে যাবার পর আবার রওনা হয়েছে সাগরের দিকে।

সুজায়েভের দেয়া এনভেলাপ খুলে হাতে আঁকা ম্যাপটা বের করল রানা। গাড়ির ভেতর আলো জ্বলছে, ম্যাপটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ও। 'এখানে দেখা যাচ্ছে একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে ঢাল বেয়ে সৈকতে নামতে হবে আমাদের, কেননা ওই সৈকতে পৌঁছানোর অন্য কোন পথ নেই। সুজায়েভ ওখানেই মাছ ধরার ট্রলারটা লুকিয়ে রেখেছেন।'

'বাচ্চা দুটোকে নিয়েই চিন্তা,' মুর্তজা বললেন। 'পাহাড়ে ওঠা, তার পর নামা…'

'ওটা কি ডালকান সৈকত?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ফাতেমা। 'আমি যতদূর জানি একমাত্র ডালকানেই সরাসরি পাহাড় বেয়ে নামতে হয়।'

'হ্যাঁ, ডালকানই।'

'তাহলে তো বিপদ। পাহাড়ের ঢালে অসংখ্য বোল্ডার ছড়িয়ে আছে। ওঠা বা নামার কোন পথই নেই। সৈকতটা আসলে দেখতে পাওয়াও সম্ভব নয়। একেবারে ছোট্ট এতটুকুন।'

'দুর্গম বলেই নিরাপদ,' বললেন মুর্তজা। 'সুজায়েভ একটা গুহার ভেতর লুকিয়ে রেখেছে ট্রলারটা।'

'কিন্তু কোন গুহায় চিনবে কিভাবে? ওখানে তো শুনেছি অনেক গুহা।'

'পৌঁছতে পারলে ঠিকই খুঁজে নেয়া যাবে,' স্ত্রীকে আশ্বস্ত করলেন মুর্তজা।

রানা বলল, 'বাচ্চাদের নিয়েও কোন চিন্তা করবেন না। ওদেরকে আমরা

কাঁধে তুলে নেব।'

'হেলিকপ্টার কিন্তু সাগরেও চোখ রাখবে,' ফাতেমা বললেন। 'শুনেছি গানবোটগুলো সারা রাত টহল দিয়ে বেড়ায় ওখানে।'

'ঝুঁকি তো আছেই, ফাতেমা। আল্লাহ যদি সহায় হন, কেউ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এত দূর যে আসতে পেরেছি, বিশ্বাস করা যায়? সত্যি...মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি, জেগে নেই।'

'বাডভা থেকে আলবেনিয়া বেশি দূরে নয়, মাত্র চল্লিশ মাইল।'

'কিন্তু না, আমরা আলবেনিয়ার দিকে যাব না,' বলল রানা। 'কারণ ওরা আশা করবে ওদিকেই যাব আমরা।'

'আলবেনিয়ায় যাব না? তাহলে কোথায় যাব?'

'প্রায় একশো মাইল পাড়ি দিতে হবে,' বলল রানা। 'জাতিসংঘের তরফ থেকে ইটালি সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে, ওদের নৌবাহিনীর একটা ডেস্ট্রয়ার আমাদেরকে তুলে নেবে।'

হেডলাইটের আলোয় হঠাৎ সৈকত ও সাগর দেখা গেল। পাজেরো থামিয়ে মুর্তজা বললেন, 'গাড়িটা এখানেই রেখে যেতে হবে। পাহাড়ের সরাসরি নিচে রাখলে যার চোখে পড়বে সেই বুঝতে পারবে কোথায় যাচ্ছি আমরা।'

'সেক্ষেত্রে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখুন,' বলল রানা।

গাড়ির মুখ ঘোরাবার পর তাগাদা দিলেন মুর্তজা। 'নামো, ফাতেমা। তাড়াতাড়ি করো।'

ফাতেমার হাতে শুধু একটা লেদার ব্যাগ রয়েছে। ব্রিফকেসটা গাড়িতেই রেখে যাচ্ছে রানা, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সব ওর কোটের পকেটে। ওদের কন্যাটিকে কাঁধে তুলে নিল ও। পাণ্ডুলিপি রয়েছে বিলিয়ার্ডের দেয়া ব্যাগে, সেটা মুর্তজায়েভের বাঁ কাঁধে ঝুলছে। তিনি তাঁর ছেলেকে ডান কাঁধে তুলে নিলেন। সৈকত ধরে দ্রুত পায়ে রওনা হলো ওরা।

আকাশে চাঁদ নেই। তবে তারার আলোয় অন্ধকারে চিক চিক করছে সাগর। কোন ট্রলার বা নৌকা, কিছুই নেই পানিতে।

হাঁটার গতি ক্রমশ মন্থর হয়ে এল। সামনে অন্ধকার, পাহাড় থাকলেও দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই আরও অনেক দূরে সেটা। আরও পাঁচ মিনিট হাঁটার পর পাহাড় নয়, বোল্ডারের রাজ্যে প্রবেশ করল ওরা। একটু পরই অবশ্য জমিন ক্রমশ উঁচু হতে শুরু করল। অর্থাৎ পাহাড়েই উঠছে ওরা।

হঠাৎ এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। 'আড়াল নিন! জলদি!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। ওর দেখাদেখি পড়িমরি করে ছুটল সবাই, বড় একটা বোল্ডারের আড়ালে এসে বসে পড়ল।

উঁকি দিয়ে ফেলে আসা সৈকতে তাকাল রানা। সার্চ লাইট জ্বেলে একটা হেলিকপ্টার আসছে। পাজেরোকে দেখতে পেয়েছে পাইলট। এত দূর থেকেও পাইলটের সঙ্গীকে দেখা গেল, খোলা দরজা দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে আছে।

পাজেরোর একশো মিটার ওপরে স্থির হলো কপ্টার। সার্চলাইটের আলো সরাসরি গাড়িটার ওপর ফেলা হয়েছে। দরজা থেকে ব্রাশ ফায়ার শুরু করল

লোকটা। থেমে থেমে তিন পশলা গুলি করল। গাড়ি থেকে কেউ বেরুচ্ছে না দেখে কপ্টার নিয়ে আরও খানিক ওপরে উঠে গেল পাইলট। একটু পরই বিস্ফোরিত হলো পাজেরো। সন্দেহ নেই, কপ্টার থেকে গ্রেনেড ফেলা হয়েছে।

জ্বলন্ত পাজেরোকে ঘিরে কয়েকবার চক্কর দিল পাইলট, তারপর যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল।

কেউ কোন কথা বলল না। রানার পিছু নিয়ে আবার ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল সবাই। ঢালটা পাথুরে, তবে খাড়া নয়। বাধা সৃষ্টি করছে বোল্ডারগুলো। ছোট বড় সব রকমই আছে, কখনও টপকাতে হচ্ছে, কখনও পাশ কাটাতে। স্বভাবতই এগোবার গতি খুব মন্থর।

চূড়ায় উঠতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। কয়েকটা গাছের তলায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা, এই সময় আবার শোনা গেল এঞ্জিনের শব্দ। 'ওই ঝোপটা! ভেতরে ঢুকে পড়ুন,' লাফ দিয়ে সিধে হয়েই দৌড়াল রানা, বাচ্চা মেয়েটিকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে।

ঝোপের ভেতর মাত্র ঢুকেছে ওরা, পাহাড়ের চূড়ায় সার্চ লাইটের আলো পড়ল। 'কেউ নড়বেন না!' সাবধান করে দিল রানা, ঝোপের কয়েকটা ডাল কাঁপছে দেখে হাত বাড়িয়ে থামাল ওগুলো।

চূড়াটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে পাইলট। পাজেরো খালি ছিল, এটা সে ধরে ফেলেছে। সৈকতের অন্য দিকে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিল, কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে এদিকটা দেখতে এসেছে।

ঝোপের ফাঁক দিয়ে চূড়ার ওপর চোখ বোলাল রানা। বোল্ডার থাকায় এখানে পাইলট ল্যান্ড করতে পারবে না। তিন তিন বার চক্কর দিল সে, যেন এই জায়গা ছেড়ে নড়তে মন চাইছে না। শেষে সম্ভবত ফুয়েলের কথা ভেবেই ফিরে যেতে হলো তাকে।

কপ্টার দূরে মিলিয়ে যেতে চূড়া থেকে নামার প্রস্তুতি নিল রানা। 'নামার সময় টর্চ জ্বাললে সাগর থেকে দেখা যাবে আলোটা,' বলল ও। 'কাজেই একান্ত প্রয়োজন না হলে আলো জ্বালবেন না কেউ।'

'আমার ব্যাগে একজোড়া পেন্সিল টর্চ আছে,' বললেন ফাতেমা।

'হ্যাঁ, পেন্সিল টর্চ জ্বালা যায়। বের করুন।'

'আমি জানি আপনাদের খিদে লেগেছে,' ফাতেমার কণ্ঠে গৃহিণীসুলভ মমতা। 'টিফিন ক্যারিয়ারে দুপুরের খানিকটা খাবার রেখে দিয়েছি আমি। প্লেট তো নেই, হাত দিয়ে নিয়ে খেতে হবে...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'এখন নয়, মিসেস মুর্তজা, ট্রলারে ওঠার পর। বিপদ এখনও কাটেনি।'

ম্লান সুরে ফাতেমা বললেন, 'না, মানে, ভাবছিলাম এই সুযোগে মেয়েটার ঘুম ভাঙিয়ে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করব। ছেলেটা চকলেট আর দুধ খেয়েছে, কিন্তু মেয়েটা আমার কিছুই মুখে দেয়নি...'

'দুঃখিত, এখন সম্ভব নয়,' রানার গলার আওয়াজ একটু বোধহয় কঠিন হয়ে গেল। 'আসুন।' অন্ধকারেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল ও। বাধ্য

হয়েই ওকে অনুসরণ করলেন ফাতেমা। কিছু বললেন না বটে, তবে রানার আচরণে আঘাত পেয়েছেন। একটু পর স্বামী-স্ত্রীর ফিসফাস শুনতে পেল রানা। তারপর ওর হাতে মুর্তজা একটা পেন্সিল টর্চ গুঁজে দিলেন।

মাঝে-মধ্যে পিছন থেকে রানাকে পথ-নির্দেশ দিচ্ছেন মুর্তজা, তার কথা মত দিক বদল করছে রানা। পাথুরে জমিন ক্রমশ ঢালু দেখে বোঝা গেল চূড়া থেকে নামতে শুরু করেছে ওরা। অনেক নিচে সাগর, তবে বোল্ডারের আড়াল থাকায় দেখা যাচ্ছে না।

মিনিট দশেক নামার পর অকস্মাৎ সাপ দেখার মত চমকে উঠল রানা। 'থামুন!' কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

'কি হলো?' রানার গায়ে ধাক্কা খেতে গিয়ে নিজেকে কোন রকমে সামলে নিলেন মুর্তজা।

রানার মাত্র একপা সামনে গভীর খাদ, সরাসরি নিচের সাগরে নেমে গেছে। সামান্য একটা পেন্সিল টর্চ এ-যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছে ওকে। 'ভুল করেছি আমরা,' বলল ও। 'সৈকতটা এদিকে নয়, অন্য কোনও দিকে।'

পেন্সিল টর্চের আলোয় গভীর খাদটা এবার মুর্তজাও দেখতে পেলেন। 'সর্বনাশ!'

তাঁর হাতে পেন্সিল টর্চটা ধরিয়ে দিয়ে পকেট থেকে ম্যাপ বের করল রানা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'অনেক বেশি বাম দিকে সরে এসেছি। ওপরে ফিরে যাবার দরকার নেই, খাদের কিনারা ধরে ডান দিকে যেতে হবে।'

হাঁটার গতি আরও মন্থর হয়ে পড়ল। কাঁধের বোঝাটা কয়েক মণ ভারী লাগছে, আড়ষ্ট ভাব দূর করার জন্যে মেয়েটাকে খানিক পরপর এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে বদল করছে রানা। বারবার দাঁড়াতে হচ্ছে ওকে, কারণ ক্লান্ত ফাতেমা পিছিয়ে পড়ছেন। খাদের ওপর একটা চোখ রেখেছিল বলেই ব্যাপারটা টের পেল রানা—সেটা আর নেই। প্রায় ত্রিশ মিটার নিচে চিকচিক করছে সাগর। তারার আলোয় পরিষ্কার নয় কিছুই, তবে মনে হলো নিচে একটা ছোট্ট সৈকত আছে।

সত্যি আছে কিনা দেখার জন্যে নামতে হবে ওদেরকে। আর নামা যখন যাচ্ছে, নিচে সৈকত না থেকে পারে না। এক সময় নরম বালিতে পা পড়ল। 'আগে ট্রলারটা খুঁজে বের করুন, তার আগে এখান থেকে আমি নড়ছি না,' বলে বালির ওপর বসে পড়লেন ফাতেমা। রানার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'দিন, আমার মেয়েকে দিন।'

একটা চাদর বিছানো হলো, তাতে ছেলেটাকেও শুইয়ে দিলেন মুর্তজা। রানাকে নিয়ে ট্রলার খুঁজতে বেরুলেন তিনি। সৈকতটা খুবই ছোট, দৈর্ঘ্যে মাত্র পনেরো মিটার, প্রস্থে আরও কম। সন্দেহ নেই, জোয়ারের সময় এই সৈকত পুরোটাই তলিয়ে যায়।

'গুহাগুলো ডান দিকে না বাম দিকে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না। এই সৈকতে একবারই মাত্র নেমেছিলাম, আমার তখন পনেরো কি ষোলো বছর বয়স…'

'ম্যাপেও কিছু বলা হয়নি,' বলল রানা। 'আসুন, খুঁজতে হলে পানিতে নামতে হবে।' ওর পিছু নিয়ে ডান দিকের সৈকত থেকে পানিতে নামলেন মুর্তজা।

টর্চ জ্বালতে ভয় পাচ্ছে রানা। অন্ধকার সাগরে নৌবাহিনীর গানবোট আলো নিভিয়ে অপেক্ষা করে থাকলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। সেক্ষেত্রে টর্চ জ্বালা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। পায়ের নিচে বালি নয়, পাথর পাচ্ছে ওরা। আশপাশের পানিতেও প্রচুর বোল্ডার মাথা উঁচু করে পড়ে আছে।

'আমরা বোধহয় ভুল করেছি,' বলল রানা। 'গুহার সামনে এত বোল্ডার থাকলে ট্রলার ঢোকানো হয়েছে কিভাবে?'

'চলুন তাহলে বাম দিকটা দেখি।'

সাগর থেকে উঠে এল ওরা। ফাতেমাকে পাশ কাটাবার সময় রানা দেখল, ঘন ঘন ঝাঁকি দিয়ে মেয়ের ঘুম ভাঙাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন তিনি।

বাম দিকের পানিতেও বোল্ডার আছে, তবে গায়ে গায়ে লেগে নেই। পানির গভীরতা এক সময় হাঁটু সমান হলো। হাতের আড়ালে পেন্সিল টর্চ জ্বেলে পাহাড়ের গা পরীক্ষা করছে রানা। গুহা একটা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সেটা এত সরু যে ভেতরে কোন বোট ঢুকবে না। পাঁচ মিটার দূরে আরও একটা গুহামুখ পাওয়া গেল। এটা বেশ চওড়া। রানা যখন ভেতরে ঢুকল, ওর কোমর ডুবে গেছে। অন্ধকার গুহা, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আরও খানিকটা ভেতরে ঢুকে ছয় ব্যাটারির টর্চটা একবার জ্বেলেই নিভিয়ে ফেলল। আছে, পুরানো একটা ট্রলার গুহার গায়ে সেঁটে আছে। ওটার দু'পাশে টায়ার লাগানো, ফলে ঢেউয়ের দোলায় দেয়ালে বাড়ি খেলেও কাঠামোর কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

'সৈকতে পানি কম, ট্রলারে উঠতে হলে হেঁটে গুহার ভেতর ঢুকতে হবে সবাইকে,' বলল রানা। 'চলুন, ওদেরকে নিয়ে আসি।'

সৈকতে ফিরে এসে রানা দেখল, ঘন ঘন ঝাঁকি দিয়ে মেয়ের শুধু ঘুমই ভাঙাননি ফাতেমা–আয়োজন করে তাকে প্যাকেট দুধ, চকলেট আর বিস্কিট খাওয়াচ্ছেন। ঝুঁকে ছেলেকে কাঁধে তুলে নিলেন মুর্তজা। রওনা হয়ে কয়েক পা এগোলেন, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালেন। রানা পাশে দাঁড়িয়ে আছে, দেখেও না দেখার ভান করে মেয়েকে খাওয়াতে ব্যস্ত ফাতেমা। মুর্তজা বললেন, 'তাড়াতাড়ি করো, ফাতেমা। খোলা সৈকতে বেশিক্ষণ থাকাটা বোকামি হয়ে যাচ্ছে। রানার হাতে তুলে দাও ওকে।'

'ঠিক আছে, আপনি যান,' রানাকে বলল ফাতেমা। 'ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

ট্রলারটা ত্রিশ ফুট লম্বা। দেখতে পুরানো হলেও, ইয়ামাহা এঞ্জিনটা প্রায় নতুন, ঘণ্টায় চোদ্দ নট গতিতে ছুটতে পারে। ট্রলারটার কোন নাম নেই, তবে দু'দিকের গায়ে নম্বর লেখা আছে, আপসাইডডাউন, অর্থাৎ, উল্টাপাল্টা সিক্সটিনাইন।

মুর্তজা বললেন, 'এই নম্বর সার্ব ব্যবসায়ী সমিতির দেয়া। নম্বর দেখেই অন্যান্য ট্রলারের জেলেরা বলে দিতে পারে কে কোনটার মালিক। ...একটা কাগজ রেখে গেছে সুজায়েভ, তাতে এই ট্রলারের মালিকের নাম লেখা আছে। কেউ যদি

থামিয়ে প্রশ্ন করে, বলতে হবে মালিক অসুস্থ, তার বদলে আমরা মাছ ধরতে এসেছি।'

ফতুয়ার মত দেখতে চামড়ার তৈরি লাল জামা গায়ে দিল ওরা। ট্রলারের ডেকে মাছ ধরার জাল, মাছের পেট কাটার জন্যে টেবিল ও ছুরি, সবই আছে। নিচের হোল্ডে কয়েকটা কম্বল পাওয়া গেল, বাচ্চা দুটোকে নিয়ে সেগুলোর ওপর শুয়ে পড়লেন ফাতেমা। পানি, শুকনো খাবার, টর্চ, ফ্লেয়ার, লাইফজ্যাকেট ইত্যাদি আরও অনেক কিছু পাওয়া গেল একটা ব্যাগে। রানা সুজায়েভকে ছদ্মবেশ নেয়ার কিছু উপকরণ যোগাড় করতে বলেছিল, সেগুলোও একটা ব্যাগে পাওয়া গেল।

হুইলহাউসে ঢুকে কাগজটার ভাঁজ খুললেন মুর্তজা। 'মালিকের নাম দেবারভিল ডুবচেক। ওহ্, গড!'

'কি হলো?'

'দেবারভিল, দেবারভিল,' বিড়বিড় করছেন মুর্তজা। 'ড. সিডাকের ভাই ডুবচেক। আপনি জানেন না, ড. সিডাকের পুরো নাম দেবারভিল সিডাক?'

'কিন্তু তা কি করে হয়?' বলল রানা। 'পুলিস চীফের ভাই জেলে?'

'জেলে নয়, জেলে নয়,' মাথা নেড়ে বললেন মুর্তজা। 'ডুবচেক জেলে সমিতির সাধারণ সম্পাদক। এরকম আরও অনেক বোট আছে তার, ভাড়া খাটায়। ব্যাপারটা ভাল হলো নাকি খারাপ ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমার ধারণা, ভালই হলো,' বলল রানা। 'ডুবচেকের বোটকে সহজে কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না, অন্তত জেলেরা তো নয়ই।'

'তা ঠিক, কিন্তু সুজায়েভ যদি এটা চুরি করে এনে থাকে, নৌ-পুলিস নিশ্চয়ই এটাকে খুঁজবে।'

রানা গম্ভীর হয়ে গেল। 'আমি আরও একটা সমস্যা দেখতে পাচ্ছি, মি. মুর্তজা।'

'কি?'

'মাছ ধরার ট্রলারে লোক থাকার কথা কমপক্ষে পাঁচ-সাতজন, তাই না? কিন্তু আমরা মাত্র দু'জন।'

কামানো মাথায় হাত বুলালেন মুর্তজা। 'তাই তো! তার ওপর, আপনি যেহেতু স্থানীয় নন, কোন বোটকে কাছাকাছি আসতে দেখলে আপনাকে লুকিয়ে পড়তে হবে। এখন উপায়?'

'হামলা হলে পাল্টা হামলা করার দরকার হবে,' বলল রানা। 'কাজেই আমার লুকানো চলে না। হুইলহাউসেই থাকব আমি, তবে কম্বল মুড়ি দিয়ে। কথাবার্তা আপনিই বলবেন। বলবেন, আমার জ্বর। আর ক্রুরা? তারা নিচের হোল্ডে ঘুমাচ্ছে।'

'ঠিক আছে। এখন তাহলে রওনা হতে পারি আমরা, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, আর দেরি করা উচিত নয়,' বলল রানা। আবার পানিতে নামতে হলো ওকে। রশি ধরে টেনে ট্রলারকে গুহা থেকে বের করে আনল। বোটের গা থেকে টায়ারগুলোও খুলতে হলো ওকে। না খুললে যে দেখবে তারই সন্দেহ হবে,

কোনও গুহায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ঊনসত্তর নম্বরকে।

রানা হুইলহাউসে ঢুকতে স্টার্ট দিলেন মুর্তজা। রানা দিক নির্দেশ দিল, 'নাক বরাবর সোজা দশ নট, তারপর সৈকত ডানে রেখে পুবদিকে।'

স্পীড বাড়ালেন মুর্তজা। 'কেন, পুবদিকে কেন? আপনি তো বললেন, আমরা আলবেনিয়ায় যাব না।'

'খোলা সাগরে নিঃসঙ্গ একটা ট্রলার দেখলে হেলিকপ্টার বা গানবোটের ওরা সন্দেহ করবে না?'

'হ্যাঁ, তা করবে...'

'জেলেরা দল বেঁধে আলবেনিয়ার দিকেই যায়, কারণ ওদিকে সবচেয়ে বেশি মাছ-পাওয়া যায়,' আবার বলল রানা। 'কাজেই আমাদেরকেও ওদের ভিড়ে মিশে যেতে হবে। তারপর যখন একটা দুটো করে ফিরতি পথ ধরবে ট্রলারগুলো, সুযোগ বুঝে আমরাও ইটালির দিকে রওনা হব।'

দশ নটিক্যাল মাইল পেরিয়ে এসে রানার কথামতই পুব দিকে ট্রলার ঘুরিয়ে নিলেন মুর্তজা। পুবদিকে আরও বিশ নট এগোবার পর ট্রলার-বহরটাকে দেখতে পেল ওরা। এখনও সেটা পাঁচ নট দূরে, আলো জ্বেলে মাছ ধরছে।

'আমরা যে রওনা হয়েছি, তা কি ইটালি কর্তৃপক্ষ জানে?'

'জানে,' আশ্বস্ত করল রানা। 'কেন, দেখেননি, আপনার বাড়ি থেকে ইটালি দূতাবাসে ফোন করলাম আমি।'

'ফোন করতে দেখেছি, কার সঙ্গে কি কথা হলো তা শুনিনি।'

হঠাৎ রানার শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। 'এ কি! ওরা তো মাছ ধরছে না!'

এতক্ষণে মুর্তজাও খেয়াল করলেন ব্যাপারটা। ট্রলারের বহরটা তীরবেগে ওদের দিকেই ছুটে আসছে। আলো দেখে বোঝা গেল, বহরে কম করেও ত্রিশ চল্লিশটা ট্রলার রয়েছে। বিশাল একটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ওগুলো, তবে সন্দেহ নেই, ফিরেই আসছে।

'আরে, এর মানে কি?'

'স্পীড কমান,' বলল রানা, মেশিন পিস্তলটা পায়ের কাছ থেকে তুলে কোলের ওপর রাখল।

দেখতে দেখতে ট্রলার বহর কাছে চলে এল। পানির ছিটা লেগে হুইলহাউসের কাঁচ ঝাপসা হয়ে আছে। কয়েকটা ট্রলার পাশ কাটাল ওদেরকে। হুইলহাউসের ছাদ সরিয়ে সিধে হলেন মুর্তজা। সামনে আরেকটা ট্রলার, একেবারে গা ঘেঁষে ওদেরকে পাশ কাটাবে। তাঁর মুখে টর্চের আলো পড়ল। হাত তুলে নাড়লেন মুর্তজা। ফিরতি মুখী ট্রলার স্পীড কমাল। 'এই যে ঊনসত্তর, ওদিকে যাচ্ছ কোথায়? কি ঘটেছে জানো না?'

মুর্তজাও সার্ব-ক্রোট ভাষায় চিৎকার করে জবাব দিলেন। 'কেন, কি ঘটেছে?'

'কোন্ শালা নাকি পালাচ্ছে!' পাশের ট্রলার থেকে বলল লোকটা। 'নৌবাহিনীর গানবোট তাকে ধরার জন্যে সাগর চষে বেড়াচ্ছে। আমাদেরকে বলা হয়েছে, বসনিয়ার দিকে গিয়ে মাছ ধরতে।'

'বোট ঘুরিয়ে নিন,' বলল রানা। 'বহরের পিছু নিয়ে একজোড়া গানবোট

আসছে।'

তাড়াতাড়ি ট্রলার ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরলেন মুর্তজা।

দুটো ট্রলার এখন পাশাপাশি ছুটছে। প্রশ্ন ভেসে এল, 'কিন্তু বসনিয়ার দিকে ঘোড়ার ডিম মাছ পাওয়া যাবে। তোমরা কি করবে, উনসত্তর? মাছ ধরবে, নাকি ডেরায় ফিরে যাবে?'

'ভাবছি,' জবাব দিলেন মুর্তজা।

'তোমাদের লোকজন কই?'

'নিচে ঘুমাচ্ছে,' বললেন মুর্তজা। 'তোমরা কি করবে?'

জবাব এল, 'অন্তত দশটা বোট মাঝ সাগরে যাচ্ছে, আমরাও থাকছি সঙ্গে। কিন্তু সবাই জানে মাঝ সাগরেও মাছ নেই।'

'তাহলে?'

'আরে, রহস্যটা বুঝলে না? মাঝ সাগরের কথা বলে আমরা আসলে ইটালির উপকূলে হানা দেব। সাগরে যখন বেরিয়েছি, খালি হাতে তো আর ফিরতে পারি না।'

'বলুন,' বুদ্ধি দিল রানা, 'আমরাও তোমাদের সঙ্গে আছি।'

তাই থাকল ওরা, কিন্তু বিপদ পিছু ছাড়ল না। মাঝ সাগরে পৌঁছাতে রাত সাড়ে তিনটে বেজে গেল। ইটালি এখান থেকে আরও পঞ্চাশ নট দূরে। এই সময় সার্চলাইট জ্বেলে বহরটাকে ধাওয়া করল একজোড়া গানবোট। আসলে, কাউকেই ওরা কোন উপকূলের দিকে যেতে দিতে রাজি নয়।'

সব মিলিয়ে দশটা ট্রলার, গানবোটের তাড়া খেয়ে পালাতে শুরু করল। পাইলটরা সবাই মন্ট্রিনিগ্রো কিংবা বসনিয়ার দিকে ছুটছে।

'কপালে যা আছে, আমরা ফিরছি না,' বলল রানা। 'ফুলস্পীড দিন। নাক বরাবর সোজা চলুন।'

'কিন্তু ওরা ধাওয়া করবে! গানবোটের স্পীড আমাদের চেয়ে বেশি!' প্রতিবাদ করলেন মুর্তজা।

'আমাদের চেয়ে স্পীড বেশি? মনে হয় না। তাছাড়া, ভয় স্পীডকে নয়, মি. মুর্তজা। ভয় ওদের কামানের রেঞ্জকে। যখন দেখবে আমরা থামছি না, কামানের গোলা ছুঁড়ে ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে।' কথাটা নির্মম হলেও, বাস্তবে ঠিক তাই ঘটতে শুরু করল।

উনসত্তর ফুলস্পীডে পালাচ্ছে, দেখতে পেয়ে ধাওয়া করল একটা গানবোট। এক নট পিছনে ছিল ওটা, স্পীড বাড়াবার পর দূরত্ব একই থাকল না, ধীরে ধীরে কমতে শুরু করল। তারমানে রানার ধারণা ভুল, গানবোটের স্পীড ট্রলারের চেয়ে কিছু বেশিই হবে।

চারটে বাজল। ভোর হতে আরও এক ঘণ্টা বাকি। গানবোট সিকি নট পিছনে চলে এসেছে। ধীরে ধীরে হলেও, মাঝখানের ব্যবধান আরও কমছে।

তারপর সার্চলাইটের আলো পড়ল ট্রলারের গায়ে। অসহায় বোধ করছে রানা। আলো জ্বালার মানে এবার কামান দাগা হবে। নিজের কথা ভাবছে না,

এমনকি মুর্তজা দম্পতির কথাও নয়, ভাবছে বাচ্চা দুটোর কথা। অন্তত ওদেরকে যদি বাঁচাতে পারা যায়…কিন্তু কিভাবে? সাগর প্রায় শান্তই বলা যায়, কিন্তু অন্ধকার। ইটালির উপকূল এখনও সম্ভবত বিশ নট দূরে। আশপাশে কোন জাহাজ বা অন্য কোন জলযান নেই, থাকলে আলো জ্বলত।

'আমি নিচে যাচ্ছি,' বলল ও। 'এখুনি ফিরে আসব। ইতিমধ্যে ওরা যদি ফায়ার করে, তবু আপনি থামবেন না।'

নিচে নেমে এসে রানার মন আরও খারাপ হয়ে গেল। বাচ্চা দুটোকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন ফাতেমা। ওদের ঘুম ভাঙাবার আগে ব্যাগ থেকে ছোটবড় কয়েকটা লাইফজ্যাকেট বের করল ও। আরেকটা লম্বা ব্যাগে হাত গলাল, অস্ত্রগুলো বের করে তৈরি রাখতে চায়। রাইফেল ছাড়াও ভিতরে ভারী ও লম্বা কিছুর অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বের করে আনল রানা ওটা।

ল্যাম্পের আলোয় জিনিসটা চিনতে পেরে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ল রানা। ও কি সুজায়েভকে গ্রেনেড লঞ্চার যোগাড় করতে বলেছিল? না, অসম্ভব! ও জানে, এ-ধরনের একটা জিনিস যোগাড় করা সুজায়েভের সাধ্যের বাইরে, কাজেই কেন তাকে বলতে যাবে? তারমানে সুজায়েভকে আন্ডারএস্টিমেট করেছে ও। যেভাবে বা যেখান থেকেই হোক, জিনিসটা যোগাড় করে এখানে রেখে গেছে সে। কিন্তু জানল কিভাবে, গ্রেনেড লঞ্চার দরকার হতে পারে ওদের? লঞ্চার যখন আছে, নিশ্চয়ই গ্রেনেডও পাওয়া যাবে?

ব্যাগ হাতড়াতে তা-ও পাওয়া গেল। বেশ অনেকগুলো।

ওদের ঘুম না ভাঙিয়েই ট্রলারের ডেকে উঠে এল রানা। রেঞ্জের বাইরে হলেও ওদের হুঁশিয়ার করার জন্য রাইফেল তাক করে কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল ও গানবোটের ব্রিজ লক্ষ্য করে। সাবধান, বেশি কাছে এসো না!

'ওহ্ গড! ওহ্ মাই গড!' হুইলহাউস থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন মুর্তজা।

রাইফেলের গুলিকে মোটেও ভয় পেল না ওরা, আরও কাছে চলে আসছে গানবোট। তারপর কামান দাগল। পর পর দুটো শেল ছুটে এলো। একটা পড়ল দশহাত পিছনে, অপরটা ছাত উড়িয়ে নিয়ে গেল হুইলহাউসের।

আর একটু কাছে আসতে দিল রানা ওদের। তারপর লঞ্চার তাক করে দুটো গ্রেনেড ছুঁড়ল গানবোটের দিকে। কিন্তু দুটোর একটাও লাগাতে পারল না।

'রানা!' হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন মুর্তজা।

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দক্ষিণ দিকে তাকাল রানা। ওদিক থেকে তীরবেগে ছুটে আসছে দ্বিতীয় গানবোট। ও শুধু নতুন বিপদটাকেই দেখছে না, কল্পনার চোখে মুর্তজায়েভের দুই বাচ্চার লাশও দেখতে পাচ্ছে।

মৃত্যু সুনিশ্চিত, উপলব্ধি করার পর সমস্ত অসহায়বোধ নিমেষে উধাও হয়ে গেল। পরিস্থিতি, প্রকৃতি ও নিয়তি যখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দপ করে জ্বলে উঠতে পারে বলেই তো ও মাসুদ রানা। কোটের পকেট হালকা হতে শুরু করল, একটা করে গ্রেনেড বের করে লঞ্চারে সেট করছে, ট্রিগার টেনে ছুঁড়ে দিচ্ছে দ্বিতীয় গানবোটকে লক্ষ্য করে। ওটার পাইলট হিসেবে ভুল করে [illegible] নিরাপদ দূরত্বে থাকার গরজ অনুভব করেনি, সেই ভুলের খেসারত

দিতেই হলো। পর পর দুটো গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো–একটা লাগল হুইলহাউসে, আরেকটা পেট্রল ট্যাংকে। পানির ওপর আগুনে গোসল করছে গানবোট। অগ্নিকুণ্ড ডিগবাজি খেয়ে ডুবতে শুরু করল।

কি ঘটছে দেখায় মগ্ন ছিলেন মুর্তজা, ঢেউগুলোকে ঠিক মত সামাল দিতে পারেননি, ফলে গতি অনেকটাই কমে গেছে। এই সুযোগে প্রথম গানবোট আগের চেয়ে কাছে সরে এসেছে। সেটাকে লক্ষ্য করে আরও একটা গ্রেনেড ছুঁড়ল রানা। লাগল বটে, কিন্তু তেমন কোন ক্ষতি করতে পারল না গানবোটের।

তারপর কোটের পকেট থেকে খালি হাত বেরিয়ে এল। আর কোন গ্রেনেড নেই।

'রানা!' আবার চেঁচিয়ে উঠলেন মুর্তজা। এবার তাঁর গলায় উল্লাস।

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে ট্রলারের নাক বরাবর সামনে তাকাল রানা। দিগন্তে দেখা যাচ্ছে সাদা বকের মত ঝকঝকে একটা জলযান। দূরে বলে ছোট দেখাচ্ছে, তবে চিনতে অসুবিধে হলো না। ইটালিয়ান নৌবাহিনীর একটা ডেস্ট্রয়ার ওদেরকে তুলে নিতে আসছে।

কিন্তু এখনও ওটা অনেক দূরে। অথচ রানার কাছে কোন গ্রেনেড নেই।

তাছাড়া, আন্তর্জাতিক জলসীমায় যুগোশ্লাভ নৌবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া হয়তো এড়িয়েও যেতে পারে ইটালিয়ান ডেস্ট্রয়ারটা।

পিছন দিকে তাকাতে যাবে রানা, বিপদ যা ঘটার ঘটে গেল। বাতাসে শিস কেটে ছুটে এল আরেকটা শেল, লাগল সরাসরি ট্রলারের পিছনে।

আক্ষরিক অর্থেই লেজের ওপর খাড়া হয়ে গেল ট্রলার। ছিটকে পানিতে পড়ল রানা। বিশাল একটা ঢেউ মাথায় তুলে নিল ওকে। খাড়া অবস্থা থেকে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল ট্রলার। প্রায় ডুবে গেল ওটা, তারপর আবার ভেসে উঠল। যখন ডুবছে, ঢেউটা আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেছে ওকে ট্রলারের ডেকে। ফাতেমা আর বাচ্চা দুটোর কান্না ও চিৎকার শুনতে পাচ্ছে রানা। ট্রলার এখনও ছুটছে, কিন্তু হুইলহাউসে নিষ্প্রাণ মূর্তিতে পরিণত হয়েছেন মুর্তজা। রানা ঠিক বুঝতে পারল না ভদ্রলোক জ্ঞান হারিয়েছেন কিনা।

ট্রলারের পিছনটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। খোলের ভেতর পানি ঢুকছে, যে-কোন মুহূর্তে তলিয়ে যাবে। ক্রল করে মইয়ের ধাপগুলো পেরুল রানা, হোল্ডে নেমে দেখল, পানিতে খাবি খাচ্ছে বাচ্চা দুটো। ফাতেমা মাছ ধরার ভঙ্গিতে ছোঁ মারছেন, কিন্তু ছটফট করায় কাউকে ধরতে পারছেন না। ওদেরকে দুই কাঁধে তুলে নিল রানা, একজোড়া লাইফজ্যাকেট ধরিয়ে দিল ফাতেমার হাতে। 'ভয় নেই, জাহাজ এসে গেছে। ছেলেকে নিয়ে যতক্ষণ পারা যায় পানিতে ভেসে থাকার চেষ্টা করবেন।'

ফোঁপাচ্ছেন ফাতেমা, তবে রানার কাঁধ থেকে ছেলেকে তুলে নিলেন। রানার দেখাদেখি লাইফজ্যাকেট পরাবার পর নিজেও একটা পরে নিচ্ছেন। তারপর খুব দ্রুত ঘটে গেল সব কিছু। ছেলেকে কোলে নিয়ে কোন রকম দাঁড়িয়েছেন ফাতেমা, পিছন থেকে তাকে ঠেলে মইয়ের ধাপে তুলে দিল রানা। পিছু নিয়ে নিজেও উঠল। ইতিমধ্যে ডুবতে শুরু করেছে ট্রলার। অনেকটা কাছে চলে আসা ডেস্ট্রয়ার

থেকে কামান দাগা হচ্ছে, একটা গোলা গানবোটকে ছাড়িয়ে গেল। স্পীড কমাবার আগে ট্রলারকে লক্ষ্য করে আরেকটা গোলা ছুঁড়ল গানবোটের গানার। সেটাই কাল হলো। ট্রলার দু'টুকরো হয়ে গেল। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো রানা, ওর হাত থেকে বাতাস যেন ছিনিয়ে নিল মেয়েটাকে, তারপর প্রকাণ্ড একটা ঢেউ কেড়ে নিল বাতাসের কাছ থেকে। পরমুহূর্তে শুরু হলো ব্রাশ ফায়ার। আরেকটা ঝাঁকি খেলো রানা, চোখ নামিয়ে দেখল ওর বাম কাঁধের কাছে কোট অদৃশ্য হয়েছে, সাদা শার্ট লাল হয়ে উঠছে। ঘাড় ফেরাতে ট্রলারের দ্বিতীয় খণ্ডে মুর্তজাকে দেখতে পেল ও, স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে পানিতে লাফ দিতে যাচ্ছেন। পরমুহূর্তে তলিয়ে গেল ট্রলার।

ডেস্ট্রয়ারের দুটো চারইঞ্চি কামান মুহুর্মুহু গর্জে উঠছে। একজোড়া হাইস্পীড বোট নামানো হয়েছে পানিতে, তীরবেগে ছুটে আসছে ওগুলো। অবস্থা বেগতিক দেখে লেজ তুলে পালাতে শুরু করল গানবোট।

ট্রলারের কাঠের একটা চওড়া তক্তাকে নিয়ে খেলছে ঢেউগুলো, সেটার ওপর বসিয়ে রাখা হয়েছে ছেলেটাকে, মুর্তজা দম্পতি এক হাতে তক্তা ধরে আছেন, আরেক হাতে ছেলেকে। উঁচু ঢেউয়ের আড়াল থাকায় দু'জনেই তাঁরা বিস্ফারিত চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন, কিন্তু রানা বা মেয়েকে কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না।

ডেস্ট্রয়ার থেকে পাঠানো একটা বোট ওদের কাছে পৌঁছে গেল, আরেকটা চলে গেল পাশ কাটিয়ে পিছন দিকে। প্রথম বোটের ইউনিফর্ম পরা লোকজন পানি থেকে তুলছে ওদেরকে, ফাতেমা ফুঁপিয়ে উঠে বললেন, 'আমার মেয়ে! সুলতানা! আমার মেয়ে...'

'আপনি শান্ত হন,' একজন ইটালিয়ান ক্রু বলল। 'নিন, এই কম্বলটা গায়ে জড়ান...'

স্বামীকে জড়িয়ে ধরে অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়লেন ফাতেমা। 'আমার মেয়েকে এনে দাও! আমার সুলতানাকে...'

স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়ার কথা ভুলে গেছেন মুর্তজা, চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছেন বোটের ক্রুদের দিকে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, তাদের সবার মুখেই হাসি।

দ্বিতীয় বোটটা ইউ টার্ন নিয়ে ফিরে যাচ্ছে ডেস্ট্রয়ারের দিকে। সেদিকে একটা হাত তুলল একজন ক্রু। বলল, 'মি. ও মিসেস মুর্তজা, ওই দেখুন, আপনাদের মেয়ে আমাদের দ্বিতীয় বোটে।'

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ভাল করে দেখার জন্যে বোটের কিনারায় আছড়ে পড়লেন। ঘটনা সত্যি। পরম আনন্দে তাঁরা দেখলেন, ইউনিফর্ম পরা একজন ক্রু সুলতানাকে কোলে নিয়ে দ্বিতীয় বোটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'আল্লাহ মহান,' বিড় বিড় করছেন মুর্তজা।

'কিন্তু মি. রানা?' ঝট করে ঘাড় বাঁকিয়ে ক্রুর দিকে তাকালেন ফাতেমা।

'উনি সম্ভবত আহত হয়েছেন। তাঁকে বোটে তোলার পর ডেকে শুইয়ে দেয়া

হয়েছে। আহত অবস্থায় সাঁতরাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, তাঁর পিঠে ছিল মেয়েটি...'

প্রবল ক্লান্তি নাকি আনন্দের আতিশয্য বলা কঠিন, স্বামীর বুকে জ্ঞান হারালেন ফাতেমা।

এপ্রিল মাসের নয় তারিখে সারায়েভোর মুসলমানরা তিরানব্বুই সালের মর্মান্তিক দাঙ্গার স্মরণে শোক মিছিল বের করে। রানার রিপোর্ট পেয়ে জাতিসংঘ আগেই সতর্ক করে দিল বসনিয়া সরকারকে, ফলে মিছিল-মীটিং নিষিদ্ধ করা হলো। যুগোস্লাভিয়ার কসোভো থেকে ইউ.এন পীস মিশন-এর আড়াইশো সদস্যকে পাঠানো হলো সারায়েভোর পুব দিকে। আট তারিখেই এলাকায় কারফিউ জারি করা হলো। তবে এত সতর্কতার কোন প্রয়োজন ছিল না, যুগোশ্লাভ জাতীয় যুবদলের কুখ্যাত নেতা কার্চিক জোড়া নিখোঁজ হওয়ায় বসনিয়ার ওই এলাকা দখল করার কোন চেষ্টাই করা হলো না।

মাইক্রোফিল্মটা পরীক্ষা করে কোফি আনানের কাছে রিপোর্ট করা হলো। সময় নষ্ট না করে মাইক্রোফিল্মের একটা কপি সহ রিপোর্টটা ইন্টারন্যাশনাল ওঅর ক্রাইম ট্রাইবুনাল-এর হেডঅফিস জেনেভায় পাঠিয়ে দিলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট স্লোবোডান মিলোসেভিচের বিরুদ্ধে আরও একটা কেসের ফাইল তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হলো।

প্রতিটা ওঅর ক্রাইমের জন্য জবাবদিহি করতে হবে তাঁকে।

***

মাসুদ রানা

[দুটি বই একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

কর্কটের বিষ

এ মামুনের গল্প, রানা যাকে নিজের হাতে ট্রেনিং দিয়ে বিসিআই-এর চাকরিতে ঢুকিয়েছিল। এ গল্পে কংগ্রেস সদস্য লরেলি, তার নিহত বোন জেসিকা, ওদের মা মিসেস ভ্যান্স, জিম্বাবুইয়ের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিখ্যাত ট্র্যাকার লোটন নড়বেল-এরও ভূমিকা আছে। নড়বেলকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকল রানা। জানে না, পিছু নিয়েছে মানুষ শিকারী।

সার্বিয়া চক্রান্ত

রানা বেলগ্রেডে এসেছে টপ সিক্রেট একটা ডকুমেণ্ট নিয়ে যেতে। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পাপিষ্ঠ নেতা কার্চিক জোডা ওকে খুন করবার জন্য পাগলা কুকুর হয়ে উঠল। পুলিশ চীফ দেবারভিল সিডাক সারাক্ষণ রানার সামনে হাত পেতে আছেন, ডকুমেণ্টটা তাঁর চাই।

শুধু ডকুমেণ্টটা নয়, রাহাত খানের বন্ধু সাঈদ মুর্তজায়েভকে নিয়ে পালাল রানা। শুরু হলো ধাওয়া।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০